সেরা গোয়েন্দা গল্প

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

সম্পাদিত

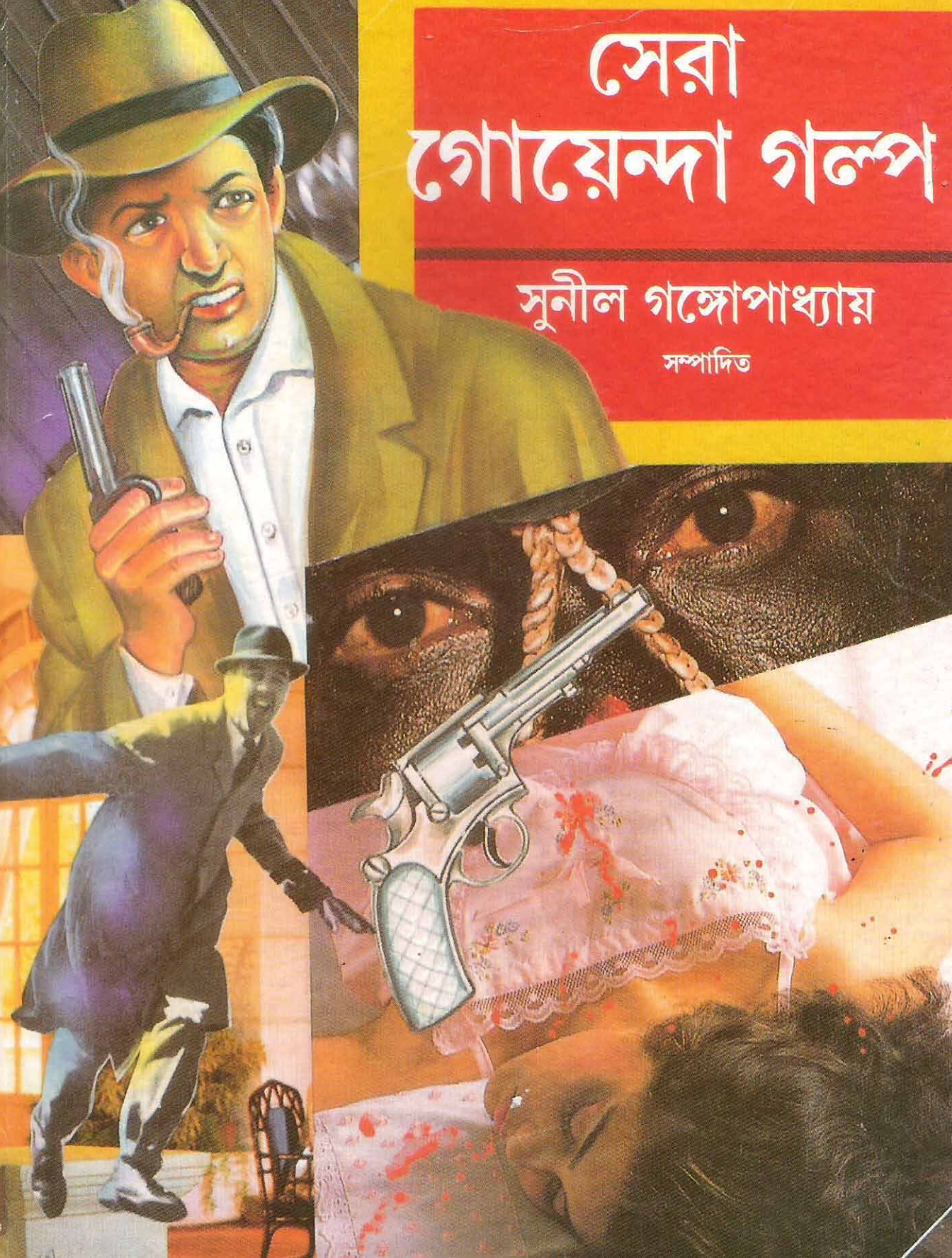

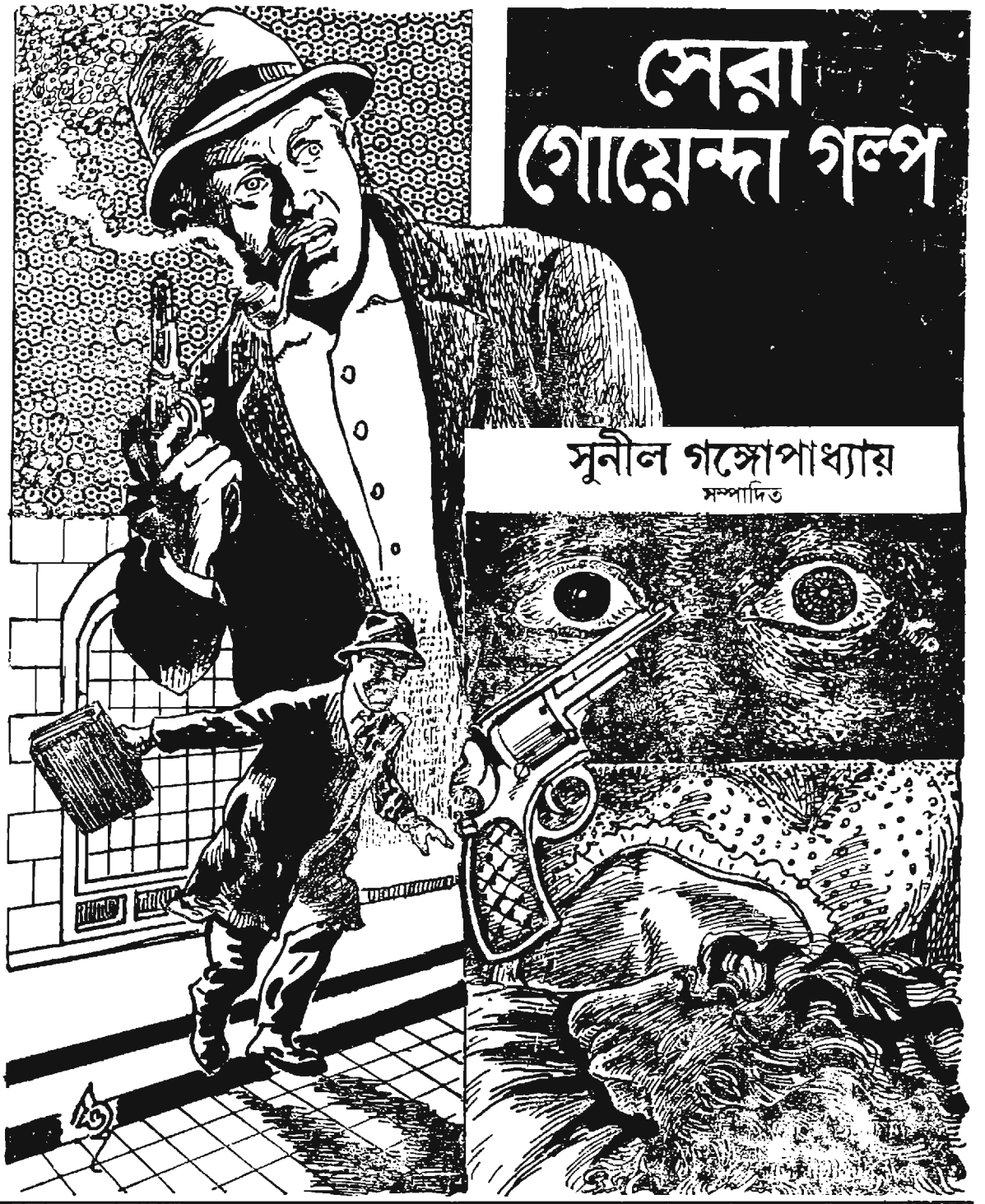

সেরা গোয়েন্দা গল্প

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
সম্পাদিত

কামিনী প্রকাশালয় ১১৫ অখিল মিস্ত্রী লেন, কলিকাতা —৯

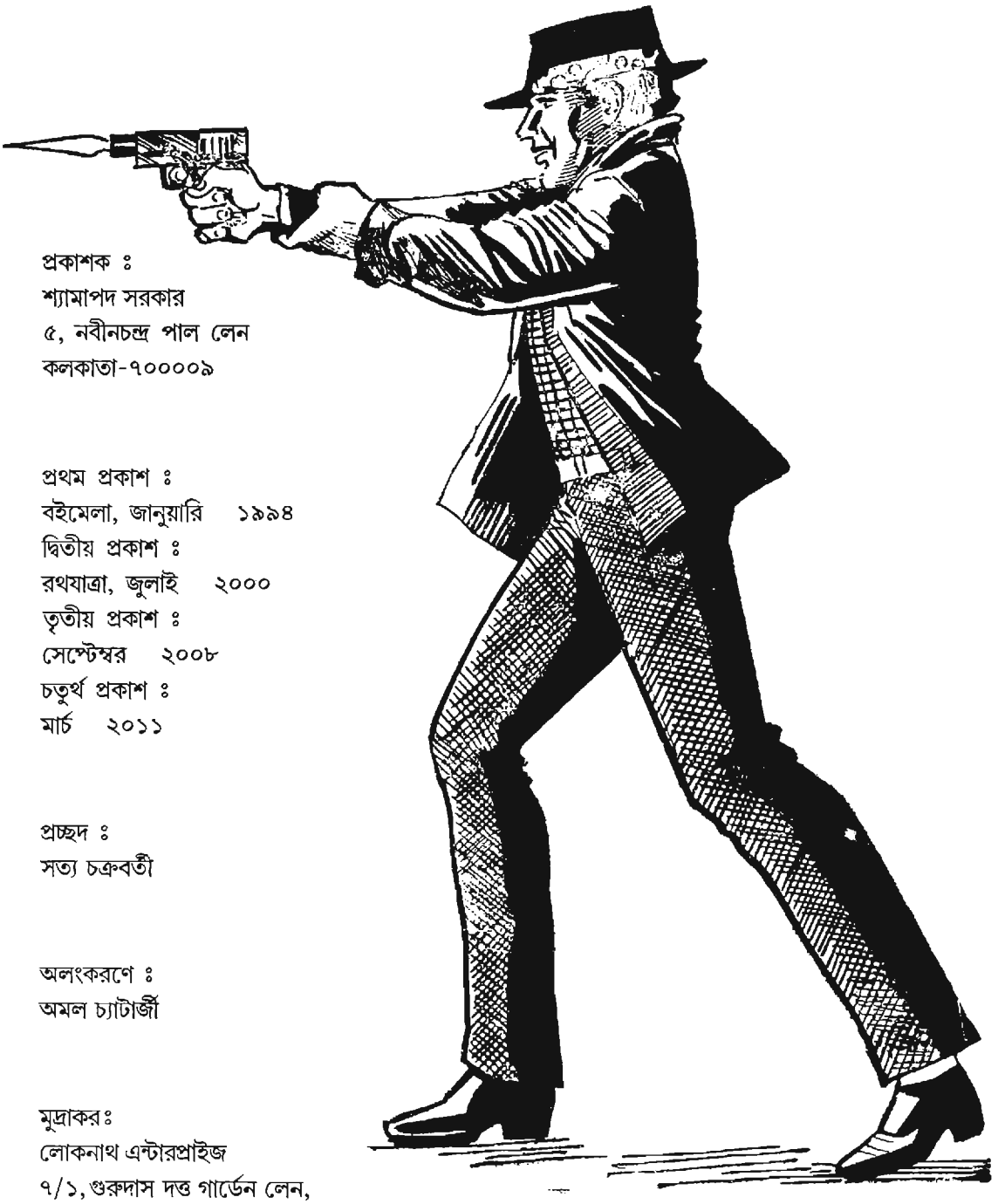

প্রকাশক ঃ
শ্যামাপদ সরকার
৫, নবীনচন্দ্র পাল লেন
কলকাতা-৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ ঃ
বইমেলা, জানুয়ারি ১৯৯৪
দ্বিতীয় প্রকাশ ঃ
রথযাত্রা, জুলাই ২০০০
তৃতীয় প্রকাশ ঃ
সেপ্টেম্বর ২০০৮
চতুর্থ প্রকাশ ঃ
মার্চ ২০১১

প্রচ্ছদ ঃ
সত্য চক্রবর্তী

অলংকরণে ঃ
অমল চ্যাটার্জী

মুদ্রাকরঃ
লোকনাথ এন্টারপ্রাইজ
৭/১, গুরুদাস দত্ত গার্ডেন লেন,
কলকাতা - ৭০০ ০৬৭

মূল্য ঃ পঞ্চাশ টাকা

সম্পাদকের কলম

সুকুমার মতে শিশু ও কিশোরদের ভাল লাগার বিষয় অন্তহীন। তা নির্ণয় বা নির্ধারণ করার চেষ্টা হাস্যকর। তবু এর মধ্যে এমন কিছু বিষয় থাকে যার প্রতি সব দেশের সব কালের ছোটদের মানসিক চাহিদা পরিপূরণের আয়োজন থাকে। স্বভাবতই সেসব বিষয় নিজ গুণে শিশু ও কিশোরদেরই কেবল নয়, বড়দেরও সমানভাবে আকৃষ্ট করে থাকে। জমাটি ভূতের গল্প আর বুদ্ধিদীপ্ত গোয়েন্দা কাহিনীর সমাদর সব দেশেই সকল শ্রেণীর পাঠকের অন্যতম প্রিয় এবং মনের মত বিষয়। ভয়-পাওয়ানো ভূত আর রহস্যভেদী গোয়েন্দাদের নিয়ে তা বড় লেখকদেরও একই কারণে সাগ্রহে কলম চালনা করতে দেখা যায়। আমাদের বাংলা সাহিত্যেও সরস এবং রোমহর্ষক ভূত-কাহিনী এবং রহস্যঘন গোয়েন্দা-কাহিনীর অনটন নেই। প্রতিষ্ঠিত লেখকদের প্রায় প্রত্যেকেই এই দুই ধারার গল্প লিখেছেন। এখনো অক্লান্তভাবে প্রায় প্রত্যেকেই এই দুই ধারার গল্প লিখেছেন। এখনো অক্লান্তভাবে লিখে চলেছেন।

মস্তিষ্কের সূক্ষ্ম ক্রিয়া-কর্ম, তার সমান্তরালে রহস্য ও রোমাঞ্চের ঘনঘটা—সব মিলিয়ে গোয়েন্দা গল্পের আবেদন পাঠক মনে স্বভাবতই স্বতন্ত্র। বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলন এবং মস্তিষ্কের উর্বরতা বৃদ্ধির সহায়ক-রূপেও গোয়েন্দা গল্পের সমাদর সর্বজনীন। সর্বোপরি বাস্তবতা সচেতক এই সব কাহিনীর খুনগুলি যেন ঠিক বাস্তব, ভয়াবহ খুন নয়, অনেকটা ধাঁধার মতন। এই দৃষ্টিকোণ থেকে নির্বাচিত একগুচ্ছ গোয়েন্দা কাহিনী নিয়ে সেরা গোয়েন্দা গল্প-এর আয়োজন। আশা করি গল্পগুলো পাঠকদের তৃপ্ত করবে।

সুবিমল মজুমদার

সূচী পত্র

লাখ টাকার পাথর—সমরেশ মজুমদার	৫
কঠিন শাস্তি—সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়	১১
ফটিকের কেরামতি—শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়	২১
আমিই গোয়েন্দা—সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়	২৭
ড্রাগন হাড়—অদ্রীশ বর্ধন	৩১
মাত্র একখানা থান ইট—আশাপূর্ণা দেবী	৪০
আয়না—আনন্দ বাগচী	৫১
নীলকান্তমণি উধাও—হীরেন চট্টোপাধ্যায়	৫৭
আমার নাম রানি—অনীশ দেব	৬৫
সেদিন অবেলায়—অমিতাভ মুখোপাধ্যায়	৮১
জুহু বিচে তদন্ত—ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়	৯৩
গোয়েন্দা কম্পিউটার ক্লাব—পার্থপ্রতিম সেনগুপ্ত	১০২
একটি টিকিটের সূত্রে—শিবায়ণ ঘোষ	১১২
গোগোলের কেরামতি—সমরেশ বসু	১২২
সবুজ চশমা—শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়	১৩৪
টেলিফোনে গোয়েন্দাগিরি—হেমেন্দ্রকুমার রায়	১৪২
সাদা কৌটো—নীহাররঞ্জন গুপ্ত	১৪৯
অর্কর গোয়েন্দাগিরি—মঞ্জিল সেন	১৫৬
টেনাগড়ে টেনশান—বুদ্ধদেব গুহ	১৭১
একটি খুনের ঘটনা—নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	১৭৮
দ্বিতীয় টিকটিক—লীলা মজুমদার	১৮৩
পোড়ো বাড়িতে খুন···চিরঞ্জীব সেন	১৮৯
বুকুনের গোয়েন্দাগিরি—সুধীর বেরা	১৯৮

লাখ টাকার প্রশ্ন



সমরেশ মজুমদার

এই শহরের বিখ্যাত শিল্পপতি অমলেন্দু রায় পরলোকগমন করেছেন। খবরটা শুনে শহরের মানুষ খুবই দুঃখিত হয়েছিল। অমলেন্দুবাবুকে সবাই খুব ভালবাসত। নিজের বিশাল ব্যবসায় তরুণদের চাকরি দেওয়া ছাড়াও জেলার বিভিন্ন ক্রীড়াপ্রতিযোগীতার সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন বিশেষ করে ফুটবল তাঁর প্রিয় খেলা ছিল। শহরের সবচেয়ে নামী ক্লাবের তিনি আজীবন সভাপতি ছিলেন।

খবরটা অর্জুন পেয়েছিল কদমতলায় চায়ের দোকানে বসে। তখন রাত আটটা। অমলেন্দু রায়ের সঙ্গে তার সরাসরি আলাপ ছিল না। কিন্তু কেউ মারা গেছেন শুনলে মন ভাল থাকে না। বাড়ি ফেরার পর মা বললেন, তিনটে টেলিফোন এসেছিল। তারা আবার করবে। আধঘণ্টার মধ্যেই সেই টেলিফোন আবার এল। দু'জন মানুষ পৃথক-পৃথক ভাবে টেলিফোন করছেন।

প্রথমজন অমলেন্দু রায়ের বড় ছেলে বিমলেন্দু। তিনি একটু ভূমিকা করে বললেন, আজই অর্জুনের সঙ্গে দেখা করতে চান। অর্জুন তাঁকে আসতে বলল। কারও বাবা সন্ধ্যেবেলায় মারা গেলে যে পরিস্থিতি হয়, তাতে টেলিফোন করে একজন অপরিচিতের সঙ্গে দেখা করতে চাওয়া মানায় না। বেশ অবাক হয়েছিল অর্জুন। খুব সিরিয়াস কিছু ওই পরিবারে ঘটেছে বলে সে অনুমান করেছিল। দ্বিতীয় ফোনটি করেছিল অমলেন্দুবাবুর মেজোছেলে কমলেন্দু। সে কোনও ভূমিকা করেনি। বলল, "আপনি আমার কিছু বন্ধুবান্ধবকে চেনেন। আমার বাবা আজ মারা গিয়েছেন। বিষয়সম্পত্তি নিয়ে আমি ভাবছি না। বাবার কোমরে একটা রুপোর চেনে দামি পাথর ছিল। শুনতাম পাথরটার দাম এক লাখ টাকা। হাসপাতাল থেকে যখন বাবাকে নিয়ে আসা হয়, তখনও সেটা আমি দেখেছি।

বাড়ি ফিরে এসে বাবার পোশাক পরিবর্তন করিয়ে দেওয়ার পর দেখি রুপোর চেনটা রয়ে গেছে, পাথরটা নেই। আপনি যদি রহস্য উদ্ধার করে দেন তা হলে পাঁচ হাজার টাকা পারিশ্রমিক দেব।"

"ভেবে দেখছি," বলে টেলিফোন নামিয়ে রেখেছিল অর্জুন।

বিমলেন্দুবাবু এসেছিলেন দশটার মধ্যে। নিজের গাড়ি চালিয়ে এসেছেন। শোকের ছাপ ও'র চোখে-মুখে। বাইরের ঘরে বসে মোটামুটি একই কাহিনী শোনালেন।

অর্জুন তাঁকে বলল, "আপনারা মৃতদেহের পোশাক পরিবর্তনের পর পাথরটা পাচ্ছেন না। পোশাক পরিবর্তনের সময় কে ও'র সঙ্গে ছিলেন?"

"মা এবং আমার ছোট ভাই তপেন্দু। ঘরের দরজা বন্ধ করে ওরা চেঞ্জ করিয়ে দিয়েছিল।"

"স্বাভাবিক। তাঁরা কী বলেন?"

"মায়ের সঙ্গে তো কথা বলাই যাচ্ছে না। তিনি প্রায়ই জ্ঞান হারাচ্ছেন।" তপেন্দু বলল, বাবার মৃত শরীরে হাত পড়ায় এমন নার্ভাস হয়ে পড়েছিল যে, পাথরটার কথা খেয়ালই করেনি। "অর্জুনবাবু, পাথরটা শুধু দামি নয়, এ আমাদের পরিবারে আছে কয়েক পুরুষ ধরে।"

"আপনি কি এখনও আছে বলে ভাবছেন?"

"আমার বিশ্বাস বাড়িতেই আছে।"

"আপনার কথা অনুযায়ী মা এবং তপেন্দুবাবুকে সন্দেহ করতে হয়।"

"আমি কী বলব? মা এমন কাজ করলে আমাকে বলতেন। তপেন্দু না না, বিশ্বাস হয় না। ওর এসব অভ্যেস ছিল না। তা ছাড়া ও পরেছিল পাজামা আর গেঞ্জি। ওই অবস্থায় কিছু লুকিয়ে রাখা যায় না। রাখতে গেলে মা দেখতে পেতেন।"

"পুলিশকে জানিয়েছেন?"

"না আমরা থানা-পুলিশ করতে চাই না। লোক বলবে, বাবা মারা যাওয়ামাত্র গোলমাল শুরু হয়ে গেল। আমাদের পারিবারিক সম্মান কিছু থাকবে না।"

"আপনার মেজভাইকে সন্দেহ হয়?"

"ঠিক সন্দেহ বলতে যা বোঝায়, তা হয় না। তবে ওর টাকা-পয়সার খুব টান। বাবা খুব অসন্তুষ্ট ছিলেন ওর বাজে খরচের বহর দেখে। হাসপাতাল থেকে আসার সময় ও-ই দেখেছিল পাথরটা বাবার কোমরের চেনের সঙ্গে ঠিক আছে।"

"হাসপাতালে ভর্তি করার সময় শরীরের গয়না খুলে রাখার কথা। আপনার অত দামি জিনিস-সুদ্ধু ভর্তি করেছিলেন, ওখান থেকেও তো চুরি যেতে পারত!"

"দুপুরে বাবার হার্ট অ্যাটাক হওয়ার পর ওসব ভাবার সময় ছিল না। হাসপাতাল থেকেও কিছু বলেনি। মেজোভাই না বললে এখনও আমার মনে পড়ত না।

"আপনার মেজোভাই ছাড়া কেউ হাসপাতাল থেকে আসার সময় পাথরটাকে দেখিনি, তাই তো ? একটু ভেবে বলুন !"

"হ্যাঁ, একমাত্র ওই দেখেছিল ।"

"তা হলে তো এমনও হতে পারে ওটা হাসপাতাল থেকেই খোয়া গিয়েছে। আপনার মেজোভাই মিথ্যে বলছেন, যাতে লোকে ভাবে বাড়ি আসার পর কেউ সরিয়েছে ।"

"অ্যাঁ, তা কি সম্ভব ?"

"কিছুই অসম্ভব নয়, আবার ঠিক এইটেই ঘটেছে এমন কথাও আমি বলছি না। আমি সম্ভাবনাগুলো তুলে ধরছি। আচ্ছা, পোশাক পালটে দেওয়ার পর ওই ঘরের ভেতর থেকে কে বেরিয়ে এসেছিল প্রথমে ? আপনারা কোথায় ছিলেন ?"

"বাড়িসুদ্ধু সবাই কাঁদছিল। কারও মাথা কাজ করছিল না। তপেন্দু ঘরের দরজা খুলে বেরিয়ে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদল। আমি ওকে কোনও মতে ছাড়িয়ে ঘরে গিয়ে দেখলাম মা অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন। মাকে জড়িয়ে ধরে অনেক ডাকাডাকির পর ওঁর জ্ঞান এল ।"

"তখন ঘরে কে কে ছিলেন ?"

"তখন ? তপেন্দু বেরিয়ে যাওয়ার পর ওই ঘরে মা ছিলেন এবং আমি ঢুকেছিলাম ।"

"আপনার পর ?"

"আমি চেঁচিয়ে মাকে ডাকাডাকি করার সময় সবাই এসে পড়ল ।"

"ততক্ষণ আপনি একা আর আপনার মা অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন ?"

"হ্যাঁ। কিন্তু সেটা আধ মিনিটও নয় ।"

"ওই সময়েই ইচ্ছে করলে আপনি পাথরটা সরাতে পারেন ।"

বিমলেন্দুবাবু চমকে উঠলেন, "এ আপনি কী বলছেন ? আমি চোর ? আমি চুরি করলে আপনার কাছে আসব কেন ? ছি ছি ছি ।"

"বিমলেন্দুবাবু আমি আপনাকে একটা সম্ভাবনার কথা বলছি। আপনি চুরি করতেও পারেন আবার নাও পারেন। দেখা যাচ্ছে আপনাদের তিন ভাইয়ের কেউ সন্দেহের বাইরে থাকার মতো কাজ করেন নি। কিন্তু এ ব্যাপারে এখনই তদন্ত করতে গেলে জানাজানি হয়ে যাবে যে !"

"না। শ্রাদ্ধের আগে ব্যাপারটাকে গোপন রাখতেই হবে ।"

"তা হলে ?"

"আপনি আজ একবার আমাদের বাড়িতে আসুন না ?"

"গিয়ে কী করব ? কাউকে জেরা করতে না পারলে," কথাটা বলেই মত পালটাল অর্জুন, "ঠিক আছে, আপনি যান, আমি আসছি ।"

বিমলেন্দু ওর হাত জড়িয়ে ধরলেন, মুখে কিছু বললেন না ।

ভদ্রলোক চলে যাওয়ার পর ব্যাপারটা নিয়ে ভাবছিল অর্জুন। এরকম পরিস্থিতিতে সে কখনও পড়েনি। কাউকে জেরা করা চলবে না, কেউ জানতে পারবে না, অথচ তদন্ত করে বের করতে হবে সেই মূল্যবান পাথরটা কোথায় গেল। এ কি সম্ভব? অমলেন্দুবাবুর তিন ছেলে এবং তিনজনের যে-কেউ ওটাকে সরাতে পারে এবং সেই সুযোগও তারা পেয়েছিল।

মোটরবাইক নিয়ে সোজা হাসপাতালে চলে এল অর্জুন। খোঁজখবর নিয়ে সেই নার্সের সামনে উপস্থিত হল, যিনি অমলেন্দুবাবুর সেবায় ছিলেন। অর্জুন তাঁকে জিজ্ঞেস করতেই তিনি মাথা নাড়লেন, "হ্যাঁ, দেখেছি। রুপোর চেনে পাথরটা ছিল। ওঁর মেজো ছেলে বারবার ওটার খবর নিচ্ছিলেন।"

"কখন? মারা যাবার আগে না পরে?"

"ভর্তি হওয়ার পর বলেছিলেন একবার। মারা যাওয়ার পর কয়েকবার। আমি বিরক্ত হয়ে বলেছিলাম অতই যখন চিন্তা খুলে নিজের কাছে রাখুন না। তাতে উনি জবাব দিয়েছিলেন, না, মা দুঃখ পাবে।"

"হাসপাতাল থেকে বডি নিয়ে যাওয়ার সময় ওটা ঠিক ছিল?"

"হ্যাঁ। এ-ব্যাপারে আমি নিঃসন্দেহ। কেন বলুন তো এসব জিজ্ঞেস করছেন?"

"পরে বলব।" অর্জুন আর দাঁড়ায়নি। নার্সের বক্তব্য যদি সঠিক হয়। তা হলে মেজোভাই কমলেন্দু পাথরটা সরায়নি।

রায় বাড়ীতে চলে এল অর্জুন। শোকের বাড়ি। এখনও লোকজন আসছে। খুঁজে-খুঁজে তপেন্দুকে বের করল সে। ছাদের ঘরে একা বসে সিগারেট খাচ্ছে। পরণে এখনও পাজামা আর গেঞ্জি। অর্জুনকে সে চেনার চেষ্টা করল। বয়স কুড়ি-একুশের মধ্যে।

অর্জুন বলল, "আপনার বাবা আমার শ্রদ্ধেয় মানুষ। খবরটা পেয়ে এসেছিলাম। এখানে সবাই আমার গুরুজন। সিগারেট খেতে পারছি না ওঁদের সামনে। তাই চলে এলাম ওপরে। দেশলাই আছে?"

তপেন্দু বিরক্ত হয়ে কোমরে হাত দিয়ে পাজামার দড়ির ভেতরে ওলটানো কাপড়ের মধ্যে থেকে দেশলাই বের করে এগিয়ে ধরল। সিগারেট ধরাল অর্জুন।

"এই দেশলাইটা কতক্ষণ কোমরে রেখেছেন?"

"দুপুর থেকে। কেন?"

"ওভাবে তো কেউ রাখে না।"

"আমার আজ পেট খারাপ। ক'বার বাথরুমে গিয়েছি। হাসপাতালেও যেতে পারিনি তাই। পাঞ্জাবি পরিনি, রাখব কোথায়?"

"পেট খারাপ অবস্থায় বাবার পোশাক পরিবর্তন করলেন?"

"মা আমাকে ডেকেছিলেন বলেই করতে হল। আপনি কেন এসব প্রশ্ন করছেন?"

"এমনি।" অর্জুন হেসে নেমে এল। পাজামা পরে কোমরে দেশলাই গুঁজে রাখলে কেউ অন্য কিছু লুকিয়ে রাখতে পারে না। তপেন্দুর পকেটের বালাই নেই। হাতে করে নিশ্চয়ই পাথর নিয়ে বের হয়নি। মা অজ্ঞান হয়ে গেছেন দেখে যদিও সেই সুযোগ ছিল। এক যদি সে ডেডবডির নীচে ওটা লুকিয়ে রাখে তা হলে আলাদা কথা, না হলে ছোটভাই তপেন্দু পাথর সরায়নি।

রাত এখন বারোটা। মৃতদেহ এখনই শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হবে কিনা এ ব্যাপারে আলোচনা হচ্ছে। বিমলেন্দু অর্জুনকে দেখে এগিয়ে এলেন, "বাবাকে দেখবেন?"

"হ্যাঁ।"

"আসুন।"

ঘরের দরজা ভেজানো ছিল। কোণের দিকে খাটে অমলেন্দুবাবু শুয়ে আছেন। দরজা থেকে সেটা বেশ দূরে। তাঁর মাথার কাছে একজন মহিলা বসে আছেন। পায়ের কাছে কয়েকজন। ঘরে ঢুকেই অর্জুন চাপা গলায় জিজ্ঞেস করল, "ভেতরে ঢোকার কত পরে আপনি মাকে ডেকেছিলেন?"

"বড় জোর আধ মিনিট। তাও হবে না হয়তো।"

"উনি অজ্ঞান হয়েছিলেন?"

"হ্যাঁ। মাথার পাশে মা বসে আছেন।"

"ঠিক আছে। আপনি পায়ের কাছে যাঁরা বসে আছেন তাঁদের একটু বাইরে নিয়ে যান।"

আধ মিনিটের মধ্যে এই ঘরে ঢুকে খাটের কাছে পৌঁছে কোমর থেকে চেন বের করে পাথর খুলে নেওয়া কোনও মানুষের পক্ষে সম্ভব নয় বলেই বড়ছেলে বিমলেন্দু সেটা সরাতে পারেন না। অবশ্য সময়টা যদি আধ মিনিটের অনেক বেশি হয় তা হলে আলাদা কথা।

ঘরে এখন কেউ নেই, শুধু তারা দু'জন ছাড়া। অর্জুন বৃদ্ধার কাছে গিয়ে বিনীত গলায় বলল, "মাসিমা, মেসোমশাই আমাকে ভালবাসতেন।"

বৃদ্ধা বললেন, "তুমি কে বাবা?"

"আমি অর্জুন। সত্য অন্বেষণ করি। পাথরটা ঠিক জায়গায় রেখেছেন তো?"

সঙ্গে সঙ্গে কেঁদে উঠলেন বৃদ্ধা। চাপা গলায় কাঁদতে-কাঁদতে বললেন, "ভস্ম হয়ে যাক, সব ভস্ম হয়ে যাক।"

অর্জুন অমলেন্দুবাবুর দিকে তাকাল। মনে হল গলার একটা দিক যেন সামান্য উঁচু, টিউমারের মতো।

অত রাত্রে শ্মশানে একা আসতে এখনও অস্বস্তি হয়। যে মানুষেরা মৃতদেহ সৎকারের দায়িত্ব নেয়, তাদের একজনের নাম মহাদেব। এর সঙ্গে আলাপ ছিল অর্জুনের। মহাদেব তখন চুপচাপ

বসেছিল। শ্মশানে ইতিমধ্যেই দুটো চিতা জ্বলছে। মহাদেবকে আলাদা ডেকে নিচু গলায় কিছু বলল অর্জুন। তারপর পকেট থেকে কুড়িটা টাকা বের করে দিল।

অমলেন্দু রায়ের মৃতদেহ এসে গেল শ্মশানে। মফস্বল শহরের শ্মশানে আধুনিক ব্যবস্থা নেই। দেহ চিতায় তুলতে সময় লাগল। আগুন জ্বলে গেলে দেখা গেল মহাদেবরা দাহের কাজে তদারকি করছে। অর্জুন চুপচাপ দেখছিল। সব ছাই হয়ে যাবে। কাঠ, শরীর। শুধু অস্তিত্বটুকু থেকে যাবে। আর···সন্দেহটা এখনও মনে আঁচড় কাটছে।

ক্রমশ চিতা ছাই হয়ে মাটিতে মিলিয়ে গেল। মহাদেব আগুন নিভিয়ে মাটির সরায় চিমটি দিয়ে অস্থি তুলতে লাগল। তারপর হঠাৎ হাত তুলে অর্জুনকে ডাকল। চিতার অনেক দূরে নদীর ধারে বসেছিল শ্মশানযাত্রীরা। ভোর হতে দেরি নেই।

অর্জুন এগিয়ে যেতেই মহাদেব নির্লিপ্তভাবে একটা পাথরের ছোট টুকরো তুলে ধরল, "এইটে বাড়িতে ছিল, পোড়েনি।"

"দাও।" রুমাল বের করে জিনিসটা নিয়ে নিল অর্জুন। মহাদেব গেল ছেলেদের হাতেঅস্থি তুলে দিতে। অর্জুন উঠল মোটরবাইকে।

শূন্য বাড়ি। অমলেন্দুবাবুর ঘরে প্রদীপ জ্বলছে। মেঝেতে চুপচাপ বসেছিলেন ওঁর স্ত্রী। পায়ের শব্দে মুখ তুললেন। অর্জুন বলল, "আবার বিরক্ত করছি।"

"কে তুমি?"

"আমি অর্জুন। রাত্রে কথা বলেছিলাম।"

"কী চাও?"

"আমি কিছুই চাই না। আপনি বলেছিলেন সব ভস্ম হয়ে যাক। কিন্তু কিছু জিনিস আছে যা কিছুতেই ভস্ম হয়ে যায় না। আগুন পোড়াতে পারে না। একটা খালি প্রদীপের খোল নিয়ে রুমাল থেকে পাথরটা বের করে রাখল তাতে অর্জুন। তারপর খোলটা বসিয়ে দিল প্রদীপের পাশে।

"এটা আপনাদের পারিবারিক সম্পত্তি। মনে হয় আপনি ছোটছেলে বেরিয়ে যাওয়ার পর আপনার স্বামীর কোমর থেকে খুলে ওঁর মুখের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন। জিভের নীচে ওটার যাওয়ার কথা নয়। কী করে গলার ভেতরে গেল সেটা আপনি জানেন। বড়ছেলে ঘরে ঢোকার আগেই কাজটা করেছিলেন আপনি। আপনার একটাই স্বার্থ ছিল, জিনিসটা ছেলেদের হাতে পড়ুক আপনি চাননি। কিন্তু এটা ভস্ম হয়নি। এখন কী করবেন তা নতুন করে ভাবুন। ওরা দাহ শেষ করেছে, এখনই ফিরে আসবে। এলাম।"

সারারাত জাগার ক্লান্তি নিয়ে ভোরের রাস্তায় বাইক ছুটিয়ে যাচ্ছিল অর্জুন। এখন একটু ঘুমানো দরকার।

কঠিন শাস্তি

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়



দুই বন্ধুই ক্লাস নাইনে পড়ে, কিন্তু আলাদা ইস্কুলে। ওদের মধ্যে টিটো খুব খেলাধুলো ভালবাসে। পড়ার বই ছাড়া বাইরের বই বিশেষ পড়ে না, বড়জোর দু-একটা ইংরেজী কমিক্‌স। আর পাপান খেলায় মাঠে বিশেষ যায় না, যখনই একটু সময় পায় অমনই একটা গল্পের বই নিয়ে বসে। এমনকী একবার টিটোর সঙ্গে ক্রিকেট খেলা দেখতে গিয়েও পাপান একটা ডিটেকটিভ বই পড়ে শেষ করে ফেলেছিল। পাপান ইংরেজি বইও পড়ে। বাংলা বইও পড়ে।

এখন একটানা দশদিন স্কুল ছুটি। সকালবেলা পড়াশুনা শেষ করে টিটো যায় ব্যাডমিণ্টন খেলতে, আর পাপান বড় রাস্তার মোড়ে একটা বইয়ের দোকানে এসে নতুন নতুন বই দেখে, একটা-দুটো কেনে। যাওয়া-আসার পথে রোজই প্রায় এক জায়গায় ওদের দু'জনের দেখা হয়ে যায়। গল্প হয় খানিকক্ষণ। টিটো বলে, আগের দিনের ব্যাডমিণ্টন ম্যাচে একজনকে হারিয়ে হারিয়ে দেওয়ার কথা আর পাপান বলে, "কাল রাত্তিরে একটা দারুণ বই পড়লুম জানিস।"

সকাল সাড়ে দশটায় ফুটপাথে দাঁড়িয়ে গল্প করছে টিটো আর পাপান। টিটোর হাতে ব্যাডমিণ্টনের র‍্যাকেট, পাপানের হাতে দু'খানা বই। পাশেই একটা ব্যাঙ্ক, সামনের রাস্তায় তিন-চারখানা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে।

গল্পে গল্পে ওরা যখন মশগুল, তখন ব্যাঙ্ক থেকে বেরিয়ে এল একজন লোক। বেশ লম্বা-চওড়া চেহারা, সুট-টাই পরা, মাথায় আধখানা টাক। মুখে একটা কেউকেটা ভাব। লোকটির হাতে একটা চাবি, সেই চাবি দিয়ে একটা গাড়ির দরজা খুলতে গিয়ে হঠাৎ মুখ তুলে সে টিটো আর পাপানের দিকে চোখ পাকিয়ে তাকিয়ে বলল, "আই, আমার গাড়িতে ঠেসান দিয়েছিস কেন রে? সরে যা! সরে যা!"

কথা বলতে বলতে অন্যমনস্কভাবে পাপান একটা নীল রঙের গাড়িতে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছিল ঠিকই। তাতে কি হয়েছে, গাড়িটা ক্ষয়ে গেছে নাকি? একজন অচেনা লোক তাদের তুই বললে কেন?

পাপান সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে গাড়িটা থেকে সরে গেল খানিকটা। লোকটির দিকে তাকিয়ে বলল, "আপনার গাড়িটা ছুঁয়ে ফেলেছি, এজন্য দুঃখিত।"

লোকটি গাড়িতে ঢুকতে গিয়েও এদিকে চলে এল। গাড়িটা যেন একটা পোষা জন্তু, এইভাবে এক জায়গায় হাত বুলোতে গিয়ে চমকে উঠল। গর্জন করে বলল, "আমার গাড়িতে আঁচড় কেটেছিস। গাড়িটা নষ্ট করে দিয়েছিস!"

পাপান সেদিকে তাকাল, গাড়িটার গায়ে সে কোনও দাগ দেখতে পেল না। তা ছাড়া গাড়ির গায়ে সে আঁচড় কাটতে যাবে কেন? তাও অন্যের গাড়িতে? একটুখানি পিঠটা ঠেকিয়েছিল শুধু।

লোকটি রাগে গরগর করতে করতে বলল, "যত সব বিচ্ছু ছেলে। বদমাশ!"

এবার টিটো বলল, "আপনি গালাগাল দিচ্ছেন কেন? আপনার গাড়ির কোনও ক্ষতি করা হয়নি!"

লোকটি প্রচণ্ড জোরে চেঁচিয়ে বলল, "চোপ!"

তারপর দুটো হাতের পাঞ্জা ঠিক থাবার মতন ওদের দু'জনের মুখের ওপর রাখল। এক ধাক্কায় ওদের দু'জনকেই ফেলে দিল মাটিতে। কঠিন ফুটপাথে মাথা ঠুকে গেল টিটো আর পাপানের।

ওরা আবার উঠে দাঁড়াবার আগেই লোকটি গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে বেরিয়ে গেল।

টিটো আর পাপানের যত না ব্যথা লেগেছে, তার চেয়েও ওরা আহত হয়েছে বেশি। বিনা দোষে একজন লোক ওদের গায়ে হাত দিল? এর আগে কেউ কোনওদিন ওদের সঙ্গে এরকম ব্যবহার করেনি। ওরা কোনওদিন মারই খায়নি!

কলকাতার রাস্তায় এরকম কত কী ঘটে, অন্য কেউ ভ্রূক্ষেপ করে না। কত লোক হেঁটে যাচ্ছে, পাশ দিয়ে গাড়ি চলে যাচ্ছে। একদম কাছাকাছি দুচারজন লোক ওদের ওরকমভাবে পড়ে যেতে দেখে একটু ভুরু কুঁচকে তাকাল, তারপর চলে গেল যে-যার নিজের কাজে। কেউ সেই লোকটিকে একটু বাধাও দিল না, কিছু জিজ্ঞেসও করল না।

টিটো আর পাপান গায়ের ধুলো ঝেড়ে হতবাক হয়ে একটুক্ষণ তাকিয়ে রইল পরস্পরের দিকে। এটা কী হল? কেন লোকটা এরকম অসভ্যের মতন ব্যবহার করে চলে গেল? লোকটা কে?

ব্যাঙ্কের গেটে একজন বন্দুকধারী দারোয়ান থাকে। সে বন্দুকটা পাশে শুইয়ে রেখে নিশ্চিন্ত মনে খৈনি খাচ্ছে। টিটো তার কাছে গিয়ে বলল, "এইমাত্র যে-লোকটি বেরোল ব্যাঙ্ক থেকে, তাকে আপনি চেনেন? এখানে প্রায়ই আসে?"

দারোয়ান ভুরু তুলে জিজ্ঞেস করল, "কোন লোক? কত লোক তো যাচ্ছে আর আসছে!"

টিটো বলল, "বেশ লম্বা, খয়েরি সুট পরা।"

দায়োয়ান বলল, "সুট এখন সবাই পরে। শীত পড়েছে, সুট পরবে না!"

বোঝা গেল, এর কাছ থেকে কোনও সাহায্য পাওয়া যাবে না।

পাপান বলল, "আমি গাড়ির নম্বরটা দেখেছি। 9837, তবে আগে কী ছিল? WMF, না WMB?"

টিটো বলল, "আমি দেখিনি। আর ওকে ধরা যাবে না!"

পাপান চোয়াল শক্ত করে বলল, "ওকে খুঁজে বার করতেই হবে। অকারণে একটা লোক অন্যায় করে যাবে? ওকে শাস্তি পেতেই হবে! 'অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে···' তুই এই কবিতাটা পড়িসনি, টিটো?

টিটো বলল, "কিন্তু ওকে খুঁজে পাব কী করে?"

পাপান বলল, "পৃথিবীর যেখানেই থাকুক, ওকে আমরা ঠিক খুঁজে বার করব। ওর মুখটা যেন ভুলে যাস না। দাঁড়া একটু চোখ বুজে ওর মুখের ছবিখানা মনে গেঁথে রাখি।"

টিটো বলল, "ওর মুখটা আমার মনে না থাকলেও, দেখলেই চিনতে পারব।"

তারপর থেকে ওই ব্যাঙ্কের সামনেটায় নজর রাখে দু'বন্ধুই। যদি সেই লোকটি বা গাড়িটাকে দেখা যায়! ব্যাঙ্কটার সামনে দিয়ে মাঝে-মাঝে দু'জনেই হাঁটে। অন্য সময়েও রাস্তার যে-কোনও গাড়ির নম্বরটা ওরা একবার দেখে নেয়। লম্বা-চওড়া, খয়েরি কোটপরা একজন লোককে পেছন থেকে দেখে পাপান অনেকখানি ছুটে গেল তার মুখটা দেখার জন্য। সে অন্য লোক।

লোকটি আর ব্যাঙ্কে আসে না। রোজ-রোজ কেই-বা ব্যাঙ্কে যায়। তবে পাঁচ দিন পর অন্য একটি সুযোগ পাওয়া গেল।

পাপান টিকিট কাটতে গিয়েছিল গ্লোব সিনেমায়। হঠাৎ তার নজর পড়ল একটা গাড়ির নম্বরের দিকে 9837, তবে আগের অক্ষরগুলো WMB। আগের অক্ষরগুলো মেলাটাই বেশি দরকার, একই নম্বরের অনেক গাড়ি থাকতে পারে। কিন্তু এ-গাড়ির রংটাও নীল। গাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে নিউ মার্কেটের সামনে!

যদি এই গাড়িটাই সেই লোকটির হয়? কিন্তু পাপান একা-একা সেই লোকটাকে দেখতে পেলেই বা কী করবে? কী করে শাস্তি দেবে? টিটোকে একটা খবর দেওয়া দরকার। টিটোদের বাড়ি টেলিফোন আছে।

একটা দোকান থেকে ফোন করল পাপান। টিটো জিজ্ঞেস করল, "তুই ঠিক জানিস ওটা সেই গাড়ি? নীল রঙের অ্যামবাসাডর গাড়ি তো কতই আছে!"

পাপান একটু দুর্বলভাবে বলল, "না, একেবারে ঠিক বলতে পারছি না। অন্য গাড়িও হতে পারে। কিন্তু যদি সেই গাড়িটাই হয়? গাড়িটাকে ফলো করলে সেই লোকটার বাড়িটা চিনে আসা হবে।

টিটো বলল, "ঠিক আছে, তুই নজর রাখ। আমি আসছি!"

একটু দূরে, অন্য একটা গাড়ির আড়ালে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল পাপান। টিটোর আসতে কুড়ি-পঁচিশ মিনিট লাগবেই। তার আগেই যদি লোকটা বেরিয়ে আসে নিউ মার্কেট থেকে? অতবড় লোকটার সঙ্গে পাপান গায়ের জোরে পারবে না। তবে ছুট গিয়ে পেছন থেকে একটা ল্যাং মেরে আছাড় খাওয়াতে পারে। তাতেই অনেকটা প্রতিশোধ নেওয়া হবে। কিন্তু ওর সঙ্গে যদি অন্য লোক থাকে?

ঠিক তাই। টিটো এসে পৌঁছবার আগেই নিউ মার্কেট থেকে বেরিয়ে এল সেই লোকটি। হ্যাঁ, কোনও ভুল নেই, সেই লোকটাই বটে। তার সঙ্গে রয়েছে আরও দু'জন লোক। তারা নীল গাড়িটার দিকেই এগিয়ে আসছে হাসতে-হাসতে। হাতে কয়েকটা প্যাকেট। পাপানের মনটা দমে গেল! এখনই তো ওরা গাড়িতে উঠে চলে যাবে, সে কী করবে?

লোকটিকে ভালো করে দেখবার জন্য পাপান অনেকটা কাছে এগিয়ে এল।

সেই আসল লোকটাই গাড়ি চালাবে। একটা ভিখিরি বুঝি জানলা দিয়ে হাত বাড়িয়ে দিল তার কাছে। লোকটা ধমকে উঠল, "এই যা! সরে যা!"

বুড়ি তবু সরে না। ঘ্যান ঘ্যান করতে লাগল।

তারপরের ব্যাপারটা দেখে আঁতকে উঠল পাপান। লোকটা সাঁ করে কাঁচ তুলে দিল গাড়ির জানলার। তাতে আটকে গেল ভিখিরি বুড়িটার হাত। বুড়িটা যন্ত্রণায় চিৎকার করে, 'ওরে বাবা রে, মরে গেলাম রে' বলতে লাগল আর ভেতরে সেই লোকগুলো খিলখিল করে হাসছে।

ঠিক এই সময় টিটো এসে ডাকল, "পাপান!"

কাছেই একটা ট্যাক্সি থেমেছে, তার মধ্যে বসে আছে টিটো। পাপান দৌড়ে এসে ট্যাক্সিতে উঠে পড়ে বলল, "সেই গাড়ি, সেই লোক। ওকে ফলো করে বাড়িটা দেখে আসতে হবে।"

জানলার কাচ আবার নামিয়ে নীল গাড়িটা এবার স্টার্ট দিয়েছে।

পাপান উত্তেজিতভাবে বলল, "ওই লোকটা, ওই লোকটা, ওর মতন খারাপ লোক আমি পৃথিবীতে আর দেখিনি। একটা ভিখিরিকে শুধু শুধু কী কষ্ট দিল। ওকে ছাড়া হবে না, ওকে শাস্তি দিতেই হবে!"

টিটো ট্যাক্সি ড্রাইভারকে বলল, "আপনি আবার চলুন, শিগগির!"

ড্রাইভার জিজ্ঞেস করল, "কোন দিকে যাব?"

টিটো আর কিছু বলার আগেই পাপান বলল, "ডান দিকে ঘুরিয়ে নিন।"

সে একটা গল্পের বই পড়ছে যে, অল্প বয়সী ছেলেরা কোনও ট্যাক্সিতে চেপে অন্য কোনও বাড়ী ফলো করতে বললে ট্যাক্সি ড্রাইভাররা সন্দেহ করে। যেতে চায় না। সেইজন্য পাপান শুধু আগের গাড়িটা দেখে দেখে বলতে লাগল, "ডান দিকে, এবার বাঁ দিকে।

বেশ কয়েক মিনিট কেটে যাওয়ার পর টিটো ফিসফিস করে বলল, "গাড়িটা কত দূরে যাবে রে ? ট্যাক্সি ভাড়া অনেক হয়ে গেলে কী করে দেব ? আমার কাছে বেশি পয়সা নেই। তোর কাছে আছে ?"

পাপান বলল, "আমার কাছে তো পাঁচ টাকার বেশি নেই !"

টিটো বলল, "এর মধ্যেই পনেরো টাকা উঠে গেল, আমার কাছে আছে মাত্র দশ টাকা।"

পাপান বলল, "একটা কিছু ব্যবস্থা হয়ে যাবেই। এখন আর ওকে ছাড়লে চলবে না।"

নীল গাড়িটা এসে থামল টালিগঞ্জে, বড় রাস্তা ছেড়ে একটা ছোট রাস্তায় ঢুকে একটা পাঁচিল-ঘেরা বাড়ির সামনে। পাপান আর টিটো নেমে পড়ল একটু দূরে। ট্যাক্সি ড্রাইভারকে একটু অপেক্ষা করতে বলে ওরা ঠিকানা খোঁজার ভান করে একটু একটু করে এগোতে লাগল।

সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। এ-রাস্তাটা অন্ধকার অন্ধকার মতন। সেই বাড়িটার সামনে একটা লোহার গেট, ভেতরে একজন দারোয়ান বসে আছে। লোক তিনটে ভেতরে ঢুকে গেছে, ভেতরটায় কিছু দেখা যাচ্ছে না।

এ তো বেশ বড়লোকের বাড়ি। এখন কী করা যায় ?

পাপান ভাবল, লোকটা এমন বড়লোক হয়েও একটা বুড়ি ভিখিরিকে অমন কষ্ট দেয় ? পাষণ্ড। ওকে শাস্তি দিতেই হবে !

বাড়িটার সামনে এমনই ঘোরাঘুরি করা যায় না। ট্যাক্সি ড্রাইভার হর্ন দিচ্ছে। পাপান ঠিক করে ফেলেছে যে, ওই ট্যাক্সিতেই বাড়ি ফিরতে হবে, না হলে ভাড়া দেবে কী করে ? বাড়িতে গিয়ে দাদার কাছে টাকা চাইতে হবে। দাদা যদি এখন বাড়িতে না থাকে, তা হলে মায়ের কাছে !

টিটো বলল, "এখন আর তো কিছু করার নেই। বাড়িটা তবু চেনা হল।"

পাশ থেকে গায়ে চাদর জড়ানো একটি লম্বামতন ছেলে জিজ্ঞেস করল, "তোমাদের কী চাই ভাই ? কাকে খুঁজছ ?"

টিটো বলল, "কিছু চাই না। একটা ঠিকানা খুঁজছি। আমার এক বন্ধু থাকে পঁয়তাল্লিশ নম্বর বাড়িতে, কিন্তু সে তো ও রকম লোহার গেটওয়ালা বাড়ি বলেনি, এমনিই সাধারণ দোতলা বাড়ি। ওই বাড়িটা কার বলতে পারেন ?"

লম্বা ছেলেটি বিরক্ত ভাব করে বলল, "ওটা তো রঘু চৌধুরীর বাড়ি। কেন, তার সঙ্গে তোমাদের কী দরকার ?"

পাপান বলল, "না, না, কোনও দরকার নেই। এমনই জিজ্ঞেস করছিলাম।"

ছেলেটি বলিল, "মহা-পাজি লোক ! লোককে ঠকিয়ে-ঠকিয়ে অত বড় বাড়ি করেছে ! এটা আগে ছিল একজন বিধবা ভদ্রমহিলার, তিনি হঠাৎ মারা গেলেন। তারপর বাড়িটা রঘু চৌধুরীর হয়ে গেল। লোকে বলে, ওই রঘু চৌধুরীর বিধবা মহিলাকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলেছে !"

টিটো চোখ বড়-বড় করে বলল, "খুন ? ওকে পুলিশে ধরেনি ?"

ছেলেটি বলল, "ওর সব বড়-বড় লোকের সঙ্গে চেনা আছে। কী সব কলকাঠি নেড়েছে, কেউ ওকে ছুঁতেও পারেনি!"

টিটো আবার জিজ্ঞেস করল, "আপনারা পাড়ার লোক কিছু করতে পারেননি? ওকে শাস্তি দেওয়া উচিত ছিল না?"

ছেলেটি বলল, "ওকে ধরা-ছোঁওয়া অত সহজ নয়। আমরা কিছু করতে গেলে আমাদেরই পুলিশে ধরিয়ে দেবে। জানো, আমি ওর কাছে একবার চাকরি চাইতে গিয়েছিলাম। আমার কথা ভাল করে শুনলই না, দূর-দূর করে তাড়িয়ে দিল, কুকুর লেলিয়ে দিল!"

ট্যাক্সিওয়ালা অধৈর্য হয়ে গেছে, ওদের উঠে পড়তে হল। ফেরার পথে আগাগোড়া গম্ভীর হয়ে রইল পাপান।

এর পর দু-তিনদিন দুই বন্ধু দেখা হলেই ওই রঘু চৌধুরীকে নিয়ে আলোচনা করে। লোকটা অসভ্য নিষ্ঠুর, খুনি, অথচ তাকে কেউ শাস্তি দিতে পারে না! একটা খারাপ লোক মানুষের ক্ষতি করে ঘুরে বেড়াতে এত বড় বাড়িতে থাকবে, অথচ কেউ জানতে পারবে না তার আসল রূপটা? একটা কিছু করতেই হবে, কিন্তু কী করা যায়?

ওরা দু'জন মাঝে মাঝে চলে আসে টালিগঞ্জে। সেই বাড়িটার সামনে ঘোরাঘুরি করে। দু-একবার রঘু চৌধুরীকে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে যেতেও দেখেছে। একবার রঘু চৌধুরীর সঙ্গে পাপানের চোখাচোখিও হয়ে গেল। কিন্তু রঘু চৌধুরী তাকে চিনতে পারল না। ও নিশ্চয়ই অনেক, অনেক লোকের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছে. তাদের মুখ মনে রাখতে পারে না।

ওরা খবর জোগাড় করল যে, রঘু চৌধুরী এ-পাড়ার দুর্গাপুজো, কালীপুজোর সময় অনেক টাকা চাঁদা দেয়। তাই কেউ তাকে ঘাঁটায় না। তবে একটা চায়ের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে দুটি ছেলে বলছিল, রঘু চৌধুরী আসলে স্মাগলার, তাই ওর এত টাকা!

একদিন সকালবেলা ওই বড়ির লোহার গেটের পাশ দিয়ে যেতে যেতে ওরা দেখল, ভেতরে একটা সুন্দর সবুজ লন। সেখানে দুটি ফুটফুটে ছেলে, পাপানদের চেয়ে অনেক ছোট। মনে হয় ক্লাস ফোর আর ফাইভে পড়ে, একটা বল নিয়ে খেলছে, আর তাদের সঙ্গে খেলায় যোগ দিয়েছে রঘু চৌধুরী আর একটা কুকুর। বাবা ছেলেদের সঙ্গে খেলছে আর সবাই মজা করে হাসছে। এক-একবার ছোট ছেলেটাকে কাঁধে তুলে নিচ্ছে রঘু চৌধুরী। কুকুরটা লাফাচ্ছে পাশে।

কী সুন্দর দৃশ্য! মনে হয় কী আনন্দময় এই বাড়ি। রঘু চৌধুরী তার ছেলেদের সঙ্গে এত ভাল ব্যবহার করে, আর খুব খারাপ ব্যবহার করে বাইরের লোকদের সঙ্গে।

সেদিন ফেরার পথে টিটো বলল, "আর টালিগঞ্জে এসে কী হবে পাপান? কিছুই তো করা যাবে না!

পাপান বলল, "আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে।"

টিটো সঙ্গে সঙ্গে উৎসুকভাবে বলল, "কী ?"

পাপান বলল, "ওকে বেনামী চিঠি লিখব ! ওপরে একটা মানুষের মাথার খুলি এঁকে লিখব, 'সাবধান রঘু চৌধুরী ! তুমি যদি পাপ কাজ বন্ধ না করো, তা হলে তোমার মুণ্ডু উড়ে যাবে ! ইতি মেঘনাদ !' মেঘনাদের তলায় একটা জ্বলন্ত তীর আঁকা থাকবে !"

টিটো বলল, "এই চিঠি পেলে ও হাসতে হাসতে ওয়েষ্ট পেপার বাস্কেটে ফেলে দেবে। মোটেই ভয় পাবে না।"

পাপান বলল, কেন ভয় পাবে না ? তুই কী করে জানলি ওদের বাড়িতে ওয়েষ্ট পেপার বাস্কেট আছে ?"

টিটো বলল, "সব বাড়িতেই থাকে। শুধু চিঠি পড়ে ভয় পাবে কেন ? মুণ্ডু ওড়াবার ক্ষমতা যে তোর আছে, তার কোনও প্রমাণ দিতে পারবি ?"

পাপান বলল, "আরও বেশি ভয় দেখিয়ে চিঠি লিখব !"

টিটো বলল "ধুত ! ওতে কিছু হবে না। অন্য রাস্তা ভাব।"

পরদিন বিকেলে ব্যাডমিণ্টন খেলতে না গিয়ে টিটো দৌড়ে-দৌড়ে চলে এল পাপানের বাড়িতে। ছাদে টেনে নিয়ে গেল। তারপর দারুণ উত্তেজিতভাবে বলল, "আজ ইস্কুলে কী দেখলাম জানিস ! ওই ছেলে দুটো আমাদের ইস্কুলেই পড়ে !"

"ওই ছেলে দুটো মানে ?"

"রঘু চৌধুরীর দুই ছেলে। ওদের নাম অজয় আর সুজয়। আমাদের জয়দেবের ভাই গোগো ওই সুজয়ের সঙ্গে এক ক্লাসে পড়ে। গোগো বলল, ওরা দুই ভাই-ই খুব ভাল। পড়াশুনায় ভাল, ব্যবহারও খুব ভদ্র ! ওই নীল গাড়ীটা ছুটির পর ওদের নিতে আসে।"

"তা হলে তো খুব কাছাকাছি এসে গেল রে !"

"রঘু চৌধুরীও হয়তো কোনওদিন স্কুলে আসবে। তারপর ওকে পেছন থেকে ল্যাং মারব ?"

"তার চেয়ে অনেক কঠিন শাস্তি দেওয়ার কথা আমার মাথায় এসে গেছে। শোন টিটো, মনে কর, তুই একদিন জানতে পারলি যে, তোর বাবা একজন চোর কিংবা খুনি—"

"অ্যাই কী হচ্ছে কী ? আমার বা কীরকম লোক, সবাই জানে।"

"আহা, সত্যি-সত্যি বলছি না ! ধর, যদি এমন হত ! তোর কিংবা আমার বাবাকে সবাই ভাল লোক বলেই জানে, হঠাৎ একদিন প্রমাণ বেরিয়ে গেল বাবা একজন খুনি, তা হলে তোর মনের অবস্থা কী হত ?"

"বাবাকে আমি ঘেন্না করতাম।"

"ঠিক তাই। রঘু চৌধুরী লোকটা তো সত্যিই খারাপ ! ওর ছেলে অজয় আর সুজয় তা

জানে না। ওরা বাবাকে ভালবাসে। ওদের আমরা সব কথা জানিয়ে দেব। প্রমাণ দেব। তখন ওরা বাবাকে ঘেন্না করতে শুরু করবে। সেটাই হবে রঘু চৌধুরীর শাস্তি।"

"গুড আইডিয়া, কিন্তু—"

"এর মধ্যে আবার কিন্তু কী ?"

"অজয় আর সুজয় অত ছোট···বাবা সম্পর্কে হঠাৎ ওইসব জানতে পারলে ওদের মনে খুব আঘাত লাগবে না ? ওদের তো কোনও দোষ নেই ! অন্য কিছু করা যায় না, পাপান ?"

"অন্য আর কী ?"

টিটো পাপানের কাছে মাথাটা নিয়ে এসে বলল, "তুই যে সেই চিঠির কথাটা বলেছিলি ?'

দু'জনে বুদ্ধি আঁটল অনেকক্ষণ ধরে।

পরদিনই রঘু চৌধুরী তার বাড়ির লেটার-বক্সে একটা চিঠি পেল। সাদা খাম। ভেতরে একটা সাদা পাতায় গোটা-গোটা অক্ষরে লেখা ঃ

"রঘু চৌধুরী, সাবধান !
তোমার পাপের কথা,
কুকীর্তির কথা সব বলে দেব
তোমার দুই ছেলেকে !
ইতি মেঘনাদ"

চিঠিটা পড়ে রঘু চৌধুরীর ভুরু কুঁচকে গেল। কুচি-কুচি করে ছিঁড়ে ফেলল বটে, কিন্তু সারাদিন তার মনটা খচখচ করতে লাগল।

পরদিন আর একটা চিঠি ঃ

"রঘু চৌধুরী, সাবধান !
তোমার ছেলে অজয়-সুজয়
কোন্ ইস্কুলে যায়, আমরা জানি
তোমার বহু পাপের প্রমাণ আছে
আমাদের হাতে।
অজয় আর সুজয়কে জানিয়ে দেব
সব কথা, সব কথা
লজ্জায় তাদের মাথা হেঁট হয়ে যাবে !
ইতি মেঘনাদ"

এবারে চিঠিটা ছিঁড়তে গিয়েও ছিঁড়ল না রঘু চৌধুরী। ভাঁজ করে পকেটে রেখে দিল।

সারাদিন কাজের ফাঁকে-ফাঁকে চিঠিটা পড়তে লাগল বারবার। তার বুক ঢিপঢিপ করছে। জীবনে সে কখনও এত ভয় পায়নি। নিজের ছেলে দুটিকে সে সত্যিই খুব ভালবাসে।

এবার এল তিন নম্বর চিঠি ঃ

"রঘু চৌধুরী, সাবধান!

আর সময় নেই।

তুমি চাও তোমার ছেলেরা তোমায়

ঘেন্না করুক?

সব বলে দেব, সব!

এখনও যদি বাঁচতে চাও

কাল সকাল সাতটায় দেখা করো

বিবেকানন্দ পার্কে বড় ছাতিম গাছের তলায়

ইতি মেঘনাদ

পুঃ ঃ একা আসবে!"

এবার রঘু চৌধুরী ধরে নিল, যে তাকে ভয় দেখাচ্ছে, সে টাকা চায়। ব্ল্যাকমেইল! তার মুখখানা হিংস্র হয়ে উঠল, চিঠিখানা টুকরো-টুকরো করে পা দিয়ে মাড়িয়ে সে ড্রয়ার খুলে বার করল একটা রিভলভার!

পরদিন ঠিক সকাল সাতটায় রঘু চৌধুরী বিবেকানন্দ পার্কে এসে হাজির। বড় ছাতিম গাছটার কাছে এসে সে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। সেখানে বসে আছে একটা তেরো-চোদ্দ বছরের হাফপ্যাণ্ট-পরা রোগা ছেলে, তাকে সে পাত্তা দিচ্ছে না। তার ধারণা, কোনও বিকট চেহারার গুণ্ডা লুকিয়ে আছে কাছেই। পকেটে হাত দিয়ে সে চেপে ধরে আছে, রিভলভারটা।

পাপান হাতছানি দিয়ে ডেকে বলল, "এই যে চৌধুরীমশাই, এদিকে আসুন! আমিই মেঘনাদ!"

রঘু চৌধুরীর মাথায় যেন আগুন জ্বলে গেল। দাঁত কিড়মিড় করে বলল, "হতভাগা ছেলে! আমার সঙ্গে ইয়ার্কি? মেরে তোর মুখের সব কটা দাঁত ফেলে দেব!

একটুও ভয় না পেয়ে পাপান বলল, "আমাকে ওরকম শাসাবে না, কোনও লাভ নেই। একটু দূরেই দাঁড়িয়ে আছে আমার বন্ধুরা। আপনি আমার ওপর আক্রমণ করতে এলেই তারা এসে ঝাঁপিয়ে পড়বে। একজন পুলিশে খবর দেবে। তাতেই তোমার দুই ছেলে সব জেনে যাবে।"

থমকে গিয়ে রঘু চৌধুরী বলল, "তুই কী চাস? কত টাকা?"

পাপান হা-হা করে হেসে উঠল।

রঘু চৌধুরী বলল, "শোন, আমি তোকে এক হাজার টাকা দেব। তারপর খবরদার আমার

ছেলেদের কাছে ঘেঁষবি না। যদি ওদের কিছু বলতে যাস, তোকে খুন করে ফেলব। নির্ঘাত খুন করে ফেলব!"

পাপান বলল, "আমাকে খুন করলেও আমার অন্য বন্ধুরা থাকবে। তারা তোমার ছেলেদের বলে দেবে, তুমি খুনি, তুমি স্মাগলার, তুমি বিনা কারণে অন্য ছেলেদের ধাক্কা মেরে মাটিতে ফেলে দাও! এইসব শুনে তোমার ছেলেরা তোমাকে ঘেন্না করবে। তোমাকে বাবা বলে মানতে চাইবে না।"

রঘু চৌধুরী এক পা এগিয়ে এসে বলল, "তুই কত টাকা চাস?"

পাপান বলল, "এক পয়সাও চাই না! তোমাকে ক্ষমা চাইতে হইবে! যদি ক্ষমা না চাও…"

রঘু চৌধুরীর শরীরটা কেঁপে উঠল। সমস্ত মুখটা কুঁচকে গেল। হঠাৎ সে মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে বলল, "ক্ষমা চাইছি! আর কক্ষনো এসব করব না! কাউকে ঠকাব না, কারও সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করব না। তুমি আমার ছেলেদের কিছু বোলো না। ওরা আমাকে এত ভালবাসে, বলো না প্লিজ, কিছু জানিয়ে দিয়ো না ওদের, আমি এখন থেকে আর কোনও অন্যায় করব না।"

বলতে বলতে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল রঘু চৌধুরী।

———

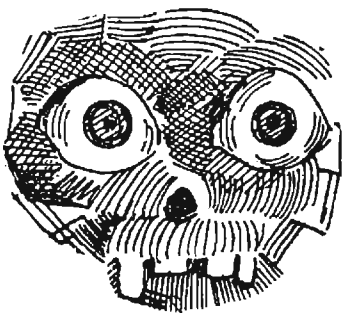

ফটিকের কেরামতি

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়



মাঝরাত্তিরে শিয়রের জানালাটায় মৃদু ঠুকঠুক শব্দ শুনে ঘুম ভেঙে গেল ফটিকের। ঘুম তার খুব পাতলা। সে উঠে হ্যারিকেনের আলোটা উস্‌কে দিয়ে জানালাটার দিকে সভয়ে চেয়ে রইল। আঁট করে বন্ধ রয়েছে পাল্লা। এত রাতে কারও আসার কথা তো নয়। চোর-ডাকাত যে নয় তা ফটিক জানে। কারণ চোরের বাড়িতে চোর আসে না। তবে কে হতে পারে?

ফটিক গলাখাঁকারি দিয়ে খুব বিনীতভাবেই জিজ্ঞেস করল, "কে আজ্ঞে? কী চাইছেন?"

ওপাশ থেকে একটা ভারী গলা চাপা স্বরে বলল, "জ নালা খোল। দরকার আছে।"

"কী দরকার?"

"তোমার কিছু রোজগার হবে।"

রোজগার জিনিসটা ফটিক বড় ভালবাসে। রোজগারের মতো জিনিস নেই। গত দিন দশেক তার এক পয়সাও রোজগার হয়নি। দিনেরবেলা সে বেড়া বেঁধে বেড়ায়। রাতেরবেলা একটু-আধটু চুরিটুরির চেষ্টা করত। দুটোর কোনটাতেই তার সুবিধে হচ্ছে না। কচু-ঘেঁচু খেয়ে দিন কাটছে। একা-বোকা মানুষ বলে চলে যায়।

ফটিক বুকে একটু সাহস এনে জানালাটা খুলল। কিন্তু বাইরে অন্ধকারে কাউকে দেখা গেল না। ফটিক একটু ভয়ে-ভয়ে উঁকিঝুঁকি দিল। হঠাৎ দস্তানা-পরা একখানা হাত তলার দিক থেকে উঠে এসে কাগজ মোড়া একটা প্যাকেট ছুঁড়ে দিল তার পায়ের কাছে। ফটিক চমকে উঠে নিচু হয়ে প্যাকেটটা কুড়িয়ে নিল। বেশ ভারী জিনিস।

বাইরে থেকে ভারী গলাটা বলল, "ওটা একটা পিস্তল। গুলি ভরা। সঙ্গে পাঁচশ টাকা আছে। কাজটা করতে পারলে আরও পাঁচশো।"

পিস্তল! ফটিকের হাত-পা কাঁপতে লাগল। বলল, "আজ্ঞে এ যেঁ ভয়ঙ্কর জিনিস।"

"শুনতে ভয়ঙ্কর, ব্যবহার করা খুব সোজা।"

"কাজটা কী বলবেন?"

"বঙ্কুবাবুর মেয়ের বিয়ে পরশুদিন। হাজার লোকের নেমন্তন্ন। দেড়শো বরযাত্রী আসবে। বাজি-টাজি ফাটবে। তোমার কাজটা হল, গোলমালে হরিবোল। ভিড়ের মধ্যে এক ফাঁকে বঙ্কুবাবুর কাছাকাছি চলে যাবে। নলটা পিঠের বাঁ দিকে ঠেকাবে, ঘোড়াটা টেনে দেবে, ব্যস।"

"ওরে বাবা!" ফটিক ঘামতে লাগল।

"কোনও ভয় নেই। সন্ধ্যে সাতটা থেকে বাজি ফাটবে। শব্দটা কেউ লক্ষ্যই করবে না। কাজ সেরে পিস্তলটা কোমরে গুঁজে ফেলবে। তাড়াহুড়া না করে ভিড়ে মিশে দাঁড়িয়ে থাকবে, আহা-উহু করবে। থানা থেকে পুলিশ আসতে অনেক দেরি হবে। ততক্ষণে বেরিয়ে নদীর ধারে বটতলার বাঁধানো চাতালের কাছে গিয়ে দেখবে ইট চাপা দেওয়া আরও পাঁচশো টাকা রয়েছে। টাকাটা নিয়ে পিস্তলটা ওখানেই রেখে চলে আসবে। তোমার কিছু হবে না। কোনও ভয় নেই। কিন্তু আমাদের প্রস্তাবে রাজি না হলে তিনদিনের মধ্যে তোমাকে খুন করা হবে।"

ফটিক আঁতকে উঠে বলল, "তা বঙ্কুবাবুকেও কেন আপনারাই সাবাড় করছেন না। আমি যে জীবনে খুনখারাপি করিনি।"

"আমাদের অসুবিধে আছে। কাজটা তোমাকেই করতে হবে।"

"আমি কি পারব আজ্ঞে?"

কেউ কোনও জবাব দিল না। একটা পায়ের শব্দ দূরে চলে গেল।

ফটিক ধপ করে মেঝেতে বসে পড়ল। তার মাথা ঘুরছে, গলা শুকিয়ে কাঠ, বুক এমন ধড়ফড় করছে যেন তবলার লহরা, খানিকক্ষণ বসে থেকে নিজেকে একটু সামলে নিয়ে সে ঢকঢক করে অনেকটা জল খেল। তারপর মোড়কটা খুলে পিস্তলটা দেখল। এসব জিনিস সে চোখেও দেখিনি আগে। বিদঘুটে চেহারা, তাকালেই ভয় হয়।

রাতে আর ফটিকের ঘুম হল না। সারা রাত আকাশ-পাতাল ভেবে মাথাটাই গরম হয়ে গেল। খুনখারাপি তার লাইন নয়। রক্ত দেখলে সে এখনও ভিরমি খায়। সে সামান্য চুরিটুরির চেষ্টা করে বটে, কিন্তু তাতেও তার হাতযশ নেই। নিতান্ত অভাবে পড়েই চেষ্টা করতে হয়, নইলে চুরিও তার লাইন নয়। দুটো পেটের ভাতের জোগাড় হলে সে কস্মিনকালেও চুরি করত না। কিন্তু এরা যে তাকে খুনোখুনিতে কেন নামাতে চাইছে তা সে বুঝতে পারছে না। খুন না করতে পারলে খুন হতে হবে—কী সব্বোনেশে কথা! ঘনঘন জল খেতে খেতে তার পেট জয়ঢাক হয়ে গেল, তবু বারবার গলা শুকিয়ে যাচ্ছে।

সকালবেলা মাথায় হাত দিয়ে অনেকক্ষণ দাওয়ায় বসে রইল ফটিক। তার বাটিভর্তি পান্তা

পড়ে রইল। খিদেটা চাগাড় দিচ্ছে না। কাল বঙ্কুবাবুর মেয়ের বিয়ে। আর কালকেই তাঁকে খুন করতে হবে।

মেয়ের বিয়ে বেশ জাঁকিয়েই দিচ্ছেন বঙ্কুবাবু। তাঁর মেলা পয়সা। চার-পাঁচ রকমের ব্যবসা আছে। বঙ্কুবাবুর বাড়ি ফটিকের একরকম গাঁ ঘেঁষেই। রোজ দু'বেলা যাতায়াতের পথে সে দেখেছে, বিয়ের মস্ত আয়োজন হচ্ছে। বিশাল শামিয়ানা, দেবদারু দিয়ে তোরণ হচ্ছে, নহবত বসেছে। মেলা লোক খাটছে দিনরাত। দুঃখের বিষয়, এ-বিয়েতে ফটিকের নেমন্তন্ন নেই। হওয়ার কথাও নয়। তার মতো লোককে পোঁছে কে?

ভয়ে ফটিকের কেমন যেন হাঁফ ধরে যাচ্ছে। হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। কিন্তু কী করবে তা বুঝতে পারছে না। বঙ্কুবাবুর মতো পাজি লোক মারা গেলে তার কিছু যায় আসে না। কিন্তু খুন করাটায় তার ঘোর আপত্তি হচ্ছে।

ফটিকের মাথায় নানা ফিকির খেলছে। কিন্তু কোনওটাই মনোমতো নয়। একবার মনে হল, পালিয়ে যাবে। কিন্তু পালানোটা খুব বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। যারা তার পেছনে লেগেছে, তারা হয়তো নজর রাখছে। পুলিশের কাছে যাবে? গিয়ে লাভ নেই, পুলিশ তার কথা বিশ্বাস করবে না। উলটে পিস্তল রাখার দায়ে হাজতে পুরবে। বঙ্কুবাবুকে সব ভেঙে বলবে? লাভ কী? তিনি খুন না হলে সে নিজেই খুন হবে।

দুপুর অবধি মাথাটা পাগল-পাগল লাগল। তারপর নুন-লঙ্কা-তেঁতুল দিয়ে পান্তাটা খেয়ে নিল সে। পেট ঠাণ্ডা হল। মাথাটাও যেন একটু শীতল লাগতে লাগল। দাওয়ায় মাদুর পেতে শুয়ে সে ভাবতে লাগল। কে হতে পারে লোকটা? খুন করতে চায় কেন? তাকে দিয়েই খুনটা করাতে চায় কেন। বঙ্কুবাবুকে মেরে কার কী লাভ?

হঠাৎ তড়াক করে লাফিয়ে উঠল ফটিক। একটা কথা মনে পড়ে গেল তার। মাসতিনেক আগে বঙ্কুবাবুর বাগানের আগাছা পরিষ্কার করিতে মুনিশ খাটানো হয়েছিল। সেই দলে ফটিকও ছিল। সারাদিন খাটিয়ে মাত্র পঁচটি টাকা মজুরি দিয়েছিলেন বঙ্কুবাবু। খাবার জুটেছিল চিঁড়ে আর গুড়। তবে বড়ঘরের জানালার নীচে আগাছা কাটার সময় ফটিকের কানে একটা কথা এসেছিল। ফটিকবাবু যেন কাকে বলছেন, "ওই গ্যাঁড়াই আমাকে মারবে একদিন। তারপর সব গাপ করবে।"

এই গ্যাঁড়াটি কে তা ফটিক জানে না। কিন্তু চুপ করে বসে থাকলে তো সমস্যার সমাধান হবে না। সে পিস্তলটা বিছানার তোশকের তলায় লুকিয়ে রাখল। পাঁচশোটা টাকা ট্যাঁকে গুঁজল। গায়ে জামা দিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

বঙ্কুবাবুদের বাড়িতে সানাই বাজছে। মেলা লোকলস্কর খাটছে। তোরণে ফুলের তৈরি প্রজাপতি বসানো হয়েছে। লুচি ভাজার গন্ধে বাতাস ভুরভুর করছে। ফটিক বাড়িতে ঢুকে চারদিক দেখতে লাগল। তার মতো আরও অনেকেই দেখতে এসেছে। ফটকে দারোয়ানদের তেমন কড়াকড়ি নেই।

শামিয়ানার ওপরে বড়-বড় ঝাড়লণ্ঠন লাগানো হচ্ছে। ঘাড় উঁচু করে দেখছিল ফটিক। হঠাৎ কে যেন বজ্রমুষ্ঠিতে তার ডান হাতের কনুই চেপে ধরে বলে উঠল, "এই যে!"

ফটিক এমন আঁতকে উঠল যে মূর্ছা যাওয়ার জোগাড়। তোতলাতে-তোতলাতে বলল, "আজ্ঞে, আমি না। আমি কিছু করিনি।"

বঙ্কুবাবু কিন্তু মোটেই বিচলিত হলেন না। হাসি-হাসি মুখ করে বললেন, "তুই, ফটিক না।"

"যে আজ্ঞে।"

বঙ্কুবাবু হাসি-হাসি মুখ করেই বলেন, "একটু উপকার কর তো বাবা। কুমুদের দোকানে পাঁচ সের সুপারি রাখা আছে। আনার লোক নেই। এক ছুটে গিয়ে নিয়ে আয় তো।"

ফটিক ধাতস্থ হল। আঁতকে ওঠার ভাবটা চট করে কেটে গেল তার। কাল তো এ লোকটাকেই খুন করার কথা। ঘাবড়ালে চলবে কেন। সে হঠাৎ বলে বসল, 'লোক নেই কেন বঙ্কুবাবু? গ্যাঁড়াকেই তো পাঠাতে পারেন।"

বঙ্কুবাবু অবাক হয়ে বললেন, "গ্যাঁড়া! গ্যাঁড়াটা আবার কে?"

ফটিক সামান্য ঘাবড়ে গিয়ে বলে, "ওই যে, আপনার কী যেন হয়!"

আন্দাজে ঢিল মেরেছিল। বোধ হয় লাগল না।

বঙ্কুবাবু অবাক হয়েছিলেন। কিন্তু হঠাৎ ভ্রু-জোড়া কুঁচকে তার দিকে চেয়ে বললেন, "তোর তো সাহস কম নয়! জামাইকে দিয়ে সুপুরি আনাতে বলছিস। আর আমার বড়জামাই কি তোর ইয়ার যে গ্যাঁড়া-গ্যাঁড়া করছিস?"

ফটিক হাতজোড় করে বলল, "আজ্ঞে আমরা মুখ্যু-সুখ্যু মানুষ, কত ভুলভাল করে ফেলি!"

"যা সুমুখ থেকে। সুপারিটা নিয়ে আয়।"

পথে হাঁটতে হাঁটতে দুইয়ে-দুইয়ে চার করল ফটিক। বঙ্কুবাবুর দুটো মেয়ে, ছেলে-টেলে নেই। বঙ্কুবাবু মারা গেলে মেয়েরা ওয়ারিশান। বড়জামাই গ্যাঁড়া। তাকে চেনে না ফটিক। তবে একটা গন্ধ পাচ্ছে।

সুপুরি পৌঁছে দেওয়ার পর বঙ্কুবাবু একটা সিকি বকশিশ দিলেন। তারপর হাসিমুখ করেই বললেন, "হঠাৎ গ্যাঁড়ার কথা বললি কেন বল দিকি।"

"আজ্ঞে বুঝতে পারিনি।"

বঙ্কুবাবু একখানা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে আপনমনেই বললেন, "অকালকুষ্মাণ্ড। ছিবড়ে করে ছেড়ে দিচ্ছে আমাকে। আজ এটা দাও, কাল সেটা দাও।"

ফটিক বশংবদ দাঁড়িয়ে থেকে শুনে নিচ্ছিল।

"কী শুনছিস দাঁড়িয়ে?"

"আজ্ঞে, গালাগাল দিচ্ছেন তো, চলে গেলে বেয়াদপি হবে যে!"

"গালাগাল তোকে দিইনি।"

"তবে কাকে?"

"নিজের কপালকে। ওই যে দেখছিস না, চেহারা বাগিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, ওই আমার কপাল!"

যাকে দেখিয়ে দিলেন বঙ্কুবাবু তার বেশ লম্বা-চওড়া চেহারা। রং ফরসা, কোঁচানো ধুতি আর মুগার পাঞ্জাবি পরে ঘুরে ঘুরে ব্যবস্থা দেখছে।

"বেশ জামাইটি আপনার বঙ্কুবাবু।"

"হাঁ, একেবারে মনের মতো। এখন যা তো। জ্বলছি নিজের জ্বালায়।"

ফটিক লোকটিকে ভাল করে দেখে নিল। যাতে ভুল না হয়। তারপর ধীরে সুস্থে ফিরে এল। মনটা একটু হালকা লাগছে।

মাঝরাতে আবার জানালায় ঠকঠক। ফটিক জানালা খুলে অমায়িক গলায় বলে, "যে আজ্ঞে।"

ভারী গলা বলল, "মনে আছে তো!"

"খুব মনে আছে। বাকি টাকাটা দেবেন নাকি?"

"কাল পাবে। জায়গামতো। কাজে যদি গণ্ডগোল হয় তো মরবে।"

"আর বলতে হবে না!"

পরদিন ফটিক দোকানে গিয়ে ভাল করে সাঁটিয়ে খেল। দুপুরে ঘুমোলো, বিকেলে একটু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে গিয়ে হাজির হল বঙ্কুবাবুর বাড়িতে। সারা বাড়ি আজ যেন রাজবাড়ির মতো দেখাচ্ছে। আলোয় আলোয় স্বপ্নপুরী। ভিড়ে ভিড়াক্কার। বরসহ বরযাত্রীরাও সব এসে গেল সন্ধের মুখেই। গোলাপজল ছিটানো হচ্ছে চারদিকে। বঙ্কুবাবু সবাইকে "আসুন বসুন" করছেন। পাশে গ্যাঁড়া। সেও খুব সেজেছে!

বাজি পোড়ানো শুরু হল! বাজির শব্দে চারদিক একেবারে গমগম করতে লাগল। হঠাৎ ফটিক লক্ষ্য করল, গ্যাঁড়া এই এত ভিড়ের মধ্যেও আড়চোখে তাকে নজরে রাখছে।

ফটিক মনে-মনে হাসল। গ্যাঁড়া এক মুহূর্তের জন্যও বঙ্কুবাবুর কাছ থেকে নড়ছে না।

লোকজন যখন সামিয়ানার বাইরে এসে ভিড় করে ঊর্ধ্বমুখ হয়ে আকাশে আতসবাজি দেখছে, ঠিক সেইসময় ফটিক এগিয়ে গিয়ে গ্যাঁড়ার পেছনে দাঁড়াল। নলটা তার পিঠে ঠেকিয়ে বলল, "ইষ্টনাম স্মরণ করুন বঙ্কুবাবু।"

গ্যাঁড়া হঠাৎ আঁতকে উঠে বলল, "আমি বঙ্কুবাবু নাকি? আহাম্মক কোথাকার। ওই তো বঙ্কুবাবু।"

ফটিক মাথা চুলকে বলল, "ইস, বড্ড ভুল হয়ে যাচ্ছিল তো!"

গ্যাঁড়া দাঁতে দাঁত চেপে বলল, "গাধা কোথাকার! যাও যাও, কাজ সারো, আর সময় নেই।"

ফটিক একগাল হাসল, "বটে! তা টাকাটা জায়গামতো আছে তো!"

গ্যাঁড়া মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বলল, "আছে।"

"ঠিক তো!"

গ্যাঁড়া ঘুরে তার গালে একখানা চড় কষিয়ে দিয়ে বলল, "বেয়াদপ কোথাকার!"

ব্যাপার দেখে বঙ্কুবাবু এগিয়ে এলেন, "এ কী! কী হয়েছে?"

ফটিক গালে হাত বোলাতে-বোলাতে বলল, "বলব বাবু?"

গ্যাঁড়ার মুখটা হঠাৎ ছাইবর্ণ হয়ে গেল। আচমকা সে ভিড় ঠেলে অন্ধের মতো ছুটতে লাগল। তাকে আর দেখা গেল না।

বঙ্কুবাবু চালাক লোক। ফটিকের হাত ধরে ভিড় থেকে সরিয়ে নিয়ে গেলেন চট করে।

"ফটিক, ব্যাপারখানা কী?"

"ফটিক লজ্জায় অধোবদন হয়ে সবই বলল। খুব অপরাধী মুখ করে। কিন্তু বঙ্কুবাবুর মুখখানা চকচক করতে লাগল। একটু খুশির গলাতেই বললেন, "ব্যাটা অনেকদিন ধরেই নানা মতলব আঁটছিল। তুই বেজায় ভয় পাইয়ে দিয়েছিস। তোর বুদ্ধি আছে। ও ব্যাটা আর ইদিকে আসবে না শিগগির।"

বঙ্কুবাবু খুশি হলেই হাত-উপুড়। আর তাঁর হাত উপুড় মানেই পর্বত। বঙ্কুবাবু ফটিককে একখানা দোকান করে দিলেন। বেশ বড়সড় মুদির দোকান। আর বটগাছের তলায় পাঁচশো টাকাও পেয়ে গিয়েছিল সে। পিস্তলটা বঙ্কুবাবুকে দিয়েছিল ফটিক। বঙ্কুবাবু বললেন, "এটা আমারই জিনিস। গ্যাঁড়া গেঁড়েছিল।"

তা কথাটা হল, ফটিককে আর উঞ্ছবৃত্তি করতে হচ্ছে না।

———



আমিই গোয়েন্দা

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়



অনেকদিনের সাধ, ওই কলমটা কিনব, যেটা আমি মোক্তারবাবুর পকেটে দেখেছি। কী একটা কাজে গিয়েছিলুম। তিনি আমাকে দেখিয়েছিলেন। ভদ্রলোকের খুব কলমের শখ। আমারও কিছু কম নয়। তবে মোক্তারবাবুর প্রচুর পয়সা, আর আমি সামান্য কাজ করি। কলমটা নেড়েচেড়ে দেখেছিলুম লোভীর মতো। জাপানি কলম। টানলে বড় হয়। চেপে দিলে ছোট্ট এতটুকু। সোনার নিব। কোল্যাপসিবল কলম। কলমটা দেখার পর তিন রাত ঘুমোতে পারিনি! ওইরকম কলম আমার চাই। যতক্ষণ না পাচ্ছি, শান্তি নেই। লোভের মতো বিশ্রী অসুখ আর দুটো নেই।

মোক্তারবাবুকে জিজ্ঞেস করলুম, "কোথায় পাওয়া যায় এমন কলম?"

"এসব বিদেশি জিনিস, সহজে পাওয়া যায় না বাবা। খবর রাখতে হয়। তোমাকে আমি কয়েকটা ঠিকানা দিচ্ছি।"

তিনটে দোকানের ঠিকানা দিলেন। যা টাকা-পয়সা ছিল, সব পকেটে ভরে কলমের সন্ধানে বেরিয়ে পড়লুম। কলমটা আমার চাই-ই-চাই। অ্যাট এনি কস্ট। প্রয়োজন হলে হাতঘড়িটা বেচে দেব। কলমটার জন্য খেপে গেলুম। কলম ছোট হয়, কলম বড় হয়। সরু চুলের মতো রেখা পড়ে! ছাই রং। স্টেনলেস স্টিলের ব্যান্ড লাগানো। কী জিনিস তৈরী করেছে জাপান!

প্রথম দোকানের মালিক বললেন, "দু' পিস এসেছিল, বিক্রি হয়ে গেছে।" পরে আর আসবে কি না বলতে পারছেন না। দ্বিতীয় দোকানী বললে, ওরকম কলম তাঁরা জীবনে দেখেননি। শেফার আছে, পার্কার আছে, সবই জাতের কলম, নিতে হয় নিন। কলম ছোট হয়, কলম বড় হয়, তাতে আপনার কি! লিখবেন, না ম্যাজিক দেখাবেন!"

বেরসিক মানুষটিকে বোঝাই কী করে, সব কলমই তো লেখে, কিন্তু কোন কলম ছোট বড় হয়!

তৃতীয় দোকানের মালিক বললেন, "একটা আছে, তবে তাঁর কাছে নেই, আনিয়ে দিতে পারেন। অপেক্ষা করতে হবে। ঘণ্টাখানেক পরে কলমটা পাওয়া যেতে পারে। আপনি নেবেন তো, না দেখে ছেড়ে দেবেন।"

"আরে মশাই, আমি নেব। টাকা না হয় আপনি আগেই নিয়ে নিন।"

সহকারীকে কী একটা বললেন গুজরাতি ভাষায়, তিনি বেরিয়ে গেলেন। আমার অপেক্ষার পালা। সেই কলম আসছে। ছাই ছাই রং। স্টিলের ব্যাণ্ড! ছোট্ট, সোনার নিব। এই ছোট, তো টানলে বড়। সেই মুহূর্তে আমার মতো সুখী সারা কলকাতা শহরে আর একজনও কেউ ছিল কী! এক ঘণ্টা পরেই একটা কলমের মালিক হব আমি।

ব্যবসায়ীদের তল্লাট! কিছু দূরেই স্টক এক্সচেঞ্জ। শেয়ার মার্কেট। কলকাতার যত পয়সাওলা লোক চারপাশে ব্যস্ত, গণ্ডারের মতো ঘুরছেন। তাঁরা টাকা ছাড়া আর কিছু বোঝেন না। পাশেই চিনাবাজার। লরি, ঠেলা আর মোটরবাইকের গুঁতোগুতি। উত্তাল কলকাতা তিড়িংবিড়িং লাফাচ্ছে। তার মাঝে আমি এক পাগল কলমপাগল।

সময়টা কাটাতে হবে। কী করি। রাস্তায় দাঁড়ানো যাচ্ছে না। লোকের পর লোক গুঁতিয়ে চলে যাচ্ছে। এ-পাড়ায় কলকাতার সেই বিখ্যাত শিঙাড়ার দোকান। এক একবার জামদানি চেহারা। পুরোটাই ঘিয়ে ভাজা। ভাবলুম, এই গরম শিঙাড়া নিয়ে বসলে সহজেই অনেকটা সময় কেটে যাবে। একটু করে ভাঙব, ফুস করে গরম বাতাস বেরোবো, মুখে করে হু-হা করব। এ-পাড়ার সামোসা মরিচের ঝালে উগ্র! একটাকে কাবু করতেই একঘণ্টা কাবার।

দোকানটা তেমন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন নয়; কিন্তু খাবার উত্তম। উঁচু জায়গায় বসে ভীমের মতো এক ভদ্রলোক শিঙাড়া ভাজছেন। বিশাল কড়া, বিশাল তাওয়া। ভাল ঘিয়ের গন্ধে বাতাস আকুল! একটা নয়, দুটো শিঙাড়ার অর্ডার দিলুম। যা ভেবেছিলুম তাই, আগুন দিয়ে তৈরি। পাতার ওপর খেলাতে খেলাতেই সময় কেটে গেল। গরমে আর ঝালে জবুথবু হয়ে কলমের দোকানে হাজির হলুম। কলম এসে গেছে, আমার স্বপ্নের কলম। পাতলা প্লাস্টিকের খাপে। দাম দিয়ে কলম পকেটস্থ করে কলকাতার ভিড়ে ঝাঁপ মারলুম। ব্র্যাবোর্ন রোড ধরে হাঁটছি আর ভাবছি, কেউ জানে না, আমার কত সুখ! এই কলমটা পাওয়ার জন্যই আমি যেন জন্মেছিলুম। মিনিট দশেক হাঁটার পর মনে হল, কলমটা পাশপকেটে রাখার চেয়ে বুকপকেটে আটকে রাখাই ভাল। পাশপকেট থেকে যদি পড়ে যায়! ট্রামে-বাসে উঠছি না যখন, তখন পকেটমারের ভয় নেই। বুকপকেটে হৃদয়ের কাছাকাছিই থাক না। খাপ খুলে কলমটা বুকপকেটে রেখে হাঁটছি। একটু-একটু গান গাইছি। ভাবছি, প্রথম লেখাটা কী লিখব! আমার জামশেদপুরের বন্ধুকে একটা চিঠি! না, একটা কবিতা!

নিজের চিন্তায় মশগুল হয়ে পথ হাঁটছি। বুকপকেটে সেই আহামরি কলম। বেণ্টিঙ্ক স্ট্রিটে পড়লুম। যাব ভিক্টোরিয়া হাউসের দিকে। বাঁ দিকের ফুটপাত। তেমন একটা ভিড় নেই।

ভিক্টোরিয়া হাউসের কাছে ইলেকট্রিক বিলের চেক ফেলব। গেটের কাছে বরাবর গিয়ে বুকপকেটের দিকে তাকিয়ে দেখি পেনটা নেই।

মাথা ঘুরে গেল।

পাশপকেটে নেই বুকপকেটেও নেই। কোথাও নেই। মাথা ঘুরে গেল। পেন পকেটমার। বাসে-ট্রামে উঠলুম না। ফাঁকা রাস্তা দিয়ে এলুম। পকেটমার এল কোথা থেকে! এ কি ইটালিয়ান পকেটমার! শুনেছি ইটালির পকেটমাররা অসাধ্য সাধন করতে পারে! সামনে, পেছনে যত দূর দৃষ্টি যায়, তাকালুম। পকেটমারের মতো কাউকেই দেখলুম না। সব নিরীহ, শান্ত ভদ্রলোক নিজেদের কাজে আসা-যাওয়া করছেন।

চোখে জল এসে গেল। ভগবান! কলমটা তুমি দিয়েও নিয়ে নিলে। এ কোনও মানুষের কাজ নয় ভগবান, এ তোমারই খেলা। তবু মন মানতে চাইছে না। কলমটা এইভাবে ভ্যানিশ হয়ে যাবে? এইভাবে আমি বোকা বনে যাব?

অনেকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলুম। এতটাই বোকা আমি! পকেট থেকে পড়ে যায়নি। যেতে পারে না। ক্লিপের গ্রিপটা যথেষ্ট ভালই ছিল। আমি একবারও সামনে ঝুঁকিনি। সেই কখন থেকে খাড়া হেঁটে আসছি। অদৃশ্য কোন হাত কলমটা তুলে নিয়েছে। আমার ধারে কাছে কেউ আসেনি। কোনও ভিড় ছিল না। কেউ গা ঘেঁষাঘেঁসি করেনি। তা হলে হাতটা এল কোথা থেকে!

ভাবতে ভাবতে নিজেই একজন গোয়েন্দা হয়ে গেলুম। ফেলে আসা পথের দিকে তাকালুম। বোম্বে সুইট্স-এর দোকানটা যেখানে, সেখানে আমি একবার পকেটে হাত চেপে রেখেছিলুম পেনটা আছে। বোম্বে সুইট্স থেকে ভিক্টোরিয়া হাউস, এর মাঝেই ঘটনাটা ঘটে গেছে। যখন আসছিলুম, তখন আমার বাঁ দিকে সার-সার দোকান। পরিষ্কার ফুটপাত ধরে হাঁটছি। ডানপাশে রাস্তা। এই তো ঘটনা। আমার ত্রিসীমানায় কেউ আসেনি। বলো গোয়েন্দা, কে আমার কলম নিয়েছে! ভূতে!

ফেলে-আসা ফুটপাথের মাঝামাঝি জায়গায়, একপাশে দাঁড়িয়ে একটা লোক গামছা বিক্রি করছে। একটা গামছার পাট খুলে দু' হাতে ধরে দোলাচ্ছে এ-পাশে ও-পাশে আর হাঁকছে, "গামছা, গামছা।" গামছার ঝাপটা কোনও-কোনও পথচারীর গায়ে লাগছে। এইরকম একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে লোকটা গামছা বিক্রি করছে কেন? আবার গামছাটা বিছিয়ে এ-পাশ, ও-পাশ দোলাচ্ছে। মাথায় একটা ঝলক খেলে গেল।

লোকটার দিকে এগিয়ে গেলুম।

ভেবেছে, খদ্দের!

ঝপ করে গামছার কোণটা চেপে ধরলুম। তলার দুটো কোণ একসঙ্গে। শক্ত। শক্তমতো একটা কী ঝুলছে! লোকটা অবাক হয়ে বললে, "কেয়া বাবু?"

"মেরা কলম।"

"কলম?"

আমি ততক্ষণে ঝুলন্ত কলমটা গামছার জালি-জালি আঁচল থেকে উদ্ধার করে ফেলেছি। আমার সেই ছাই-ছাই রঙের সুন্দর জাপানি কলম।

লোকটা হতভম্ব। বলছে, "মেরা কুছ কসুর নেহি।"

কলম পেয়ে গেছে। সেই আনন্দেই আমি বিভোর। লোকটাকে আর বলব কী! পরে এক পুলিশ-অফিসার আমাকে বলেছিলেন, ওই গামছাঅলা খুব ইনোসেণ্ট ছিল না। ওটাও একটা কায়দা।

না, তা নয়, লোকটা নিরপরাধ। কারণ, লোকটাকে ধরার আগে আমি অনেকক্ষণ তাকে চোখে-চোখে রেখেছিলাম। লোকটা আপন মনে গামছা দোলাচ্ছে। দুলিয়েই যাচ্ছে। অসৎ উদ্দেশ্য থাকলে, বঁড়শি থেকে মাছ খুলে নেওয়ার মতো গামছা থেকে পেনটা খুলে নিত। তা করেনি।

আবার এও হতে পারে, লোকটা আমাকে নজরে রেখেছিল।

কি জানি কী?

———



ড্রাগন হাড়

অদ্রীশ বর্ধন

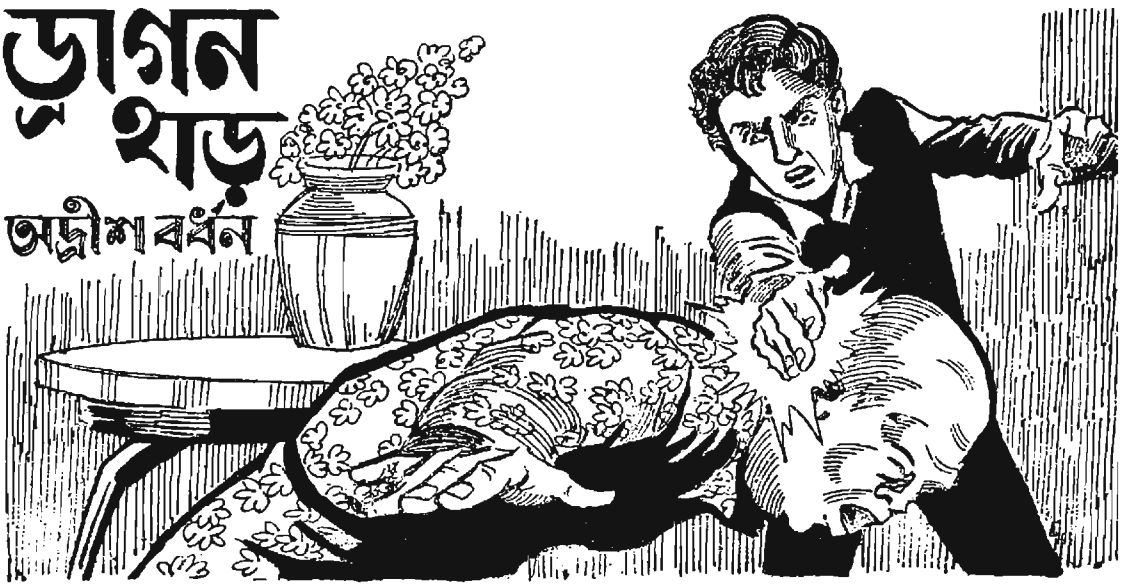

ইন্দ্রনাথ রুদ্রর দু' চোখে এখন যেন দুটো হিরের কণা ঝিলিক তুলছে টেবিল ল্যাম্পের আলোর নীচে রেখে সে একদৃষ্টে চেয়ে আছে যে-জিনিসটার দিকে, সেটা একটা পুরনো হাড়।

ওর সামনে চেয়ার টেনে বসে রয়েছে একজন চিনেম্যান। যথেষ্ট বয়স হয়েছে। মুখের চামড়া ভাঁজ খেয়েছে, ঝুলে পড়েছে। নাকের নীচে রোঁয়ার মতো হলদেটে গোঁফ ঠোঁটের দু' কোণ দিয়ে ঝুলছে। লোকটার দাড়ি বেশ লম্বা। দাড়ির ওপর আঙুল বুলিয়ে যাচ্ছে বারবার—পরিষ্কার দেখছি, থির থির করে কাঁপছে রোগা, সরু আঙুল। তিনটে আঙুলে ঝিকমিক করছে তিন ধরনের পাথর বসানো আংটি। গলায় দুলছে লাল আর নীল পুঁতির মালা। গায়ে পুরনো আমলের আলখাল্লা। হলুদ জমির ওপর লাল ড্রাগন—ছুঁচ আর সুতোর কারুকাজ! মাথায় একদম চুল নেই। কিন্তু চুল আছে বটে ভুরুতে—জট পাকিয়ে রয়েছে। বয়স হয়েছে তাই চোখের তেজ কমে এসেছে। কিন্তু টেবিল ল্যাম্পের আলো তার চোখে পড়ায়, ছ্যাতলা পড়া চোখের মণির তলায় দেখতে পাচ্ছি অদ্ভুত এক দ্যুতি। ঠিক যেন ছাইচাপা আগুন।

এর নাম চিঙলি। থাকেন এখানকার চিনেপাড়ায়, ইস্টার্ন মেট্রোপলিটান বাইপাসের ধারে। বিপদে পড়ে ট্যাক্সি নিয়ে চলে এসেছেন বেলেঘাটায়, সুভাষ সরোবরের পাড়ে, ইন্দ্রনাথের বাড়িতে।

আমি তখন ছিলাম সেখানে। তাই দেখলাম রহস্যময় সেই হাড়। আর শুনলাম আশ্চর্য সেই কাহিনী।

হাড়টা চ্যাটালো। প্রায় চৌকণা। ইঞ্চিদেড়েক পুরু। মাঝে-মাঝে চিড় খেয়েছে। ফাটা রেখার গা-ঘেঁষে খোদাই করা অজস্র আঁকিবুকি।

ড্রয়ার টেনে ম্যাগনিফাইং গ্লাস বের করল ইন্দ্রনাথ। বিরাট কাচ। হাতের তেলোর মত বড়। হাড়ের হিজিবিজি লেখা আর ছবিগুলো অনেকক্ষণ খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখল।

তারপর ঘুরে বসল বুড়ো চিনার দিকে। চিঙলি তখন ঘাড় ঝুঁকিয়ে পিঠ কুঁজিয়ে অদ্ভুত চিকমিকে চোখে চেয়ে ছিলেন ইন্দ্রনাথের দিকে। টেবিল ল্যাম্পের আলো ঠিকরে যাচ্ছে চকচকে টাকমাথা থেকে জটপাকানো ভুরু দুটো আরও জটিল হয়েছে। একে তো বেঁটে থসথসে চেহারা, ওইভাবে কোলকুঁজো অবস্থায় বসে থাকায় আরও ঘাড়ে-গর্দানে ঠাসা মনে হচ্ছে।

ইন্দ্রনাথ ওর হিরে-ঝিকঝিকে চোখে চিঙলি'র অদ্ভুত আলোয়-ভরা চোখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ।

ঘর এখন নিস্তব্ধ। এত রাতে সুভাষ সরোবরের পাড়েও কেউ বেড়াচ্ছে না। গোটা তল্লাট তাই নিথর।

খুব আস্তে, খুব স্পষ্ট গলায় বলল ইন্দ্রনাথ, "এরই নাম ড্রাগন-হাড় ?"

"হ্যাঁ", পরিষ্কার বাংলায় কথা বলে চিনা বৃদ্ধ। গোটা জীবনটাই নাকি কেটেছে কলকাতায়। প্রথম পরিচয়েই তা জানিয়েছেন।

"কিন্তু", থেমে-থেমে বলল ইন্দ্রনাথ, "এ তো দেখছি কচ্ছপের খোলা।"

হাসলেন চিঙলি। চিনাদের চামড়া হলুদ হয়, দাঁত হলুদ হয়—এইরকম কত কথাই না শুনেছি। গল্পেই পড়েছি। কিন্তু এই বৃদ্ধের যে দাঁত দেখলাম, তার বাহার দেখিয়ে টুথপেস্টের বিজ্ঞাপন দিলে বাজার মাত হয়ে যাবে। হাতির দাঁতের মতো সাদা। মজবুত।

"বাবু আমার বয়স কত জানেন ? বাহাত্তর। দেখে কী মনে হয় ? বাহান্ন। বয়সটাকে কমিয়ে রেখেছি কীভাবে জানেন ? চাইনিজ বক্সিং করে, আর এই হাড়ের ওষুধ খেয়ে।"

"চাইনিজ বক্সিং!"

"খুব আস্তে দৌড়ই রোজ ভরে, শূন্যে ঘুষি, লাথি ছুড়ি দুপুরে, আর রাতে খাই ড্রাগন হাড়ের পাঁচন। সাহেবি ওষুধ একদম খাই না।"

"বেশ করেন। কিন্তু কচ্ছপের হাড়কে ড্রাগনের হাড় বলছেন কেন ?"

"ড্রাগনের হাড় তো বলছি না। ড্রাগন তো পুরাণের গালগল্প, ড্রাগন কি আদৌ ছিল ? ছিল না। কিন্তু এ-হাড়ের নাম দাঁড়িয়ে গেছে ড্রাগন-হাড়। কারণ এই হাড় গুঁড়িয়ে, এর সঙ্গে গাছগাছড়ার রস মিশিয়ে এমন পাঁচন তৈরি হয়, যা মানুষকে বুড়ো হতে দেয় না।"

"তাই তো দেখছি," ড্রাগন-হাড় নামিয়ে রেখে নস্যির গুঁড়ো ডিবে থেকে তুলতে তুলতে বলল ইন্দ্রনাথ, "কিন্তু রাত এখন দশটা। এত রাতে হাড়ের পাঁচন না খেয়ে আমার কাছে এলেন কেন ?"

"কারণ", কোল-কুঁজো বুড়ো আরও ঝুঁকে পড়লেন। চোখ আরও প্রদীপ্ত হল। গলা আরও খাদে নেমে এল, "কারণ, এ-হাড় তো আগের হাড়গুলোর মতো নয়।"

"কেন নয় ?"

"এ-হাড় গুঁড়িয়ে খেলে সর্বনাশ হয়ে যাবে, গুপ্তধনের সন্ধান আর কেউ পাবে না।"

আওয়াজ করে নস্যি নিল ইন্দ্রনাথ। দেওয়ালের টিকটিকিটাও বোধ হয় চমকে উঠে চেঁচিয়ে উঠল।

"হাড়ের গায়ে গুপ্তধনের নকশা আছে নাকি?" ইন্দ্রর প্রশ্ন।

"আছে।"

"আপনি জানলেন কী করে?"

"কারণ, আমি প্যালিওগ্রাফার। প্রাচীন ভাষার মানে বের করা আমার নেশা। চিনে ডাক্তারের ফরমুলা অনুযায়ী এই হাড় আমি কিনি চিনেপাড়ারই এক কিউরিও দোকান থেকে। এক-একটা হাড়ে অনেকদিন চলে। কিনে এনেই আমি পিকটোগ্রাম-এর মানেটা বুঝে নিই। পিকটোগ্রাম মানে বোঝেন তো?"

"একটু বুঝি। ছবি দিয়ে বর্ণমালা।"

"ড্রাগন-হাড়ের গায়ে খোদাই করা থাকে আদিম পিকটোগ্রাম। নখের ফালি মানে চাঁদ, বৃত্ত মানে সূর্য। এই দেখুন, এই যে চিহ্নটার মানে নারী, এটার মানে মুখের কথা, এটার মানে শিশু।"

চিঙলি যে-চিহ্নগুলো ড্রাগন হাড়ে দেখিয়ে গেলেন সরু আঙুলের ডগা দিয়ে, সেগুলো এইরকম ঃ

ইন্দ্রনাথ বলল, "বুঝলাম, গোটা হাড় ফেটেফুটে রয়েছে, গায়ে-গায়ে আঁকা কিম্ভূত ছবি। এর মধ্যে গুপ্তধনের সন্ধান পেয়েছেন?"

"হ্যাঁ। সেই থেকেই ফেউ লেগেছে পেছনে।"

"ফেউ!"

"বাবু, আমি বুড়ো হতে পারি, ভিতু নই। আমি নিজে যদি প্যালিওগ্রাফার না হতাম, তা হলে যে সাহেব হাড়টা কিনতে এসেছিল মোটা দাম দিয়ে, তাকেই বেচে দিতাম।"

ইন্দ্রনাথের চোখের পাতা দুটো স্থির হয়ে গেল, "সাহেব কিনতে এসেছিল।"

"আমি কিনেছি পরশু। গতকাল কিউরিও-র দোকান থেকে যত হাড় ছিল, সমস্ত কিনে নিয়ে যায় এই সাহেব। আজ সকালে সেই সাহেবই এসেছিল আমার কাছে।"

"কত দাম দিতে চেয়েছিল?"

"পাঁচ লাখ।"

"কচ্ছপের হাড়ের দাম পাঁচ লাখ।"

"শুরু করেছিল একশো টাকা থেকে। অন্য কেউ হলে দিয়ে দিত। কিন্তু আমি যে ওর মধ্যে গুপ্তধনের খবর পেয়ে গেছিলাম। তাই একশো কেন, এক কোটি দিলেও হাড় হাতছাড়া করব না বলেছিলাম। সাহেব তখন "বেশ, বেশ" বলে মোলায়েম হেসে চলে গেল। তার একটু পর থেকেই দেখলাম, বাড়ি পাহারা দিচ্ছে কয়েকটা ছোকরা। চিনেপাড়ারই ছোকরা। কিন্তু কেউই ভাল নয়। আমি আর দেরি করিনি—"

"আমাকে তখনই ফোন করেছিলেন। নাম্বার পেলেন কোথায় ?"

"টেলিফোন গাইডে। প্রেমচাঁদ আপনার বন্ধু ? প্রেমচাঁদ ডিটেকটিভ এজেন্সির প্রেমচাদ মালহোত্রা ?"

"হ্যাঁ।"

"আগে ওকে ফোন করেছিলাম। উনি তো দিল্লিতে বসেন। অফিস-ম্যানেজার হাড় নিয়ে মাথা ঘামাতে চাইল না। আপনার সঙ্গে কথা বলতে বলল। আপনি বললে, প্রেমচাঁদ কেস টেকআপ করবে।"

"বটে! বটে! সাহেব তা হলে ফেউ লাগিয়েছে আপনার পেছনে! ফেউ এর চোখ এড়িয়ে এখানে এলেন কী করে ?"

আবার সাদা হাসি হাসলেন কোল-কুঁজো বুড়ো, চিনেপাড়ার গলিঘুঁজি কাশীর গলিঘুঁজিকেও হার মানায়। এর রান্নাঘর, এর কলতলা, ওর ছাদ দিয়ে বেরিয়ে পড়া যায়।"

"লি সাহেব" বলল ইন্দ্রনাথ, "আপনার এই পাঁচন খাওয়ার যদি ইচ্ছে হয়, ফরমুলা কোথায় পাব ?"

"পাবেন না। এ-ফরমুলা প্রায় একশো বছরের পুরনো কাঠের ফলকে খোদাই করা। আমার ঠাকুরদা এনেছিলেন পিকিং থেকে। ড্রাগন-হাড়ের আবিষ্কারটা ঘটে যে বছরে, তার কয়েক বছর পরেই। আপনার চোখ দেখে মনে আছে, সে কাহিনী আপনি জানেন না। জানতে চান ? রাত প্রায় এগারোটা। ট্যাক্সি যখন ছেড়ে দিয়েছি মুগাঙ্কবাবুর গাড়ি করে না হয় বাড়ি ফেরা যাবে। তার আগে ইতিহাসটা বলে নিই। ১৮৯৯ সালে পিকিং-এর এক ডাক্তার ম্যালেরিয়া সারানোর জন্য একটা প্রেসক্রিপশন লিখে দিয়েছিলেন। ফ্যামেলির কর্তা প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী গাছগাছড়া আর ড্রাগন-হাড় কিনে এনেছিলেন। তাঁর নাম ওয়াং আইয়ুঙ। হাড়টা গুঁড়ো করতে গিয়ে তাঁর খটকা লাগল। কেননা, ড্রাগন-হাড় বলে তাঁকে যা গছানো হয়েছে, তা তো একটা কচ্ছপের খোলা। ফেটেফুটে চৌচির। অজস্র পিকটোগ্রাম আঁকা। ছবির মানে বোঝার শিক্ষা তাঁরও ছিল। কিছুটা মানে বুঝেই তাঁর চক্ষু চড়কগাছ হয়ে গেছিল। ফার্মাসিস্টের দোকান থেকে সমস্ত হাড় তিনি কিনে নিয়েছিলেন। রীতিমত গবেষণা শুরু করে দিয়েছিলেন। আর তাই জানতে পেরেছিলেন, হাড়গুলোর বয়স ৩৪০০ বছর, শাঙ রাজবংশের আমলের। ওয়াং আইয়ুঙ তাই নিয়ে বই লেখেন। সে-বই আছে আমার কাছে, তাতেই উনি দেখিয়ে দিয়েছিলেন, শাঙ রাজবংশ কিংবদন্তি নয়, সত্যিই ছিল। চিনদেশের প্রথম শিক্ষিত রাজবংশ, পৃথিবীর আদিমতম লিখন পদ্ধতি চালু হয়েছিল এই সময়েই। এখনও যা মরে যায়নি, টিকে রয়েছে।"

মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনছিলাম চিঙলি'র কাহিনী। ঘড়ির কাঁটা তখন রাত এগারোটা ছাড়িয়ে গেছে। টেবিল ল্যাম্পের নরম আলোয় বুড়ো চিনাকে মনে হচ্ছে যেন কয়েক হাজার বছর আগেকার মানুষ। ঘরের বাকি অংশ প্রায় অন্ধকার! বাইরে নিঝুম রাত। ভেজানো দরজার সামনে একঠেঙে দৈত্যের মতো জ্বলছে ঘেরাটোপ-দেওয়া একটা নীল বাতি।

দম নিয়ে ঘাড় ঝুঁকিয়ে একই রকম থামা-থামা গলায় বলে গেলেন, চিঙলি "ওয়াং আইয়ুঙ-এর আবিষ্কার টনক নড়িয়ে ছাড়ে চিনের পণ্ডিতদের। ড্রাগন-হাড় খোঁজার হিড়িক শুরু হয় তখন থেকেই। উত্তর চিনের নানা অঞ্চল খুঁড়ে বের করা হয় রাশি-রাশি ড্রাগন-হাড়। কোনও হাড়ই ড্রাগনের নয়। কোনওটা কচ্ছপের, কোনওটা গোরু বা মোষের কাঁধের চ্যাটালো হাড়। ঘষেমেজে পরিষ্কার করে নিয়ে গরম করা হত বলেই অত ফেটেফুটে যেত। তারপর গায়ে খোদাই করা হত ছবি। ১৯২৮ সালে চিনের সরকার আইন করে বেধড়ক খোঁড়াখুঁড়ি নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু খোঁড়াখুঁড়ি আজও চলছে।"

"শুধু একটা গর্তেই পাওয়া গেছে ১৭০০০ ড্রাগন-হাড়" বলে ফের সশব্দে নস্যি নিল ইন্দ্রনাথ। ফের চমকে উঠে 'ঠিক, ঠিক, ঠিক' করে উঠল দেওয়ালের টিকটিকি।

আর যেন বিষম ধাক্কা খেয়ে শিরদাঁড়া সোজা করে ফেলল কোল-কুঁজো বৃদ্ধ, "আপনি জানেন?

"জানি, শাঙ রাজবংশের সবশেষের রাজধানীর খবরও রাখি। মাটির তলা থেকে পাওয়া গেছে ৯২ ফুট লম্বা রাজপ্রাসাদ, প্রাসাদের পাশেই কারখানা বাড়ি, যেখানে তৈরি হত পাথরের যন্ত্রপাতি, হাড়ের ফলা বসানো তীর, কারুকাজ-করা ব্রোঞ্জের বাসনপত্তর। পাওয়া গেছে পাথরের ভিতের ওপর তৈরি ইটের বাড়ি, আর মন্দির, কাঠের থামের ওপরে ধরা ছাদ, পোর্সিলেনের মূর্তি, চাকাওলা গাড়ি, আর রাশি-রাশি নরকঙ্কাল।"

"পাতালঘরে," থেমে-থেমে বলল চিঙলি, "গণহত্যার রেওয়াজ ছিল রাজবংশে। কারিগরদের জ্যান্ত পুঁতে ফেলা হত বাড়ির দেওয়ালে। জানেন তো?"

"জানি, লি সাহেব, তাও জানি। কিন্তু আপনি কি জানেন, এত জিনিস থাকতে লেখবার জন্য কেন হাড় বেছে নেওয়া হয়েছিল? কেন অমন অস্বাভাবিকভাবে প্রতিটা হাড় ফেটেফুটে থাকত? আর কেনই বা পিকটোগ্রাম আঁকা হত ফাটা আর চিড়গুলোর গা ঘেঁষে?"

থমথমে বুড়ো চিঙলি এখন যেন পাথরের মূর্তি, ভুরুর জঙ্গলে কিন্তু প্রবল আন্দোলন চলছে। কাঁপছে হাতের আঙুল।

ইন্দ্রনাথ বলল, "জানেন, জানেন, তাও জানেন। ভবিষ্যদ্বাণী করার জন্য হাড় বেছে নিয়েছিল ভবিষ্যৎদ্রষ্টারা। ব্রোঞ্জের শলাকা তাতিয়ে হাড়ের গায়ে চেপে ধরা হত, হাত ফেটে যেত, চিড়গুলোর চেহারা দেখে ভবিষ্যৎবক্তা বলে যেত কী ঘটবে। প্রশ্নটা আগে লেখা হত হাড়ের গায়ে। ব্রোঞ্জের শলাকা টিপে ধরা হত তার পাশে। জবাব ফুটে উঠত ফাটাফুটোর মধ্যে, যার মানে উদ্ধার করার ক্ষমতা ছিল শুধু জাদুকর পুরুতঠাকুরের। ঠিক কি না?"

চিঙলি'র মুখে কথা নেই। চোখ দুটোয় আশ্চর্য সেই আলো কিন্তু আরও জোরালো হয়েছে। চোখের গহনে যেন একজোড়া পিদিম জ্বলছে।

ইন্দ্রনাথ বলে গেল শক্ত গলায়, "রাজা হয়তো লিখলেন, এ-যুদ্ধে জিতব কি? জাদুকর পুরুত

শুধু হ্যাঁ বা না লিখে হাড় ফেরত পাঠাত রাজাকে। হাজার-হাজার বছর ধরে এইভাবে ভবিষ্যদ্বাণী দেশের লোক আর রাজবংশ নিজেদের চালিয়ে নিয়ে গেছে। এরই নাম ড্রাগনের হাড়। লি সাহেব, আজ আপনি এই হাড়ের মধ্যে পেয়েছেন গুপ্তধনের নকশা। কোথায় সেই গুপ্তধন, তা কি বলবেন?"

"না," চিঙলি'র নাভিমূল থেকে যেন উঠে এল ছোট্ট জবাবটা।

ভারী মিষ্টি হাসল ইন্দ্রনাথ, "কিন্তু আমি যে জানি লি সাহেব। চিনের উত্তরে হোনান নামে একটা অঞ্চল আছে না? আধুনিক চিনের লোক যখন মন্দির ভাঙতে শুরু করে, তখন একটা মন্দির একেবারে মিশে গেছিল মাটির মধ্যে। কিন্তু বেশ কয়েক বছর ধরেই গুজব শোনা যাচ্ছিল, শাঙ রাজবংশের গুপ্ত কোষাগার ছিল ওই মন্দিরের গর্ভগৃহে। মন্দিরের ঠিকানাটাই কেবল পাওয়া যাচ্ছিল না," দম নিল ইন্দ্রনাথ। চিঙলি'র চোখে চোখে চেয়ে ছুঁড়ে দিল শেষ কথাটা, "আপনার এই ড্রাগন-হাড়ে রয়েছে সেই ঠিকানা।"

"এত ন্যাকামি করার কী দরকার ছিল?" এই প্রথম চিবিয়ে-চিবিয়ে কথা বলতে শুনলাম চিঙলিকে, "গুপ্তধনের নকশা জানতে পেরেছি বলেই তো আপনার কাছে আমি এসেছি। ফেউ লেগেছে বলেই—"

"লি সাহেব," অকস্মাৎ যেন আকাশের বাজ ফেটেপড়ে ইন্দ্রনাথের গলার মধ্যে, "আর তঞ্চকতা করবেন না। ফেউ আপনার পেছনে লেগেছে ঠিকই, কিন্তু সে-ফেউ চায় চিনের মঙ্গল।"

"কী বলতে চান?" আস্তে-আস্তে উঠে দাঁড়ান চিঙলি। এখন আর তাঁকে কোল কুঁজো মনে হচ্ছে না। এতক্ষণ যেন ইচ্ছে করে বেঁটে সেজে ছিলেন। এখন দিব্যি লম্বা। লোমশ ভুরুর জঙ্গল প্যাগোডার চেহারা নিয়েছে।

ইন্দ্রনাথ নস্যির ডিবের দিকে ডান হাত বাড়িয়েই আচমকা বাঁ হাত দিয়ে পাঞ্জাবির তলা থেকে টেনে বের করল ওর অতিপ্রিয় নিকশ-কালো রিভলভারটাকে। ট্রিগারে আঙুল রেখে নলচের মুখ চিঙলি'র দিকে ফিরিয়ে বলল বাজের মত কড়া গলায়, "ফটাফট সর্দার, আজ আপনার খেল খতম। আসুন আপনারা।

আমাকে বিলকুল হতভম্ব করে দিয়ে ভেজানো দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকল প্রথমে জয়ন্ত, আমাদের পুলিশ বন্ধু, তার পেছনে একজন তালঢ্যাঙা সাহেব, মুখে বিরাট হাসি, তার পেছনে প্রেমচাঁদ মালহোত্রা, পৃথিবীজোড়া ডিটেকটিভ এজেন্সির কর্ণধার, ইন্দ্রনাথের প্রাণপ্রিয় বন্ধু।

ইন্দ্রনাথ আর নস্যি নেয়নি। ডান হাত দিয়ে সোফা দেখিয়ে বলল, আপনারা লাইন দিয়ে বসে পড়ুন। লি সাহেব, আপনিও দয়া করে বসুন। পা টনটন করবে, বয়স তো কম হল না। আপনার গল্প অনেক সত্যি আছে। মিথ্যে একটাও নেই, কিন্তু একটা কথা স্রেফ চেপে গেছেন। মৃগাঙ্ক অনেকক্ষণ ধরে অবাক হয়ে আপনার চোখ দেখছে। কিন্তু আমি হইনি। আপনার চোখের মধ্যে যেন আলো জ্বলছে। এ আলো আপনার আধ্যাত্মিক শক্তির। যে শক্তি ছিল নস্ট্রাডামুসের—পেতলের

তেপায়ার ওপর জলের পাত্র রেখে গভীর রাতে সেদিকে চেয়ে দু-তিন হাজার বছর পরের ভবিষ্যৎ যেন দেখতে পেতেন। নেপোলিয়ন, হিটলারের কথা উনি বলে গেছিলেন। এই দু'জনকে বলেছিলেন অ্যান্টিক্রাইস্ট। তৃতীয় অ্যান্টিক্রাইস্টের কথাও বলেছিলেন। হেঁয়ালি ছড়ার ব্যাখ্যা যা দাঁড়িয়েছে, তাতে মনে হয়, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ লাগানোর জন্য এই শতকের শেষের দিকে চিনদেশ থেকেই আবির্ভূত হবে থার্ড অ্যান্টিক্রাইস্ট। লি সাহেব, আপনার এই ড্রাগন-হাড়ে রয়েছে সেই একই ইঙ্গিত। আর রয়েছে বিশাল এক ধনভাণ্ডারের সন্ধান, যা কাজে লাগাবে তৃতীয় অ্যান্টিক্রাইস্ট। নস্ট্রাডামুসের যে-ছড়াগুলো পাওয়া যায়নি, কে জানে তাদের মধ্যে এই গুপ্তধনের কথা বলা হয়েছিল কি না। কিন্তু আপনি তা জেনেছিলেন। আপনি পেট চালাতেন বে আইনি বাজি ধরার ওপর ভবিষ্যদ্বাণী করে। আপনি ছিলেন এই গোলমেলে কাজের মধ্যে। ও কী! মাথা ঘুরছে নাকি?

চিঙলি'র মাথা ঝুঁকে পড়েছিল বুকের ওপর। জোরে শ্বাস নিচ্ছেন। চোখের পাতা বোজো। স্ট্রোক হয়ে গেল নাকি?

প্রেমচাঁদ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "ইন্দ্রনাথ, থাক, এখন থাক।"

"থাক তা হলে। 'ট্রান্স' শুরু হয়েছে মনে হচ্ছে। ঘোর এসেছে। লি সাহেব···লি সাহেব··· শুনতে পাচ্ছেন?"

ঘড়ঘড় গলায় বললেন বুড়ো লি, "শুনছি।"

"কী দেখছেন?"

"বাক্স-বাক্স সোনা, হিরে।"

"আর কী দেখছেন?"

"থার্ড অ্যান্টিক্রাইস্ট।"

"কী রকম দেখতে?"

"ভয়ঙ্কর।"

"কোন দেশের লোক""

ঝুঁকে পড়া চিঙলি'র মাথার ওপর ঝুঁকে পড়ে প্রশ্নটা করেছিল ইন্দ্রনাথ, তার জবাবটা যে আসবে এইভাবে, তা কল্পনা করিনি।

আচমকা দু'-পা গুটিয়ে এনে সবেগে ইন্দ্রনাথের পেটে পদাঘাত করলেন চিঙলি। একটা হাত তাঁর আগেই এগিয়ে গেছিল ইন্দ্রনাথের হাতের রিভলভারের দিকে,—আর খুলে গেছিল দু' চোখের পাতা। সে চোখে ঘোরে থাকার আভাস লেশমাত্র ছিল না।

ইন্দ্রনাথের ব্যারামপটু বডির ভোজবাজিও দেখা গেল সেই মুহূর্তে। সময় হলে ও যেন চিতাবাঘের মতোই ক্ষিপ্র হয়ে যায়। তাই চোখের সামনে দিয়ে বুঝি বিদ্যুৎ ঝলসে গেল।

জোড়া পায়ের লাথি পেটে লাগার আগেই একটু সরে গিয়ে ডান হাতের এক রদ্দায় চিঙলি'কে মাটিতে শুইয়ে দিল ইন্দ্রনাথ।

সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আমার দিকে ফিরে বলল, "অত অবাক হোসনি। সকালে ফোন করেছিলেন বুড়ো আমাকে দিয়ে ফেউ-এর নামধাম জানার জন্য। এই সাহেব শোগবি নিলামদার। চিনদেশ থেকে ওঁকে পাঠানো হয়েছে নিলাম হেঁকে সমস্ত ড্রাগন-হাড় উঠিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। থার্ড অ্যান্টিক্রাইস্ট আর গুপ্তধনের গুজবের অবসান ঘটানোর জন্য। কিন্তু চিঙলি তা জানতেন না। চোরের মন বোচকার দিকে থাকে। তিনি ভেবেছিলেন ওঁদের সেই সর্বনেশে খেলার আড্ডাখানার সন্ধানে পেছনে ফেউ লেগেছে। ড্রাগন-হাড় যদি হাতছাড়া হয়ে যায়, এই ভয়ে দৌড়ে এসেছিলেন আমার কাছে।"

আমি মিউ-মিউ করে বললাম, "কিন্তু তুই জানলি কি করে এত ব্যাপার?"

"সকালে ফোন পেয়েই গ্র্যাণ্ডে ফোন করে শোগবি-র এই সাহেবের সঙ্গে কথা বলে নিয়েছিলাম। আমি তো জানি, আমেরিকার এই বিখ্যাত নিলামদার কলকাতায় এসেছেন ভাল ছবি নিলামে চড়িয়ে বিদেশে বিক্রির জন্য। তাই সন্দেহ হয়েছিল—পুরনো দুষ্প্রাপ্য হাড় কিনতে চাননি তোর জয়ন্তকে নিয়ে গিয়ে চেপে ধরতেই উনি বললেন সমস্ত ড্রাগন-হাড় কেনার বায়না দিয়েছে চিনদেশেরই এক সংস্থা। প্রেমচাঁদ তারপরেই ফোন করে বলেন, ফটাফট ওই সর্বনেশে দিল্লী অফিসে হানা দিয়ে জেনেছে, কলকাতা আড্ডার সর্দার এক বুড়ো চিনে ম্যান। তারপর একটু পড়াশোনা করলাম, বাকিটা নাটক করে গেলাম! জয়ন্ত, ডেরাটা পেয়েছিস?"

"হ্যাঁ" বলল জয়ন্ত, "ছিমছাম একতলা বাড়ির ছাদে বাগান, পাতালঘরে এয়ারকণ্ডিশনিং উনিশ লক্ষ নগদ টাকা, রঙিন টিভি, ওয়াকি-টকি, কর্ডলেস টেলিফোন, বোমা, আর একটা পেতলের তেপায়া।"

"ভবিষ্যদ্বাণীর যন্তর। মিউজিয়ামে রেখেছিস," বলে হাই তুলল ইন্দ্রনাথ।

আমি কিন্তু অনেক রাত পর্যন্ত ইন্দ্রনাথকে ঘুমোতে দিইনি সেদিন! নিজে বাড়ি ফিরিনি। উত্তেজনায় চোখ থেকে ঘুম উড়ে গেছিল। কিন্তু আশ্চর্য মানুষ ইন্দ্রনাথের চোখে যেন বেশি ঘুম জড়ো হয়েছিল।

হাই তুলতে-তুলতে (আর নস্যি নিতে নিতে) আমার প্রশ্নগুলোর জবাব দিয়ে গেছিল এইভাবে ঃ

"ইন্দ্র, তুই কি গণৎকার?"

"না তো।"

"তা হলে কী করে জানলি, চিঙলি ভবিষ্যৎ দেখতে পারেন?"

"অপরাধ মহলের খবর রাখি বলেই জানি অদ্ভুত ক্ষমতাসম্পন্ন একজন চিনেম্যান নাকি বড়-বড় প্রশ্নের জবাব দিয়ে দিচ্ছেন, এমনকী রেসের কোন্ ঘোড়া জিতবে, তাও বলে দিচ্ছেন।

ইস্টবেঙ্গল মোহনবাগানের খেলা থেকে আরম্ভ করে উপসাগরের যুদ্ধে কে জিতবে, কে ভারতের প্রধানমন্ত্রী হবে। বোম্বাই, দিল্লী, মাদ্রাজ, কলকাতায় এইসব অনেক ব্যাপার নিয়ে লাখ-সাখ টাকার অদ্ভুত বাজি চালু হয়েছে। মদত দিচ্ছেন এক বুড়ো চিনে।"

"বুড়োর ফোন পেয়েই তাই তোর টনক নড়েছিল।"

"আজ্ঞে।"

"সাহেব কী করে জানলেন, বুড়োর কাছে ম্যাজিক-হাড় আছে।"

"ম্যাজিক হাড়! ভাল বলেছিস! কলকাতার একটা জায়গাতেই ড্রাগন-হাড় বস্তায় করে আনা হয়েছিল ১১২০ সালে—চিনে পাড়ায়। পুরানো চিনেপাড়া ভেঙ্গে যাওয়ায় বস্তা চলে যায় নতুন চিনেপাড়ায়—বাইপাসের ধারে। খবরটা সাহেবকে আগেই দিয়েছিল সন্ধানী লোকেরা।"

"কিন্তু প্রমাণ ছাড়াই বুড়োকে চার্জ করে গেলি কেন?"

"ধাক্কা দিয়ে মনের ভিত আলগা করে দিয়ে পেট থেকে কথা বের করার জন্য। কথায় কি না হয়, ভালমানুষ পাগল করা যায়, পাগলকে সুস্থ করা যায়।"

"গোপন ডেরার খবর জয়ন্ত পেল কী করে?"

"পুলিশকে প্রাইভেট এজেন্সি সাহায্য করে, প্রেমচাঁদ পৃথিবীর নানা জায়গায় শাখা অফিস রয়েছে। দেশে-দেশে বিভিন্ন বিষয়ের খবর ওঁর চাইতে বেশি কেউ রাখে না। ওর চর জানত ওদের আড্ডা কোথায়! তাই চিঙলি ওঁদের অফিসে যেতেই আমার কাছে ভিড়িয়ে দিয়েছিলেন। দিয়েই আমাকে ফোন করে জানিয়েছিলেন। সঙ্গে-সঙ্গে—"

"তুই জাল পেতেছিলি?"

"হ্যাঁ।"

বলেই হাই তুলে পাশ ফিরে ঘুমিয়ে পড়ল ইন্দ্রনাথ রুদ্র।

———



মাত্র একখানা খান ইট

আশাপূর্ণা দেবী



মাত্র মিনিট পাঁচেক আগে, যখন সকালের প্রথম চায়ের পেয়ালাটায় একটা চুমুক দিয়েই বঙ্কু হাঁক পেড়ে বলে উঠেছিল, "কী বউদি, চা-টা কি আজ ভুল করে চিরতার জলে ভিজিয়ে রেখেছিলে ?"

তখন কি দুঃস্বপ্নেও ভেবেছিল, পাঁচ মিনিট মাত্র পরেই সে আচমকা একটা খুনের আসামী হয়ে বসে সারা পৃথিবীটাকে ফুলেভরা সরষের খেত ভেবে দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে চোঁ-চোঁ দৌড় মারবে সরষের খেত-বিহীন অন্য কোনও পৃথিবীতে গিয়ে আছড়ে পড়বার আশায় ।

হ্যাঁ, আচমকা ওই খুনটা ঘটে যাওয়ার পরই দৌড় মেরেছিল বঙ্কু, আর মনে হচ্ছিল তার পিছু-পিছু ধেয়ে আসছে একটা তাজা রক্তের স্রোত, বঙ্কুকে গ্রাস করে ফেলবার জন্য। ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য ।

কিন্তু—

খুনটা হল কে ?

ওঃ। ভাবা যায় না !

একেবারে চিরকালের পাশের প্রতিবেশী গগন গাঙ্গুলি ! তিনপুরুষে পাশাপাশি বাস করার সূত্রে বঙ্কুর বাবা সত্যহরি সরকার যাঁকে 'দাদা' বলে এসেছেন, আর বঙ্কুবিহারী জ্ঞানাবধিই 'জেঠু' ডেকে এসেছে। সত্যহরি নেই, তাঁর বিয়োগ ঘটেছে। থাকলে কী বলতেন তাঁর পুত্ররত্নটিকে ?

কিন্তু বঙ্কুর কি কখনও খুন করবার কোনও মোটিভ ছিল ? জেঠুকে, অথবা আর কাউকে ? ···বঙ্কুর জন্য জগতে কেউ কখনও ভাবতেই পেরেছে, বঙ্কু হেন ছেলে, এমন একটা ঘটনা ঘটিয়ে বসতে পারে ?

অথচ সেটাই ঘটল। আর পালিয়ে বেড়ানো বঙ্কু অহরহ মনে-মনে ভেবে চলেছে, স্বর্গে চলে যাওয়া জেঠু বঙ্কুকে কি তাই ভাবছেন, না? ছিল তেমন কোনও মোটিভ! ভাববেন নাই-বা কেন?

বারেবারে কি তিনি বঙ্কুকে ওয়ার্নিংবেল দেননি? বলেননি, "ওরে বঙ্কা, ফের সেই গোঁয়ার্তুমি? তোর কপালে দেখছি খুনের দায়ে ফাঁসি যাওয়া লিখন রয়েছে!"

আর সেই তাঁকেই বঙ্কু—উঃ!

আহা, তিনি এখন আছেন কোথায়? স্বর্গে, না ইয়ে নরকে?···আঃ, ছি ছি! গগন গাঙ্গুলির মতন লোক! কিন্তু পুরুতঠাকুররা যে বলে, "অপঘাতে মড়ারা স্বর্গ পায় না!" তা হলে? স্বর্গ-নরক দুটোর মাঝখানে কোনখানটায় ঠাঁই পেলেন?···

তা অপঘাতই তো! আচমকা মাথায় একখানা থান ইট এসে পড়ায় রক্তগঙ্গা হয়ে রাস্তায় লুটিয়ে পড়ে যা হওয়ার তা হয়ে গেলে সেটাকে অপঘাত বলতে হবে না?

উঃ! সেই ইটখানা মাথায় পড়া মাত্র কী আকাশ-ফাটানো চিৎকারটাই করে বসেছিলেন চিরকালের শান্ত মানুষটা। চিৎকারটা যেন এখনও আকাশ জুড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে!

রাস্তাতেই কি পড়েছিলেন গগন গাঙ্গুলি? তাকে কি রাস্তা বলে? গোয়াবাগান বাই লেনের এ স্লাইন্ড গলিটাকে কি রাস্তা বলে? সবেমাত্র নিজের বাড়ির দরজাটি থেকে বেরিয়ে গলিতে পা ফেলামাত্রই পাশের বাড়ির ছাত থেকে সবেগে ধাঁই করে এসে তেল-চুকচুকে পাকা বেলের মতো টাক মাথাটিকে ফাটিয়ে চৌচির করে দিল!

সে ইট কার?

বঙ্কুর নয়?

গগনবাবুর গগনবিদারী চিৎকারের সঙ্গে-সঙ্গেই বঙ্কু ছাত থেকে নীচের দিকে তাকিয়ে দেখল! পরক্ষণেই হুড়মুড়িয়ে সিঁড়ি ভেঙে নেমে এসে নিজেদের বাড়ির দরজার খিলটা খুলে রকেটের বেগে ছুট মারল!

সেই বেগটা তাকে ছিটকে একেবারে এইখানে নিয়ে এসে ফেলেছে।···এখন যেখানে বসে রয়েছে বঙ্কু!

এখন? শুধু বসেই নেই। একটা অজ পাড়াগাঁর খোয়াখোঁদল মেঠো রাস্তার ধারে একটা হাতবিচ্ছিরি চালাঘর-এর চায়ের দোকানের সামনে বাঁশের বেঞ্চিতে বসে, পালকাটা মোটা কাচের একটা ময়লা চায়ের গেলাসে করে নিমপাতার রসের আস্বাদযুক্ত চা খাচ্ছে, মুখটা সিঁটকে-সিঁটকে।

এখন বঙ্কুর কাছে স্বপ্নের মতো লাগছে। তাদের সেই গোয়াবাগান বাই লেনের সাতকেলে পুরনো বাড়িটার দালানে, কেঠো টেবিলটার ধারে একখানা হাতলভাঙা আরও কেঠো চেয়ারে বসে বউদির হাতের চা-টায় চুমুক দিয়ে ঠাট্টা করে বলেছিল, "চিরতার জলে ভিজিয়েছে না কি?"

সেই বঙ্কু কি এই বঙ্কু?···

যে বঙ্কু কলকাতা থেকে কে জানে কত দূরে এই একটা দেহাতি জায়গায় বসে রামতেতো চা খাচ্ছে।

জায়গাটা স্রেফ অজ পাড়াগাঁর মতো দেখতে।

অতঃপর ? পালাতে হবে।···পালাতে হবে।

এখান থেকে আরও দূরে-দূরান্তরে পালাতে হবে।

এখন বঙ্কুর একটাই স্বস্তি। এই রক্তগঙ্গাটা ঘটে বসবার আগেই বঙ্কুর বাইরে বেরোবার সাজ-সজ্জাটি হয়ে গিয়েছিল। কাজেই চেহারায় ভদ্রস্থতা রয়েছে। একটু আগে যখন ল্যাতলেতে পায়জামা আর পিঠে জানলা-দরজাওয়ালা গেঞ্জিটা পরে বেড়াচ্ছিল, তখন যদি অমন হঠাৎ চোঁ-চোঁ দৌড়টা মারতে হত, তা হলে ? সে অবস্থায় রাস্তায় দেখতে পেলেই তো পুলিশ ধরত !

এখন বহির্দৃশ্যে কোনও অসুবিধে নেই। ···তা ছাড়া পকেটে টাকা-পয়সাও রয়েছে কিছু। অন্যদিনের চেয়ে বরং বেশিই কিছু। কারণ, আজ বঙ্কু তাঁর নিজের অর্গানাইজেশন গোয়াবাগান বাই লেনের কচিকাঁচাদের ফুটবল টিমের নতুন ফুটবল কেনার জন্য টাকা নিয়ে বেরোচ্ছিল।

টাকাটা আছে। তাই আর একটু দূরে পালাতে পারবার ভরসা হচ্ছে। ···কিছু না হোক, দৈনিক দু-এক কাপ চা খেয়ে-খেয়েও দু-চারদিন কাটিয়ে দেওয়া যায়।

কিন্তু এখানে হঠাৎ এসে পড়ল কেন বঙ্কু ?

'কেন'র কিছু নেই। দিশেহারা হয়ে চেনা পাড়া থেকে সরতে-সরতে কোনখানে যেন একটা বাস-গুমটিতে ঢুকে পড়েছিল। দেখল, এ হচ্ছে দূরপাল্লার বাস গুমটি।

একজন কনডাক্টর চেঁচিয়ে যাচ্ছিল, "ময়নাপুর···ময়নাপুর। ···লক্ষ্মীশোল···লক্ষ্মীশোল ঘাঁটুই···ঘাটুই !"

বঙ্কুর কানে প্রথমটাই ঢুকে পড়েছিল, আর ঢোকামাত্রই টার্মিনাসে বসে-থাকা প্রায়-খালি বাসটার মধ্যে সেঁধিয়ে পড়ে একখানা ময়নাপুর-এর টিকিট কেটে নিয়েছিল।

ময়নাপুর বলে কোনও জায়গায় বঙ্কুর চেনা-পরিচিত কেউ আছে, এমন মনে হল না। ···অতএব আত্মগোপন করার পক্ষে সুবিধেজনক। এর পর তাক বুঝে একটা ছদ্মবেশ ধারণ করে ফেলতে পারলেই আশি পার্সেন্ট সেফ !

শ্যামবাজারের মোড় থেকে বাসটা ছাড়বার খানিকটা পর থেকেই বেশ যেন গ্রাম-গ্রাম ভাব দেখতে লাগল। তবে খালি বাস আর খালি রইল না। পিল পিল করে লোক উঠছে, নামছে।

বঙ্কুর ধারণা ছিল, দিকদিগন্তর থেকে ঝাঁকে-ঝাঁকে লোক কলকাতাতেই এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ডেলি প্যাসেঞ্জার বাবুরা, বাজারু, হাটুরে সব লোকেরা মালপত্র নিয়ে। কিন্তু কলকাতা থেকে দৈনিক এত লোক মফস্বলে আসে ? কী করতে ? ···এতক্ষণ বঙ্কুর কানে কোনও কথা ঢুকছিল না, হঠাৎ কানে এল, "আর কী দাদা ! এবার আমাদের কারখানাটিতেও তালা ঝুলল বলে।"

বঙ্কুর খেয়াল হল, ওঃ। কলকাতা থেকে বস্তা-বস্তা লোক যত সব কলকারখানায় ছোটে!

এত কথা কইছে সবাই। বাবাঃ। যেন কানের মধ্যে ড্রাম বাজছে। হঠাৎ কানে এল, ঘাঁটুই। ঘাঁটুই···ঘাঁটুইয়ে কে নামবেন? চটপট নেমে পড়ুন!"

বঙ্কু হঠাৎ কী ভেবে, অথবা কিছু না ভেবে নেমে পড়ল এই ঘাঁটুইয়ে। যেখানে বঙ্কু বাঁশের বেঞ্চে বসে চায়ের দোকানে চা খাচ্ছে।

নাঃ। এরকম জায়গায় পুলিশ-টুলিশ আছে বলে মনে হচ্ছে না। অতএব নিরাপদ।

কিন্তু পৃথিবী কি কোন সময় কখনও আপদশূন্য হতে পারে?

কোনওখানে কিছু না, হঠাৎ একটা মুসকোমতো লোক সেই বেঞ্চিটাতেই এসে বসল প্রায় বঙ্কুর গা-ঘেঁষে। গা-ঘেঁষা ছাড়া উপায় কী? এমন কিছু আহামরি লম্বা তো নয় সেটা।···তা ছাড়া শেষ মুড়োর দিকে বাঁশের খোঁচখাঁচ।

তা বসল, বসল, গায়ে পড়ে কথা বলতে আসা কেন? গলাখাঁকারি দিয়ে বলে উঠল, "এথেনে এই নতুন বুঝি? ছারকে তো কই আগে দেখি নাই? এই গুপের চায়ের দোকানের সব খদ্দেরেই তো আমার চেনা।"

যাক, চেনা নয়।

বঙ্কু নিশ্চিন্তভাবে বলে, "না, আগে কখনও আসিনি।"

"তো কী বাবদ আসা হয়েছে ছার?"

"ছার?"

বঙ্কু এখন লক্ষ্য করে লোকটা গোড়া থেকেই 'ছার, ছার' মতোই কী একটা বলছে। 'ছার' মানেটা কী? ধিক্কার না?

বলে ফেলল বঙ্কু "ছার মানে?"

"আজ্ঞে, ওই 'বাবু' আর কি! আজকালের ইয়ার ছেলেরা আবার বাবু ডাকাটা নাকি তেমন পছন্দ করে না। তাই ছার বলা। আমার ভাগনা পদা বলে, ইস্কুলে-টিস্কুলে নাকি সমসকৃত পণ্ডিতমশাইরা পর্যন্ত পণ্ডিতমশা'র বদলে ছার শুনতে চান।"

ওঃ। সার।

বঙ্কুর ধড়ে প্রাণ আসে। বলে, "কাজেটাজে আসিনি। এমনি ধরুন—গ্রাম দেখতে···"

"ধরব? ধরব কেন ছার? বলুন গেরাম দেখতে।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই! কলকাতার ছেলে, গ্রামট্রাম তো দেখা হয় না।"

"অ। তো এখন আর গেরামের কী দেখবেন? আগেরকালের গেরামের সে শোভা সৌন্দর্য আছে? এখন এ হচ্ছে না শহর বা মফঃস্বল। খেরো খিচুড়ি। কী সব গাছগাছালি ছিল। আমবাগান, জামবাগান, কাঁঠালবাগান, জামরুল, পেয়ারা ফলের বেন্দাবন। আমরা তো ছার

ছেলেবেলায় বাড়িতে গেরস্তর বরাদ্দ জলখাবার খেতে টাইম পেতুম না। হনুমানের মতো শুধু গাছে চড়ে-চড়ে ফলপাকুড় খেয়ে পেট ভরিয়েছি। এখন? কেউ কারও বাগানের দিকে ঘেঁষুক দিকি! কড়া পাহারা। তা ছাড়া থাকছেই বা কোথা? সব তো কেটে সাফ করে আকাশছোঁয়া ফ্ল্যাটবাড়ি বানাচ্ছে। একটা পেয়ারা জোটে না ছেলেপেলের।"

বঙ্কু আর কী বলে? বলে, "তাই বুঝি?"

"তাই তো। তা ছাড়া ছেলেপুলেরাও তো আর এখন বাচ্চা থাকছে না। এইটুকু বয়েস থেকেই আচ্ছা হয়ে উঠছে। ···আবার ডেরাগ না ছাইপাঁশ কী যেন ধরে। পুলিশে ধরে নিয়ে গিয়ে থানায় জমা দেয়। বাপ-মা গার্জেনরা টাকা দিয়ে ছাড়িয়ে নিয়ে যায়। এও একটা বেবসা হয়েছে পুলিশের। যেমন, লোকেদের মাঠে চরে বেড়ানো গোরুগুলোকে ধরে নিয়ে গিয়ে গাউণ্ডে জমা দিয়ে বলে এল, 'আমার বাগানের গাছপালা খেয়ে নষ্ট করেছে।' গোরুর মালিক তখন টাকা দিয়ে গোরু ছাড়িয়ে নিতে বাধ্য।···তো ছেলেপুলেও তো আজকাল—"

কিন্তু বঙ্কুর কানে কী এসব কথা ঢুকছে? বঙ্কুর কানে বোমা দেগেছে, পুলিশ! বঙ্কুর প্রাণের মধ্যে হাজারটা বিছে কিলবিল করে উঠেছে। বঙ্কু বলে ওঠে, "এখানে—মানে এই অজ পাঁড়াগাতেও?"

"কী বলছেন ছার?"

"মানে বলছি, এখানেও থানাটানা, পুলিশটুলিশ আছে? এতটুকু ছোট জায়গা?"

"শোনেন কথা! পুলিশ আবার কোথায় না থাকে? তবে দরকারের সময় কী আর আসে? অকাজের সময় আসে। তবে হ্যাঁ, থানাটা ঠিক এই ঘাঁটুইতে নেই। আছে সদরে। ময়নাপুরে। তো ওই যা বললুম, এই তো সেদিনের সামান্য একটা ভাগের পাঁচিল তোলা নিয়ে, খুড়ো-ভাইপোর সঙ্ঘর্ষ। ভাইপো এই পাঁচিল গাঁথুনির একখানা থান ইট তুলে নিয়ে খুড়োর মাথায় বসিয়ে মাথা ফাটিয়ে রক্তগঙ্গা বইয়ে ফেরার। ···পুলিশ এল পরদিন। খুড়ো তখন মর্গে। ভাইপো নো পাত্তা।"

এ কী?

এসব কথা শোনাচ্ছে কেন লোকটা বঙ্কুকে? বঙ্কুর মধ্যে যে দামামা বেজেই চলেছে। ···ভাইপো! থান ইট! রক্তগঙ্গা।—ফেরার! খুড়ো আর জ্যাঠায় তফাত কী? দুই তো আঙ্কেল। ···লোকটা কে! গোয়েন্দাদের চর? ···কিন্তু এক্ষুণি, এই ক' ঘণ্টার মধ্যে গোয়াবাগান বাই লেনের খবর গোয়েন্দা-পুলিশের কাছে চলে গিয়ে অ্যাকশন শুরু? এই ঘাঁটুইতে এসে গেছে? এত কারিৎকর্মা এ-রাজ্যের পুলিশ? না কি কোনও প্রাইভেট গোয়েন্দা? যারা মুহূর্তে অসাধ্য সাধন করতে পারে। দোষীর মুখ দেখলেই চিনে ফেলতে পারে।

বঙ্কুর চোখের সামনে একটা ফাঁস-লাগানো ফাঁসির দড়ি ঝুলতে থাকে। সিনেমায়-টিনেমায় যেমন দেখা যায়।

বঙ্কু হঠাৎ উঠে চোঁ-চোঁ দৌড় মারে। দিগ্বিদিকজ্ঞান হারিয়ে কাঁটাঝোপে পা ছড়ে গিয়ে, খানাখন্দে ঠোক্কর খেয়ে···

"কী হল ? ও মশাই, কী হল ? হঠাৎ ছুটলেন কেন ?"

মুচকি হেসে বলে, "বুঝছেন না ? হেড আপিসে গণ্ডগোল। তা নয় তো, অমন ফিটফাট ধোপদুরস্ত চেহারার ছোকরা এই অভাগা গুপের দোকানে চা খেতে আসে ? এস্টেশনে স্টল নাই ? সিনেমা হাউসের ধারে রেস্টুরেণ্ট নাই ?"

তারপর ? দিন কাটছে···রাত কাটছে, সপ্তাহ কাটছে, মাস কাটছে, সেই দৌড় মারাই চলছে এখনও বঙ্কুর।

ক্রমশ সেই ধোপদুরস্ত চেহারা আর থাকে না। পকেটের পয়সাও জবাব দেয়।—বঙ্কু সর্বত্র পুলিশের ছায়া দেখে।···আর পালায় !

শুধু ছায়া কেন ? কায়াই তো !

পানের দোকানে বসে ডলে-ডলে খৈনি খাচ্ছে পুলিশ ! পাঞ্জাবির মাংস-পরোটার দোকানে বসে, মৌজ করে বিনি পয়সায় ভোজ চালিয়ে চলেছে পুলিশ ! বাসে বিনা-টিকিটে চড়ে বসেছে পুলিশ।

সারা জগৎটা যেন পুলিশে থিকথিক করছে! এদের মধ্যে কে যে কোন বিভাগের কে জানে ! গোয়েন্দা-পুলিশ থাকতেও পারে। বঙ্কু এখন কী করবে ?

বঙ্কুর তো এখন আর ছদ্মবেশেরও দরকার নেই। একমাত্র বঙ্কু প্রায় ভিখিরির চেহারায় পৌঁছে গেছে।···আর যেই যেখানে-সেখানে আনাচে-কানাচে একটু ঘাপটি মেরে বসছে, কী চেয়েচিন্তে শাল-পাতায় করে একটু আলুকাবলি, কি ঘুগনি খেয়ে খিদে মেটাতে চেষ্টা করছে, কোথা থেকে একজন পুলিশ এসে হাজির হচ্ছে। "অ্যাই, এখানে কী হচ্ছে ? কে তুই ? মুলুক কাঁহা ? ···চোরি ওরি করে পালাচ্ছিস ? না কি, ডাকাইতি ? না খুনভি ? চল থানায় ঘুষে দিই গে !"

বঙ্কু হঠাৎ ভাবতে থাকে, তবে না কি দেশে পুলিশরা নিষ্ক্রিয় ? কাগজে তো তাই লিখত ! বঙ্কুর মতো একটা সামান্য প্রাণী, বেপোটে একটা খুন করে ফেলে, আত্মগোপন করে বেড়াতে যাওয়ায় বিশ্বভুবন পুলিশে ছেয়ে গেছে ?···সর্বত্র তাদের জাল পাতা ?

অথচ বঙ্কু সত্যিই কিছু আর কোনও মোটিভ নিয়ে জেঠুর তেল-চুকচুকে টাকটাকে লক্ষ্য করে থান ইটখানা ফেলেনি তিনতলার ছাত থেকে !···

ঘটনাটা আদ্যোপান্ত ভাবতে থাকে বঙ্কু।

ওই গোয়াবাগান বাই লেনের বাড়িটায় সুষ্যিঠাকুরের ছিল প্রায় ভাসুর-ভাদ্রবউ সম্পর্ক। রোদের মুখ দেখা যায় না সারাদিন।···কেবলমাত্র ভোর-সকালে গলির দুপাশের বৃহৎ-বৃহৎ বাড়িগুলোর কোনও একটার ফাঁকফোকর ভেদ করে একচিলতে রোদ এসে পড়ে বঙ্কুদের বাড়ির ছাতে।···পাঁচিলের একটা কোণায় বঙ্কু ভোরবেলা জগিং সেরে এসে, চান করে। তখন তার রাতে পরা বাসী ছাড়া সিল্কের

লুঙ্গিটাকে কেচে নিয়ে সেই চিলতে রোদটুকুর ওপর বিছিয়ে একখানা থান ইঁট চাপা দিয়ে শুকোতে দিয়ে নীচে নেমে যায় চা খেতে। তারপর সাজগোজ সেরে লুঙ্গিটাকে তুলে নিয়ে পাট করে নিজের ঘরে রেখে দিয়ে বেরিয়ে পড়ে। একদিন ভুলে গেলেই তো রাতে আর সহজে সেই লুঙ্গিকে খুঁজে পায় না। কে তুলেছে? কোন ঘরের আলনায় রেখেছে? দাদারটার সঙ্গে গুলিয়ে গেছে মনে হচ্ছে—এইসব বেয়াড়া ব্যাপার ঘটতে থাকে। মা রেগেমেগে বলেন, "তো রাতদুপুরে ওই লুঙ্গি-লাঙ্গি করেই বা বাড়ি মাথায় করছিস কেন? আছে কোথাও? আর কিছু পরবার নেই তোর?…"

অতএব "আপনা হাত জগন্নাথ। নিজের কাজ নিজেই করো!"

এদিকে ব্যাপারটা এই—বঙ্কু যখন ছাতে এসে রোদটুকুর সদ্ব্যবহার করার ব্যবস্থা করে, ঠিক সেই সময়ই একেবারে পাশাপাশি ছাতে গগন গাঙ্গুলি উঠে আসেন সূর্যপ্রণাম সারতে। আট ফুট গলির দু'ধারে সেকেলে ঢাউশ-ঢাউশ দোতলা, তিনতলা বাড়িগুলোর কোনও একটু খাঁজ দিয়ে সূর্যের মুখটুকু একটু দেখতে পেলেই, উদাত্ত কণ্ঠে আওড়াতে শুরু করেন, "নমো জবাকুসুম সংকাশং—"

চোখ বুজেই বলেন। তবু কেমন করেই যেন বঙ্কুঘটিত ঘটনা তাঁর চোখে পড়ে যায়। আর পড়লেই চেঁচিয়ে ওঠেন, "অ্যাই বঙ্কা, 'ওটা কী হচ্ছে? হঠাৎ জোর বাতাস এলে তোর সিল্কের লুঙ্গি উড়তে থাকলেই থান ইঁটখানা রাস্তায় পড়ে বসলে, কী কাণ্ড হবে খেয়াল নেই? খুনের দায়ে ফাঁসি যাবি রে যে আহাম্মক।"

সে-কথায় আমল দেয় না বঙ্কা। ভাবে, হুঁঃ। জোর বাতাস! এ গলিতে বলে, "মলয় বাতাসই বয় না, তো জোর বাতাস!"

অতএব নিজের পদ্ধতিটি চালিয়েই যায়।

কিন্তু? হঠাৎ আচমকা ঘটেই গেল সেই অঘটন!

তবে হাওয়ায় উড়ে নয়। বঙ্কুরই হাতের টানে। বেরোবার আগে তাড়াতাড়ি লুঙ্গিখানাকে তুলে রাখতে গিয়েই—সিল্কের লুঙ্গিটা কেমন ফ্যাঁস করে ফেঁসে গেল। আর ইঁটখানা ঠিক কাটা ঘুড়ির মতো যেন ফস করে নীচে নেমে গেল!

তার মানে, লুঙ্গিটা শুধু নিজেই ফাঁসল না, বঙ্কুকেও ফাঁসিয়ে দিল।

আজ ঠিক সেই মহামুহূর্তটিতেই গগন গাঙ্গুলির টাক-মাথাটি নিয়ে সেইখানটি দিয়েই যাওয়ার দরকার পড়ল কেন?

এ আর কিছু নয়। নিজের ভবিষ্যদ্বানীটিকে ফলপ্রসূ করবার জন্যই। কেন? আর কয়েক সেকেণ্ড আগে বা পরে ওর ওখান দিয়ে যাওয়া চলত না? সেই যে বলেছিলেন, "বঙ্কা, কোনওদিন খুনের দায়ে ফাঁসি যাবি।

ব্যস! তদবধি বঙ্কু না জ্যান্ত না মরা হয়ে অজানা-অচেনা সব বিদঘুটে-বিদঘুটে জায়গায় পথে-পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে। হদ্দ ভিখিরির অবস্থা।

একদিন একটা পানের দোকানে ঝোলানো আয়নায় নিজেকে দেখে বঙ্কু যেন হাঁ হয়ে গেল।

গোয়াবাগান বাই লেনের কচিকাঁচাদের ক্লাবের ছেলেদের প্রাণের ঠাকুর বঙ্কুদা।

পাড়ার সকলের প্রিয়পাত্র পরোপকারী বাবা বঙ্কুবিহারী? ভাই বঙ্কু! ওঃ, না, না! এ অসম্ভব। বঙ্কু সত্যিই রাস্তার ভিখিরি বা পাগলা'র মতোই দোকানে-পসারে এটা-ওটা চেয়ে-চেয়ে খাচ্ছে! চালাকি করে হয়তো সত্যিই পাগলের ভান করছে!

কেন? না, প্রাণের ভয়ে?

ছি, ছি, ছি। প্রাণ এত দামি? ধ্যাত!

হঠাৎ বঙ্কুর মনের মধ্যে তার বড়পিসিমার একটা কথা যেন বেজে উঠল। বড়পিসিমা রাগটাগ হলেই যখন-তখন বলে ওঠেন, "গলায় দড়ি, গলায় দড়ি, এমন বাঁচনের থেকে মরণ ভাল।"

কথাটা মনে পড়তেই বঙ্কুর মনের মধ্যে একটি দিব্যজ্ঞানের উদয় হল। ঠিক! ঠিক! এমন-ভাবে বেঁচে থাকার চেয়ে মরাই ভাল! ···পুলিশের ভয়ে, অর্থাৎ ফাঁসি যাওয়ার ভয়ে যে বঙ্কু এই এত দিন কোথা থেকে না কোথা থেকে ছুটোছুটি করে আর পালিয়ে-পালিয়ে একটা ভিখিরিতুল্য হয়ে পড়েছে, সে ঠিক করে ফেলল, এর চেয়ে মরাই ভাল!

কিন্তু মরব বললেই তো মরা হয় না? তার জন্যও তো উপকরণ চাই? গলায় দড়ি দিতে দড়ি চাই। বিষ খেতে বিষ চাই, পুড়ে মরতে হলে কেরোসিন চাই!

আছে সে-সবের কিছু বঙ্কুর নাগালে?

ভাবতে-ভাবতে হঠাৎ মাথায় এল, আছে! একটা জিনিস আছে! ···ইউরেকা!

রেললাইন আছে।

তাতে গলা রেখে পড়ে থাকলেই ব্যস! কাজ হাসিল, কেল্লা ফতে।

আঃ বিনা উপকরণের এই মোক্ষম ব্যবস্থাটি মনে পড়ে যাওয়ায় বঙ্কু নিজেকেই নিজে বাহাদুরি দিল!

এলোমেলোভাবে হাঁটতে-হাঁটতে বঙ্কু এখন যেখানে এসে পড়েছে, সে-জায়গাটার নাম জানে না বঙ্কু। তবে দেখে কাছাকাছিই রেললাইন আছে। দিনের মধ্যে বেশ কয়েকবার ট্রেন আসা-যাওয়া করে। ইলেকট্রিক ট্রেন।

শটাশট আসে, যায়। মনে হয় যত সব ডেলিপ্যাসেঞ্জার বাবুরা চড়ে এতে। যায়, ফেরে। বঙ্কু সেই রেলের বাঁশি শুনতে পায়।

আপাতত বঙ্কু আস্তানা গেড়েছে একটা অতি-পুরনো গায়ে ফাটল-ধরা কালীমন্দিরের পেছনে একটা বেলগাছতলায়। কালীমন্দিরটার নাম নাকি মহাকালীর মন্দির। পুরনো হলেও নিত্যপুজোর ব্যবস্থা আছে! আর বিশেষ-বিশেষ দিনে খুব বোল-বোলাও! অনেক ভক্তটক্ত আসে।

আর এতেই সুবিধে হয়েছে বঙ্কুর।

বৃদ্ধ পুরোহিত ঠাকুরটি পেছনের গাছতলায় পড়ে থাকা পাগলটাকে দয়াধর্ম করে পুজোর প্রসাদভোগের প্রসাদট্রসাদ দেন একটু।

তবে লোকে যেভাবে কুকুর-বেড়ালকে ডাকে, "এই আয়, আয়, তু তু!" সেইভাবে, পাতায় মোড়া খাদ্যবস্তু হাতে নিয়ে ডাক দেন, "আই পাগলা আয়, আয়!"

তা হোক, পেট জ্বলে যাওয়া খিদের সময় খাদ্যবস্তু! ছাড়া যায়?

দিন কেটে যাচ্ছিল!

কিন্তু এ কি আবার বাঁচা?

হঠাৎই বঙ্কুর এই দিব্যজ্ঞানটি জন্মাল।

এর চেয়ে মৃত্যু ভাল। চুপিচুপি কাজটা সেরে ফেলা যাক।

তো দিনের আলোয় তো চুপিচুপি হয় না। রাতের জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া গতি নেই।

আজই সেই রাতটা হোক।

আজ সন্ধ্যায় পুরুতঠাকুর সন্ধ্যেপুজো সেরে চলে গেলেই রেলগাড়ির শব্দ পেলেই ছুট মারবে বঙ্কু। আর ছুটে গিয়েই লাইনের ওপর ঝাঁপ দেবে।

আজ অবস্থা খুব অনুকূল। বোধ হয় অমাবস্যাটস্যা কিছু হবে। সন্ধ্যে থেকেই গভীর অন্ধকার! নী-নী করছে চারদিক।

লাস্ট ট্রেনটা কখন ফিরবে কে জানে! যে বঙ্কুর হাতে সর্বদা ঘড়ি বাধা থাকত, সে আজ সময়-জ্ঞান হারাল!

তবে শুনে-শুনে আন্দাজ হয়েছে।

মনে হচ্ছে এইখান থেকে যতসব লোক গুড়ের নাগরীর মতো ঠেসে কলকাতায় গিয়ে পড়েছিল, তারা এখন সেইভাবে ঠাসা হয়ে আবার ফিরছে। মাঝে-মাঝেই থামে আর কিছু বস্তা লোককে নামিয়ে দিয়ে আমার ছুট মারে।

শুয়ে থাকতে-থাকতে হঠাৎ ট্রেন আসার শব্দ পেল বঙ্কু। শুনেই পড়ি তো মরি করেই ছুট ছুট মারল।

ট্রেনটা যেন না পালায়। আসছে। কাছে আসছে।

বঙ্কু ছুটে এসে লাইনে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

কিন্তু এ কী! আসতে-আসতে প্রায় এসে কাছে আসার সময় হঠাৎ খ্যাঁচ করে থেমে গেল যে!

বঙ্কু পড়ে থেকে দেখতে পেল, অনেক লোক ওই বে-জায়গাতেই নেমে পড়ে বলাবলি করছে: হয়ে গেল! কারেণ্ট অফ হয়ে গেল। এখন দেখুন, কতক্ষণ অচল অধম হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে থাকে। ও কী। ওখানে কী? অ্যাঁ! গোরুটোরু না কি!'

ও বাবা! বঙ্কুর বুক কাঁপে।

এইদিকেই আসছে মনে হচ্ছে! একজনের হাতে আবার টর্চ। তার মানে লাইনে গলা দিয়ে পড়ে থাকা বঙ্কুকে দেখতে পাবে। আর পেলেই রেলপুলিশকে খবর দেবে।

বঙ্কু আবার উঠে পড়ে পাঁই-পাঁই ছুট মেরে সোজা সেই মন্দিরের পেছনের বেলগাছতলায়। বুক ধড়ফড় করছে।

আর ঠিক সেই সময়ই যেন বৃষ্টি এল মনে হচ্ছে।

হায়। একেই বলে অভাগার কপাল। সামান্য একটু মরা। তাও হয় না। বেশ বিনি পয়সায় হরে যাচ্ছিল। মা-কালী। এই তোমার ব্যবহার!

বঙ্কু মন্দিরের পেছন থেকে ঘুরে সামনের দিকে এল মন্দিরের সামনের চাতালে। রাত হলেই গাছতলা থেকে এখানেই এসে শোয়। মাথাটা তো ঢাকা এখানে।

কিন্তু এ কী, এসে এ কী দেখল বঙ্কু?

অ্যাঁ। কাকে দেখল?

এখনও যে মন্দিরের দরজা খোলা ভেতরে কে বসে?

বঙ্কু সেইদিকে তাকিয়ে···"ভূ-ভূ-ভূ" করে লটকে পড়ল!

আর শুনতে পেল, পুরুতঠাকুরের গলার স্বর, "ও কিছু না! একটা পাগলা থাকে এদিকে। বিষ্টি এল বলে মন্দিরের চাতালে উঠে এসেছে। আপনি পুজো চালিয়ে যান। এই মহাযজ্ঞ সমাপ্ত হলেই দেখবেন আপনার অভীষ্ট পূর্ণ হবে। হারানো মানিক ফিরে আসবে।"

কিন্তু বঙ্কুর যে সর্বাঙ্গ শিথিল হয়ে যাচ্ছে। বঙ্কুর যে বড্ড ভূতের ভয়। জেঠু কোথা থেকে আসবে? চন্দ্রবিন্দু হয়ে গেছে।

জেঠু শেষে কিনা ভূত হয়ে গিয়ে কালীমন্দিরে! তা হতেই পারে। যত সব ভূত-প্রেত-ডাকিনী যোগিনী তো মা-কালীর সঙ্গী।

বঙ্কুকে তা হলে এখন জেঠুর ভূতের মুখে পড়তে হবে।

আর ছুট মারবার উপায়ও নেই। দারুণ বৃষ্টি নেমে গেছে। ছাঁট আসছে।

পুরুতমশাই একটা জ্বলন্ত প্রদীপ ধরে কাছে এসে নিচু হয়ে বলে ওঠেন, "এই পাগলা! এদিকে সরে আয়? গায়ে ছাঁট আসছে?"

কিন্তু ততক্ষণে?

ততক্ষণে ভূতটা যে বঙ্কুকে দু' হাতে জাপটে, "এই হতভাগা লক্ষ্মীছাড়া বঙ্কা! এতদিন ছিলি কোথায়? চল তো আমার সঙ্গে—"

তবে মানে, ভূত নয়। জেঠু-সাজা গোয়েন্দা। এত দূরে এসেও বঙ্কুকে খুঁজে বের করেছে?

বঙ্কু সেই গোয়েন্দা অথবা জেঠুর জাপটানি থেকে কিছুতেই নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে পারল না।

কী করে পারবে? টেকো মাথায় গোটা কতক স্টিচ পড়লেও চেহারাটি তো যে জাঁদরেল সেই জাঁদরেল! আর বঙ্কু? চিরকেলে টিংটিঙে, তায় আবার এখন এই অ্যাতদিন না-খেয়ে না-শুয়ে স্রেফ নেংটি ইঁদুর!

চিঁ-চিঁ করে বলল, "জে-জেঠু, তুমি বেঁ-চে আছ?

জেঠু সদর্পে বলেন, "আলবাত আছি, থাকব না তো কী, পাড়ার লোকে তোর পেছনে পুলিশ লেলিয়ে দিয়ে খুনের দায়ে ফেলবে, তাই দেখব? ফুঃ! মাত্র তো একখানা থান ইট! তাতে এই গাঙ্গুলি ঘায়েল হবে? চল, এখন তোকে তোর থানায় জমা দিই গে, তারা তোকে লক আপ-এ পুরুক!"

———



আয়না

আনন্দ বাগচী

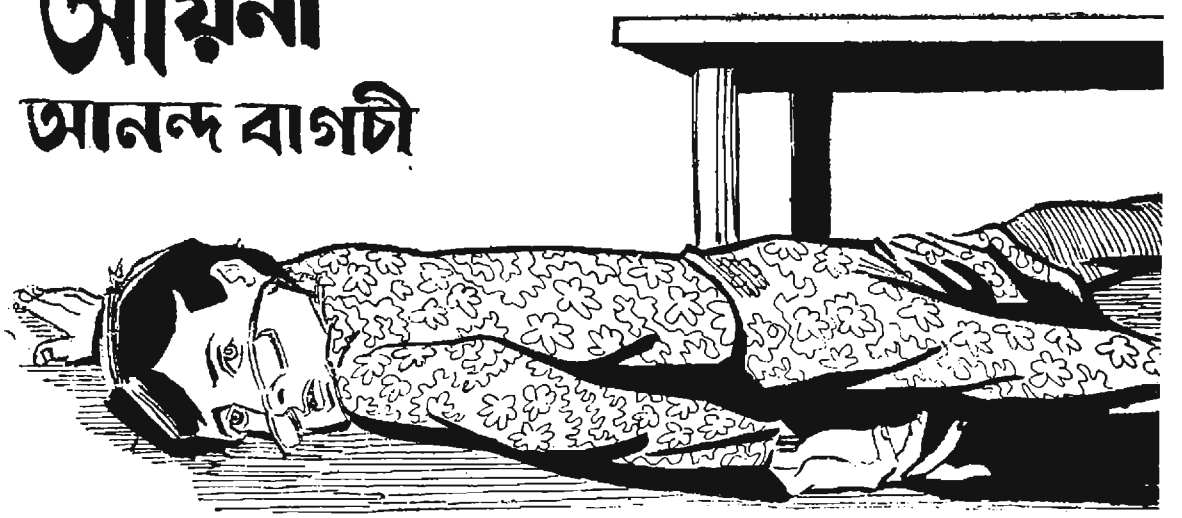

কিন্নরদের অ্যাপার্টমেন্টে পৌঁছনোর আগেই সুনন্দর বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠল। ভয়ংকর কিছু একটা নিশ্চয় ঘটেছে। খুনটুন নয় তো? ক্যাম্পাসের মধ্যে একটা পুলিশের জিপ, ভ্যানগাড়ি আর অ্যাম্বুলেন্স দাঁড়িয়ে। সেই খালি গাড়িগুলোর পাশে খাকি পোশাকে কয়েকজন লোক খৈনি ডলতে-ডলতে নিচু গলায় কী যেন আলোচনা করছিল। তবে কি কিন্নরদের বাড়িতেই কিছু হয়েছে? আজকাল ফ্ল্যাটে ঢুকে ডাকাতি, ধারালো অস্ত্র দিয়ে নৃশংসভাবে হত্যা তো আকছার ঘটছে। বন্ধুর বিপদের আশঙ্কায় কেমন দিশেহারা হয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল সে।

একতলার অ্যাপার্টমেন্টের জানালা দিয়ে কিন্নর ওকে দেখতে পেয়ে গিয়েছিল। ছুটে বেরিয়ে এল। কাছে এসে হাঁপাতে-হাঁপাতে বলল, "এই সুনন্দ, শুনেছিস, সাঙ্ঘাতিক কাণ্ড হয়ে গেছে দোতলায়। আমি তো বিশ্বাসই করতে পারছি না, কিরণকাকু নেই!"

"নেই! নেই মানে? সুনন্দ হাঁ হয়ে যায়।

"নেই মানে ইয়ে, মারা গেছেন! হার্ট ফেলিওর।"

"সে কী! আমি যে ওঁর জন্যেই," পেছনে বিচিত্র রবের হর্ন শুনে রাস্তা ছেড়ে সরে গিয়েই সুনন্দ চমকাল। দেখল কমলেশকাকা তাঁর মিউজিয়াম মাস্টারপিস থেকে নামছেন। এ যুগে এই কিম্ভূত মডেলের গাড়ি ভাবাই যায় না।

"কী রে! তুই এখানে?"

অতশত জবাব দেওয়ার সময় ছিল না। শুধু বলল, "এ আমার বন্ধু কিন্নর সেন। একতলায় থাকে।"

"কিন্নর? বাঃ চমৎকার নাম! তোমার সঙ্গে একটু পরে এসে আলাপ করব, কেমন? এই, তুই আয় তো আমার সঙ্গে। কুইক!" হাত ধরে ছোট করে একটা টান দিলেন।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে কমলেশকাকা বললেন, "অন ডিউটি না, বুঝতেই পারছিস। আমার বুজুম ফ্রেন্ড কুশলকিরণ ঘোষ চলে গেল রে! খুবই রহস্যময়ভাবে। ফোন পেয়েই যেমন ছিলাম ছুটে আসছি।"

সুনন্দ দেখল ওঁর পরনে ঘরে পরার ধ্যাস্তানো পাজামা আর হাফ পাঞ্জাবি। অবাক হয়ে বলল, "ওকে তুমিও চিনতে?"

"চিনতাম মানে? ভ্রূ কুঁচকে তাকালেন, "বললাম না, ছেলেবেলার বন্ধু? কত বড় লেখক।" বলেই হঠাৎ কিছু একটা খটকা লেগেছিল বোধহয়, তাই 'হুঁ' বলে ওর মুখের দিকে আর-এক ঝলক তাকালেন। কিন্তু ওই পর্যন্তই।

ফ্ল্যাটের দরজায় মোতায়েন কনস্টেবল হাঁ-হাঁ করে পথ আগলে দাঁড়াতেই ভেতর থেকে এক দাবড়ানি। সঙ্গে-সঙ্গে লোকটা যেন চাবুক খেয়ে সিধে হয়ে গেল। খোলা দরজা দিয়ে প্যাসেজে দু'জন পুলিশ অফিসারকে দেখা যাচ্ছিল। একজন থানার ও. সি.। অন্যজন লালবাজারের ডিটেকটিভ ইনস্পেক্টর। দু'জনেই ছুটে এসে স্যালুট করলেন, "আসুন সার! কাজ প্রায় শেষ, শুধু আপনার জন্যেই···"

ভেতরের ঘরে যেন মুহুর্মুহু বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল। একগাদা লোক সেখানে সন্তর্পণে চলাফেরা করছিল। কেউ দেওয়ালের গায়ে মাছির মতো সেঁটে রয়েছে, কেউ টেবিলে হুমড়ি খেয়ে যেন গন্ধ শুঁকছে।

এটাই ছিল ওঁর লেখার ঘর। দিনসাতেক আগে কিন্নর ওকে নিয়ে এসেছিল সকালের দিকে। ব্যাপার এই, ছোটদের একটা পত্রিকা বের করবে বলে সুনন্দ খুব তোড়জোড় করে লেগেছে। এত বড় একজন লেখকের যে-কোনও একটা লেখা পেলেই ওরা বর্তে যাবে, তাই কিন্নরকে ধরেছিল। কিন্নর ওঁর নাড়িনক্ষত্র জানে, তাই বলে দিয়েছিল একবার লেখায় বসে গেলে কেউ মাথা খুঁড়লেও উনি দেখা করেন না। ঠিক সকাল সাতটায় উনি দাড়ি কামাতে বসেন। সব কিছুই ওঁর ঘড়ি ধরে, একচুল নড়চড় হওয়ার জো নেই। আসলে স্বাধীন মানুষ, লেখাই ওঁর জীবিকা, লেখাই ওঁর চাকরি। দিনে দশ ঘণ্টা করে লেখেন। প্রথম খেপ ভোর সাড়ে চারটে থেকে সাড়ে ছ'টা। তারপর ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে সূর্যোদয় দেখার পর চা দিয়ে গেলে চা খান। দাড়ি কামিয়ে স্নানটান সেরে আটটায় ব্রেকফাস্ট। খবরের কাগজে চোখ বুলনো। সাড়ে আটটা থেকে দেড়টা পর্যন্ত টানা পাঁচ ঘণ্টা লিখে উঠে পড়েন। আহারান্তে একটু গড়িয়ে নিয়ে ফের তিনটে থেকে ছ'টা। চা খেয়ে একটু বাইরে ঘুরে আসেন। সন্দেয় বন্ধু-বান্ধব, সম্পাদক প্রকাশক কি প্রতিবেশিরা কেউ এলে দেখা করেন। গল্পগুজবও হয়। রাতে আর কলম ধরেন না, পড়াশোনা করেন। এই রুটিন অক্ষরে-অক্ষরে মেনে চলেন সপ্তাহে সাতদিনই। এত পুরস্কার, এত সংবর্ধনা আর প্রশস্তি তো আর অকারণে পাননি। এখন বাংলায় জীবিতদের মধ্যে-তিনিই বলতে গেলে এক নম্বর লেখক। ফ্ল্যাটের দরজা খোলা ছিল। কিন্তু ঘরের দরজা উনি সকাল

থেকে বন্ধ করেই রাখেন। এটাই নিয়ম। বাড়ির লোকজন সবাই জানে। দাড়ি কামাতে বসেছিলেন। ঠিক সাতটায় ওরা নক করতে দরজা খুলে দিলেন। সব শুনে বললেন কথা দিতে পারছেন না। সাতদিন পরে ঠিক এই সময়ে সুনন্দ যেন তাঁকে একটা ফোন করে। তখন তিনি বলবেন আদৌ লিখতে পারবেন কি না।

আজ ঠিক সাতটাতেই সুনন্দ ফোন করেছিল কিন্তু পর-পর দু'বার রং নাম্বার হয়ে যাওয়ায় মিনিট সাতেক দেরি হয়ে গিয়েছিল। তারপর ফোন বেজেই গেল উনি ধরলেন না। একটু সময় দিয়ে-দিয়ে বারতিনেক চেষ্টা করল কিন্তু একই ফল হল। ফোন উনি তুললেনই না। বোঝাই গেল উনি রেগে গিয়েছেন। তাই খুব মনমরা হয়েই কিন্নরের কাছে ছুটে এসেছিল সুনন্দ। এসে শুনল এই কা'ড!

লেখার ঘরখানা বেশ প্রশস্ত। পুবদিকের বিশাল জানালার একপাশে ছোট্ট একটা টেবিলে চা-ব্রেকফাস্ট হয়। তলায় দু'থাক দেরাজে দাড়ি কামানোর সরঞ্জাম, মসলা-মুখসুদ্ধি আর হঠাৎ দরকারের ওষুধপত্র থাকে। প্রায় তার গায়ে-গায়েই বেশ বড়সড় লেখার টেবিলেও টেলিফোন, কারুকাজ করা কলমদানি, স্বামী বিবেকানন্দের ফ্রেমে দাঁড় করানো রঙিন ছবি, ধূপদান আর সুদৃশ্য শেড দেওয়া, যে-কোনও দিকে ঘোরানো ফেরানো যায় এরকম টেবিল ল্যাম্প। পাশেই ঘূর্ণি বুকশেল্‌ফে ঠাসা রেভারেন্স বই। র‍্যাক পেরোলে ব্যালকনির দরজা আর অ্যাটচ্‌ড বাথ।

চায়ের টেবিলের ঠিক উলটো দিকে পশ্চিমের জানালার তলায় মেঝের ওপরে প্রায় চিত হয়ে পড়ে ছিলেন কুশলকিরণ। কীরকম বেকায়দা ভঙ্গিতে। একটু তফাতে রেজারটা ছিটকে পড়ে আছে। এক গাল কামানো। অন্য গালে সাবানের ফেনা পুরু হয়ে শুকিয়ে রয়েছে। চোখ আধখোলা মৃত্যুযন্ত্রণায় কোঁচকানো। ওদিকে টেবিলের দিকে চোখ ফিরিয়ে সাবান মাখানো ব্রাশ, জলের বাটি আর শেভিং ক্রিমের টিউব আফটার শেভ লোশনের শিশি রয়েছে দেখতে পেল। গালে রেজারের মাত্রই একটা কি টান দিয়ে হঠাৎ পশ্চিমের জানালার কাছে কেন যে তিনি উঠে এসেছিলেন, বোঝা গেল না। তাঁকে কি কেউ ডেকেছিল? তাঁকে এভাবে এখানে কি কেউ ডাকতে পারে?

সুনন্দ পায়ে-পায়ে পশ্চিমের জানালায় গিয়ে গ্রিল ধরে দাঁড়াল। ততক্ষণে বডি তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। বছর পঞ্চাশ বয়সের কিরণবাবুকে দেখতেই শক্তপোক্ত ছিল। কিন্তু মানুষটার নাকি হার্টের ব্যামো ছিল। নীচে এই হাউসের পেছন দিকের ফালি জমিতে কিচেন গার্ডেন টানা চলে গেছে। লতানে শশা, ভুঁইকুমড়ো, টম্যাটো আর লালশাক, ফুলকপির চাষ। চলাফেরা করার পথ নেই। তারপর মাথার কাঁটাতার জড়ানো এক মানুষ সমান পাঁচিল। পাঁচিলের ও-পিঠেই বোধহয় লম্বা ডোবার সাইজের পুকুর ছিল একটা। ঘেঁষ ফেলে বোজানো হয়েছে। তার ওপাশে চোরকাঁটায় ছাওয়া ঘেসো জমি সাফ করে হাউসিং-র গোটাতিনেক বাড়ি উঠছে। শুধু পিলার, মেঝে আর সিঁড়ি হওয়ার পর কোনও কারণে কাজ বন্ধ আছে। কমলেশকাকা পাশে এসে বললেন, "যা ভাবছিস, অসম্ভব।

সুনন্দ সত্যিই চমকাল। সে সত্যিই ভাবছিল। অসম্ভব। শুধু অসম্ভবই নয়, অর্থহীন, হাস্যকর! এদিক থেকে ভদ্রলোককে ডাকা দূরে থাক, এমন কোনও শব্দ-টব্দ করার লোকও নেই যা শুনে তিনি ব্যস্ত হয়ে ছুটে আসবেন।

সুনন্দর কথা শুনে কমলেশকাকা বললেন, "তার মানে তুই যখন প্রথম রিং হতে শুনেছিলি তখন কুশল ওয়াজ অলরেডি ডেড। সদর বন্ধ ছিল। ওঁর স্ত্রী নবীনতা কিচেনে, গ্যাসে চাপানো প্রেশার কুকার সিটি দিচ্ছিল। অন্যদিকের একটা বেডরুমে বাইশ-তেইশ বছরের ভাগনে রুপেন দরজা বন্ধ করে শীর্ষাসন করছে। ফোন বেজে যাচ্ছে, অনেকক্ষণই কারও কানেই যায়নি। পরে শুনতে পেয়ে ওঁর স্ত্রী গিয়ে দেখেন ভেতর থেকে লেখার ঘরের দরজা বন্ধ। ফোন শেষবার বাজতে-বাজতে থেমে গেল। মেঝের ওপর কুশল পড়ে আছে। রুপেন ব্যায়ামের পোশাকেই ছুটে গিয়ে তেতলা থেকে ওঁর বন্ধু ভবনাথবাবুকে ডেকে আনে। তিনি তখন মর্নিং ওয়াক থেকে ফিরে সবে লুঙ্গি আর ফতুয়া চাপিয়েছেন, সেইসঙ্গে চায়ের জল। কারণ স্ত্রী ছেলেমেয়েরা এখানে নেই, বাইরে কোথায় বিয়েবাড়িতে গেছে। লোক জড়ো করে দারোয়ানকে ডেকে ঘরের কপাট ভেঙে ভেতরে ঢোকা হয়। ভবনাথই থানায়, লালবাজারে ফোন করেন। লালবাজার আমাকে।"

"কাকু ডাক্তার কী বললেন?" সুনন্দ জানতে চায়!

কমলেশ রুমাল দিয়ে চোখ মুছে নিয়ে বললেন, "হার্ট ফেল। কিন্তু বাঁ হাতের তালুতে একটা পোড়া সাদা দাগ দেখতে পেয়েছেন। টাটকা। সেটা বোঝা যাচ্ছে না। এক কাজ কর, তোকে পাঁচ মিনিট সময় দিলাম। এ-ঘরের যা কিছু দেখার ইচ্ছে খুঁটিয়ে দেখে নে। আমরা তারপর ও-পাশের ঘর থেকে ভবনাথবাবুকে ডেকে নিয়ে ওপরে ওঁর ঘরে যাব। ওঁর মুখ থেকে আলাদা করে কিছু শুনব।"

গ্রিলে পিঠ ঠেকিয়ে পেছনে হাত রেখে সুনন্দ দাঁড়িয়েছিল। হঠাৎ হুল ফোটার মত খচ্ করে আঙুলে কিছু বিঁধতেই সুনন্দ ভয়ে চমকে উঠেছিল। রহস্যময় হত্যাকাণ্ডের ঘরে স্নায়ু এমনিতেই এমন টানটান হয়ে থাকে, ভিতু-সাহসীর কোনও ব্যাপার নয়। ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখতে পেল, কিছুই না, একগুছি তামার তার গ্রিলের নীচের দিকের একটা পাতে কেউ বেঁধে যেন আংটি বানিয়েছে। ছেলেবেলায় সুনন্দও করেছে, তবে আঙুলে। হাইট দেখে বোঝা যায় কোনও বাচ্চা ছেলে কিংবা মেয়ের কাজ। ভাগ্যিস, কমলেশকাকা তার চমকে ওঠা দেখতে পাননি, সেই সময় সিগারেট ধরাচ্ছিলেন, নইলে ভিতু বলে ঠাট্টা করতেন। তারের গুছিটার প্যাঁচ খুলে ফেলে দিতে যাচ্ছিল, কমলেশ বললেন, কী করিস!"

"ও কিছু না।" সুনন্দ মুচকি হেসে বলল, "চলো, যাবে না?"

ভবনাথ সদর বন্ধ করে যেতেও ভুলে গিয়েছিলেন, সময় পাননি। ওদের নিয়ে একটু বিব্রত হয়ে বললেন, "আসুন, বসুন।"

সোফার ওপরে দলা পাকিয়ে ফেলে রাখা পাজামা-পাঞ্জাবি আর টুকিটাকি তুলে নিয়ে বললেন, "আপনারা বসুন, আমি আসছি। চা খাবেন ? ইস্ আমার চায়ের জল বোধহয় ফুটে শুকিয়ে গেল।"

কমলেশ মাথা নেড়ে জানালেন, না। ফিরে আসতেই কমলেশ জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি বোধহয় কোনও শব্দটব্দ শোনেননি ?"

"কিসের শব্দ ? না। তবে নীচের তলার ভদ্রলোক নাকি ধুপ করে কিছু পড়ে যাওয়ার শব্দ শুনেছিলেন। কুশলের লেখার ঘরের ঠিক নীচেই ওঁর ঘর কিনা। তবে গুরুত্ব দেননি।"

"আচ্ছা রুপেন সম্পর্কে আপনার···

"না, না, ও খুব ভাল ছেলে। একটু ডাল হেড, শরীরচর্চা নিয়েই মেতে থাকে। মামা-মামির অবর্তমানে ওই অবশ্য সব কিছু পাবে। ওই ছেলেটার টাকা-পয়সার লোভ নেই। কুশলরা নিঃসন্তান, রুপেনকেই ওরা ছেলের মতো দেখত। আচ্ছা, জানেন, কানাঘুষো শোনা যাচ্ছিল, কুশলের নাম এবার নোবেল পুরস্কারের জন্যে উঠেছে। এবার যদি নাও হয়, সামনের বছরে পেয়ে যেতেও পারত !"

কমলেশ ঠাট্টা করে বললেন, "আপনার হিংসে হয়নি ? আপনিও তো লেখক মশাই।"

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ভবনাথ বললেন, "কী যে বলেন ভাই ! কিসে আর কিসে। আমি ওর পায়ের নখের যুগ্যিও না।"

আরও দু-একটা কথার পর সুনন্দ মাঝে পড়ে হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা ভবকাকা, ওঁর ঘরে বাচ্চা ছেলেমেয়ে কখনও ঢুকত।"

"না, কেন ঢুকবে না !" ভবনাথ হাত নেড়ে বললেন, "কুশল বাচ্চাদের ভীষণ ভালবাসত ! ওই তো একতলার ভদ্রলোকের ভাইয়ের দুটি যমজ মেয়ে প্রায় ওর ঘরে ঘুরঘুর করত।
কেন বল তো ?"

সুনন্দ হেসে বলল, "এমনই।"

ক'দিন পরে কমলেশকাকা সুনন্দদের বাড়িতে এসে হাজির। বললেন, জানিস, বিশেষজ্ঞদের মত হচ্ছে ইলেকট্রিক শক দিয়ে কুশলের হার্টফেল করানো হয়েছে। কিন্তু কী করে, সেটাই ধরতে পারা যাচ্ছে না।"

সুনন্দ লাফিয়ে উঠে বলল, "তাই বলো ! আমার আগেই বোঝা উচিত ছিল। ইস কাকু এই সোজা ব্যাপারটা আমি ধরতেই পারিনি। আমি কী মুখ্যু।"

কমলেশ সোজা হয়ে তাকালেন, "কী বকছিস পাগলের মতো ?"

"হয়তো পাগলামিই করছি। আমার মনে হয় পশ্চিমের জানলার গ্রিলটা ইলেকট্রিফায়েড করে রাখা হয়েছিল। এই দ্যাখো,"—বলেই সুনন্দ ছুটে গিয়ে ওর টেবিল থেকে ইঞ্চি দুই-আড়াই লম্বা একগুছি তামার তার এনে দেখাল, "এ কোনও বাচ্চা মেয়ের কম্মো নয়।"

"এইটুকু তার দিয়ে ? কোথায় পেলি ?

"গ্রিলে জড়ানো ছিল। পরে টেনে ছিঁড়ে নেওয়ার সময় এটুকু থেকে গিয়েছিল।"

"অ্যাঁ! তোর কথা ঠিক হলে বলতে হয় বাঁ হাতে গ্রিল চেপে ধরার ফলেই কুশল বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়? কিন্তু যে করেছে তার মোটিভ কী? আর কী করেই বা সে কুশলকে ওখানে টেনে নিয়ে গেল, গ্রিল ধরতে বাধ্য করল? ঘর তো ভেতর থেকে বন্ধই ছিল।"

"মোটিভ-টোটিভ আমি জানি না। তবে কী করে নিয়ে গিয়েছিল অনুমান করা যায়। হত্যাকারী পেছনের দিকের হাউসিংয়ের বাড়িটার তিনতলায় উঠে একটা ছোট হাত আয়না দিয়ে কুশলবাবুর সামনের আয়নায় রোদ্দুরের ঝলক ফেলতে থাকে। অবাক আর বিরক্ত হয়ে তিনি ব্যাপারটা দেখার জন্যে পেছনের জানলার দিকে আসেন। কোত্থেকে আলোটা আসছে বুঝতে পেরে ওপরের দিকে তাকান। কিন্তু কিছুই দেখতে পান না। মুখের ওপর আলো এসে পড়ায় চোখ ধাঁধিয়ে যায়। ব্যাপারটা সামলাতে বাঁ হাতে গ্রিল চেপে ধরেন সঙ্গে-সঙ্গে। লোকটা ছুটতে ছুটতে নিজের ঘরে ফিরে আসে আর তারটা ছিঁড়ে নেয়। আংটাটুকু গ্রিলের সঙ্গে লেগে থাকে। আগের রাতেই সে ব্যবস্থা করে রেখেছিল। কিন্তু কানেকশন দিয়েছিল ভোরবেলা। তারপর ওবাড়িতে উঠে রোদ ওঠার অপেক্ষায় বসেছিল।"

"ওয়াণ্ডারফুল গপ্পো!" কমলেশ হাসলেন, "কিন্তু লোকটা কে? রুপেন, না নীচের তলার কেউ?"

"ভবনাথবাবু!" সুনন্দ মাথা চুলকে বলে, "তুমি খেয়াল করোনি, আমি দেখেছি। সোফার ওপর ছাড়া জামা-পাজামার সঙ্গে একটা গোলমতো আয়না আর তারের বাণ্ডিল (প্লাগ-পিন সুদ্ধু) তুলে নিয়ে ভেতরে চলে গেলেন। চায়ের জলের ব্যাপারটা নিশ্চয় বানানো।"

———



নীলকান্ত মনি উধাও

হীরেন চট্টোপাধ্যায়



যাব বলে লাফাচ্ছিলাম দিনসাতেক আগে থেকেই, সকালে বাবা যখন মা আর আমাকে পৌঁছে দিয়ে অফিস চলে গেলেন, আনন্দে তখনও টগবগ করে ফুটছি আমি। কিন্তু দুপুরের ওই ছোট্ট ব্যাপারটাই কেমন যেন খিঁচড়ে দিয়ে গেল মনটা। সন্ধ্যের জমজমাট অনুষ্ঠানের কথা ভেবেও মন ঠাণ্ডা করতে পারছিলাম না।

ব্যাপারটাকে অবশ্য ছোট্টই বলতে হবে, অন্তত আমার মনখারাপ হওয়ার মতো ব্যাপার সেটা মোটেই নয়। সকালে আসার সঙ্গে-সঙ্গে বড়মামা আমাকে জড়িয়ে ধরেছেন, "আরে, এসো, এসো, আমার চ্যাম্পিয়ান ভাগ্নে।" তারপর আমায় ভেতরের ঘরে নিয়ে গিয়ে দারুণ একটা পেন আর ক্যালকুলেটর দিয়ে বলেছেন, "এই নে, তোর চ্যাম্পিয়ান হওয়ার পুরস্কার।"

একটা ক্যালকুলেটরের শখ আমার অনেক দিন থেকে। বাবাকে বলতে পারিনি খানিকটা ভয়েই, বলবেন, "এখন থেকেই তোর ক্যালকুলেটর দরকার?" বলতেই পারেন, কারণ খুব ভাল ছেলে যাকে বলে, তা তো আমি নই। গাদাগুচ্ছের সাবজেক্ট পড়তেই যে আমার ভাল লাগে না মোটে, ক্লাসে ফার্স্ট হয়ে আর আমি উৎসব কী করে! আমার ভাল লাগে অঙ্ক। এটা আমার বরাবরই বেশ প্রিয়। আমাদের ফার্স্ট বয় অরিত্র এই ক্লাস নাইন পর্যন্ত একবারও অঙ্কে আমার সমান নম্বর পায়নি। স্যাররা সকলেই জেনে গেছেন, একটা নম্বর কম পেলেই খাতা নিয়ে আমি সোজা চলে যাব হেডসারের কাছে।

এটা অবশ্য ঠিকই যে, ক্লাস নাইনের অঙ্ক করতে ক্যালকুলেটর লাগে না, কিন্তু আমি তো শুধু আমার ক্লাসের অঙ্কই করি না, উঁচু ক্লাসের অঙ্ক করতেও তো আমার ভাল লাগে। আর অঙ্কের আসল মজাটাই তো হল—সেটা কেমন করে করতে হবে তা বের করা—ঘাড়-মুখ গুঁজে বড়-বড়

গুণ-ভাগ করতে কি আর ভাল লাগে! অবশ্য বড়মামা যে আমায় চ্যাম্পিয়ান বললেন, সেটা একটা অন ব্যাপার। মাসখানেক আগে জুনিয়ার ক্যুইজ কনটেস্টে আমি চ্যাম্পিয়ান হয়েছি। অন্যসব স্টেটের বাঘা বাঘা ছেলে ছিল বেশ কিছু তাদের হারিয়ে চ্যাম্পিয়ান হওয়াটা খুব একেবারে মুখের কথা ছিল না বেশ একটা রোমাঞ্চ অনুভব করছিলাম, মাইকে যখন নামটা অ্যানাউন্স করছিল।

বড়মামিমা অবশ্য অতসব বোঝেন না, তাড়াতাড়ি এক প্লেট ছানার জিলিপি নিয়ে এসে বলেছিলেন "খেয়ে ফেল দেখি এগুলো। অর্ডার দিয়ে কিছু ভাজিয়ে রেখেছি তুই আসবি বলে।" না, না, তার মানেই যে আমি ভি, আই, পি, গোছের কিছু হয়ে গিয়েছি, সেসব কিছু নয়। ছেলেবেলায় আমি তো মামার বাড়িতে এসেই থাকতাম বেশিরভাগ সময়, গরমের ছুটিফুটি হলে তো আর কথাই নেই। আর বড়মামিমাও আমায় খুব ভালোবাসেন, তাই এইসব জানেন আর কী!

মামারবাড়ি আসতে এখনও আমার খুব ভাল লাগে, তার ওপর এইরকম একটা অনুষ্ঠান হলে তো আর কথাই নেই। না, অনুষ্ঠানটার ওপর যে আমার খুব একটা লোভ ছিল তা নয়, আসল আকর্ষণ হচ্ছে ওই নীলকান্তমণিটা। বড়মামা একজন জহুরি। কোনও একটা ভাল মণি পেলেই বাড়ি নিয়ে আসতেন, বড়মামিমাকে দেখাতেন। ছেলেবেলায় নানারকম মণিমুক্তো দেখেছি আমি মামারবাড়িতে। এরকম ঝুটো মুক্তো আমার খুব ভাল লাগত। তার নামটাও ছিল ভারী মজার, মিকিমতো মুক্তো। ওই নামের এক জাপানি ভদ্রলোক নাকি ওই মুক্তো তৈরি করার রহস্যটা বের করেছেন। এই নীলকান্তমণিটা পাওয়ার পর বড়মামা মাকে একটা চিঠিতে জানিয়েছিলেন, "একটা দুর্লভ নীলকান্তমণি পেয়েছি। জ্যোতিষী আমাকে অনেকদিন থেকে এই মণি ব্যবহার করতে বলছে, ভাবছি এটা রেখেই দেব। তবে, ব্যবহার করতে হলে আগে শোধন করতে হয়। তাই আগামী শনিবার গুরুদেবকে খবর দিয়েছি আসবার জন্য। সত্যনারায়ণ পুজো হবে, আমার রত্নও শোধন হবে। তোরা সকালবেলাতেই সব চলে আয়।"

ভেবেছিলাম অনেকেই আসবে, খুব মজা হবে। তা কিন্তু হয়নি। বাবা তো অফিসের কাজে ধানবাদ চলেই গেলেন আমাদের পৌঁছে দিয়ে। মায়েরা তিন ভাই-বোন। ছোটমামা কাজ করেন অম্বরনাথে, রাইফেল ফ্যাক্টরিতে। জানিয়েছেন, এখন ছুটিছাটা পাওয়া একেবারে অসম্ভব। বড়মামার মেয়ে তুলিদি-র বিয়ে হয়েছে কাছেই, আসানসোলে—তারও নাকি বাড়িতে কার অসুখ। আসার মধ্যে এসেছেন গুরুদেব আর নালুমামা। নালুমামা বোধহয় আমার নিজের মামা নন, কিংবা হতে পারে কিছু ঘুরিয়েটুরিয়ে। কিন্তু নালুমামাকে আমি দেখছি এ-বাড়িতে, জ্ঞান হওয়া অবধি। দোকানেই বসতেন-টসতেন বেশি। ভুলুদা, মানে নালুমামার ছেলে বাজারটাজার করে দিত আর ভুলুদার মা রান্নাবান্নার সাহায্য করতেন। গত বছর কী একটা গন্ডগোল হয়েছিল যেন। তারপরই নালুমামারা উঠে গিয়েছিলেন কাছেই, একটা অন্য বাড়িতে।

নালুমামাদের অবস্থা ভাল নয়, সেটা আমি বেশ বুঝতে পারি। বাইরে বেরোবার সময়ও

নালুমামার জামাকাপড় আমি কোনওদিন ফর্সা দেখিনি। তার ওপর আবার বাবার মতো ওই নস্যি অভ্যেস। পকেট থেকে কালচিটে একটা রুমাল যখন বের করেন, অন্নপ্রাসনের ভাত উঠে আসার জোগাড়। তবে মানুষটাকে কিন্তু বেশ ভালই লাগে আমার। রুমালে পয়সা লুকিয়ে অদৃশ্য করা, দড়ি কেটে জোড়া দেওয়া—এইসব টুকটাক ম্যাজিক যে আমায় কত দেখিয়েছেন, তার শেষ নেই।

না, নালুমামাকে নিয়ে কিছু হয়নি দুপুরবেলা, হয়েছিল ছোট্টুদাকে নিয়ে। আমার চেয়ে বয়সে অনেক বড় হলেও ছোট্টুদা তুলিদি-র চেয়ে ছোট। ছেলেবেলা থেকেই এমন গোঁয়ার আর একরোখা যে, এ-বাড়িতে এলে পারতপক্ষে ওকে এড়িয়েই চলতাম আমি।

সত্যি বলতে কী, ছোট্টুদাকে আমি দু' চোখে দেখতে পারি না। বড়মামাও তাই। লেখাপড়ায় ছোট্টুদা, অষ্টরম্ভা। বারকয়েক মাধ্যমিক পরীক্ষায় হোঁচট খেয়ে পড়াশোনা ছেড়ে দিয়েছে। তারপর কী করছে-টরছে আমি জানি না, কিন্তু আজ যেমন বড়মামার সঙ্গে কথা বলছিল, সে তো সাঙ্ঘাতিক! বড়মামাকেও অত রাগতে আমি কখনও দেখিনি, চিৎকার করে বলেছিলেন, "পারব না! ভোর পেছনে টাকা খরচ মানে ভস্মে ঘি ঢালা। পঁচিশ হাজার টাকা কি মুখের কথা নাকি?"

ছোট্টুদা থামেনি, বলেছিল, "বন্ধুর বাবারা সবাই দিয়েছেন। না দিলে বিজনেসটা হবে কী করে শুনি!"

"ব্যবসা করবি তুই!" বড়মামা সেইরকম গলা চড়িয়েই বলেছিলেন, "তোকে আমি চিনি না? টাকাগুলো সব নয়ছয় করে ফেলবি!"

"তা হোক!" ছোট্টুদার কী সাহস, সমানে তর্ক করে বলেছিল, "টাকাটা তোমাকে দিতেই হবে, নইলে মুখ দেখাতে পারব না!"

"ও-মুখ আর দেখাতে হবে না,"—বড়মামা রাগে গজগজ করছিলেন, "সরে যা তুই আমার সামনে থেকে।"

"ঠিক আছে, দেখব তুমি দাও কি না দাও", ছোট্টুদা ফোঁস-ফোঁস করতে-করতে সরে গিয়েছিল সামনে থেকে।

তা গিয়েছিল, কিন্তু ঘটনাটা আমি ভুলতে পারলাম না বিকেলেও। গণ্ডগোল মিটতে আপনমনে চলে আসার সময় আর-এক কাণ্ড। ফিসফিস গলার আওয়াজ শুনে দেখি গুরুদেবের শাগরেদ বিষ্টুচরণ কী যেন বলছে গুরুদেবকে।

ওর নাম যে বিষ্টুচরণ, সেটা সকালে আসার পরই টের পেয়েছি আমি। গুরুদেবের ওই বিশাল দশাসই চেহারা, পেল্লায় ভুঁড়ি, ভাটার মতো গোল-গোল লাল চোখ, আর ইয়া ঝাঁকড়া চুল। তার পাশে বিষ্টুচরণ যেন চামচিকে। গুরুদেব মাঝে-মাঝেই হাঁক তাড়ছেন, "বিষ্টুচরণ!" আর বিষ্টু অমনই ধনুকের মতো বেঁকে দাঁড়াচ্ছে সামনে, বুক-পিঠ একেবারে এক হয়ে যাচ্ছে তখন।

"আমি অবশ্য দাঁড়াইনি, কিন্তু যেতে-যেতে যেটুকু কথা কানে এসেছিল, তাতেই আমার

লোকটার ওপর রাগ ধরে যাচ্ছিল। বিষ্টুচরণ বলছিল, "কত দাম হবে জানেন মণিটার ? রাজার ঐশ্বর্য্য— একবার যদি কোনওরকমে···"

ছি ছি ছি, এই কিনা গুরুদেবের চেলা! কথাটা আমি বলিনি বড়মামাকে, কিন্তু মন-টন খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিল আমার।

অনুষ্ঠানটা যখন শুরু হল তখন অবশ্য আর মনখারাপ লাগা-টাগা ছিল না। পুজোর ব্যাপারটা তো ভাল বটেই, গুরুদেবের শোধন করবার কায়দাকানুনও খুব ভাল লাগছিল। অনুষ্ঠান শেষ হলে প্রসাদ খেয়ে আমরা সব জড়ো হয়েছিলাম বড়মামার বৈঠকখানায়। গুরুদেব জাঁকিয়ে বসে ছিলেন ডিভানে তাকিয়ে ঠেস দিয়ে, পায়ের কাছে বিষ্টুচরণ। ওদিকের সোফায় আমি মা আর বড়মামিমা। আর একটা সোফায় ভুলুদা আর ভুলুদার মা। টিভি আর টেলিফোনের মাঝখানে আপেল মোড়ায়। সেন্টার-টেবিলে মুখোমুখি বড়মামা আর নালুমামা।

ঘটনাটা ঘটে গেল বড়মামা নীলকান্ত মণির সুন্দর ছোট্ট বাক্সটা টেবিলে রাখবার প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে।

হঠাৎ বাড়ির আলোগুলো সব নিভে গেল।

বড়মামা বললেন, "দেখছ কাণ্ড! লোডশেডিং হওয়ার আর সময় পেলে না!"

আমিই হঠাৎ লক্ষ্য করেছি পাশের বাড়ির আলো এসে পড়েছে রাস্তার ওপর। সে-কথা বলবার আগেই বড়মামা ফিসফিস করে বলেছেন, "আরে, লোডসেডিং তো নয়, এই বাড়িতেই তো গেছে দেখছি!" তারপরই গলা চড়িয়ে বলেছেন, "রামু, টর্চ নিয়ে ফিউজটা একবার দ্যাখ তো!"

রামুদা এ-বাড়িতে কাজ করছে বহুদিন। শুনেছি তুলিদিরও জন্মের আগে থেকে। ইলেকট্রিকের কাজকর্ম একটু-আধটু জানে রামুদা, টুকটাক কিছু করতে হলে বাইরে যাওয়ার দরকার হয় না। বড়মামার কথা শেষ হওয়ার পরেই ওদিকে লণ্ঠনের আলো দেখা গেছে। মেন সুইচের ফিউজ খুলে ঠিক করতে বোধহয় একটা মিনিটও সময় লাগেনি। কিন্তু যা হওয়ার, সেটা তার মধ্যেই হয়ে গেছে।

অদ্ভুত! অবিশ্বাস্য! অকল্পনীয়!

যে যেমন ছিল ঠিক তেমনই আছে, টিভির পাশে ছোট্টুদা, এদিকে আমরা, ওদিকে ভুলুদা-রা। টেবিলের ওপর নালুমামার নস্যির কৌটোটা পর্যন্ত ঠিক তেমনই রাখা রয়েছে, একটু আগে যেমনটি ছিল। কেবল আসল জিনিসটা লোপাট। নীলকান্তমণি! শূন্য বাক্সটার ডালা ওপরদিকে তোলা রয়েছে শুধু।

নিজের চোখকেও যেন বিশ্বাস করতে পারছি না। দু' চোখ কচলে ভাল করে তাকালাম। না, কোনও ভুল নেই, নীলকান্ত মণি উধাও হয়েছে।

বড়মামার দিকে চাইলাম। ভুরু কুঁচকে গেছে, মুখচোখ থমথম করছে। কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে যেন নিজের মনেই বললেন, "আশ্চর্য! এরকম যে হবে", তারপর গুরুদেবের দিকে চেয়ে বললেন "কেন এমন হল গুরুদেব ?"

"বুঝতে পারছি না বাবা," গুরুদেব বিষণ্ণ মুখে বললেন, "অনুষ্ঠানে তো কোনও ত্রুটি হয়নি। তবু যে কেন এরকম অমঙ্গল ঘটে গেল!"

"না, না, একে অমঙ্গল বলবেন না!" বড়মামার চোয়াল শক্ত হয়ে উঠছিল।

"কথাটা খুব লজ্জার হলেও সত্যি যে, এখানে আমার একেবারে নিজের লোকেরাই আছে, আর তাদের মধ্যেই কেউ নিয়েছে মণিটা। তবে এটাও ঠিক যে, সেটা এখনও এই ঘরের বাইরে যায়নি। যে-ই লোভে পড়ে করে থাক, আমি চাই বাইরের লোক জানাজানি হওয়ার আগে যেন সেটা ফেরত দেয়। এতে আমি কিছুই মনে করব না, কিন্তু যদি তা না হয়, তবে কেলেঙ্কারী অনেকদূর গড়াবে।"

কথা শেষ করে বড়মামা সকলের দিকে একবার করে তাকালেন। ঘরে তখন একটা ছুঁচ পড়লে শব্দ শোনা যায়। মিনিটখানেক সময়কেই মনে হচ্ছিল যেন পুরো ঘণ্টা। ছোট্টুটা বিরক্ত মুখে একবার টিভি'র গায়ে হাত বোলালো। নালুমামা হতাশ একটা ভঙ্গি করে ঘাড় নাড়লেন। বিষ্টুচরণ একবার এর মুখ একবার ওর মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে শেষ পর্যন্ত হাতজোড় করে গুরুদেবের পায়ের কাছে বসে পড়ল।

"এভাবে তা হলে ব্যাপারটা মিটিয়ে নেওয়া গেল না। ঠিক আছে," বড়মামা উঠে ফোনের দিকে এগিয়ে গেলেন, "বাধ্য হয়েই পুলিশকে জানাতে হচ্ছে ব্যাপারটা। ওরাই এসে সার্চ করবে। এজন্য পরে কেউ আমাকে দোষ দিয়ো না।"

"সে কী কথা! বড়মামিমা বললেন, "পুলিশ এসে আমাদের সার্চ করবে?"

"উপায় কী! মেয়ে-পুলিশও আনতে বলেছি।"

বড়মামিমা রাগ-রাগ মুখ করে চুপ করে গেলেন। বড়মামা ফোনে লোকাল থানার সঙ্গে কথাবার্তা বলে জায়গায় ফিরে এসে বললেন, "ওরা এখনই এসে পড়বে, তবে আসার আগে ঘর থেকে কাউকে বেরোতে বারণ করল।"

"তার মানে?" ছোট্টুদা সঙ্গে-সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়েছে, "আর মিনিট পনেরো পরে বন্ধুদের সঙ্গে আমাকে দেখা করতে হবে। এখানে বসে থাকলে চলবে?"

"নির্দেশটা তো আমার নয়, পুলিশ অফিসারের।"

"তাই বলে তুমি কি জোর করে আটকাবে নাকি?"

"তা আটকাব না, তবে পুলিশ যদি মণিটা খুঁজে না পায়, তা হলে কিন্তু—"

"তা হলে? কী হবে তা হলে? তার মানে, তুমি আমাকেও সন্দেহ করো!" ছোট্টুদা রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে বলল; "বেশ তো, আমায় সার্চ করে নাও।"

"সার্চ করা আমার কাজ নয়"—বড়মামা বললেন, "সেজন্য পুলিশ আছে।"

"তাই বলে আমায় এখানে চুপ করে বসে থাকতে হবে! বুঝতে পেরেছি—দুপুরে যা বললাম, তুমি তার শোধ তুলছ! ঠিক আছে—"

উসখুস করছিলেন গুরুদেবও, বললেন, "আমাকেও তো এবার উঠতে হয় বাবা, আহ্নিকে বসতে হবে।"

"আজকের মতো একটু দেরি করুন গুরুদেব, পুলিশ না এলে"—

"বলো কী! আমাকেও তা হলে তুমি, জয় কালী!"

বড়মামিমা জিভ কেটে কী বলতে যাচ্ছিলেন, থামিয়ে দিয়ে বড়মামা বললেন, "আমাকে ভুল বুঝবেন না গুরুদেব। এ-ঘরে যারা আছে তাদের কাউকেই আমি সন্দেহ করতে পারি না, সবাই আপনজন। কিন্তু সন্দেহ যদি করতেই হয় তবে তার জন্য বাছাবাছি করাটা কি ঠিক হবে?"

"উত্তম, আমি পরেই যাব। পাপ যদি লাগে সে তোমাকেই লাগবে।"

আমার খুব জলতেষ্টা পাচ্ছিল। কী জানি কেন, হয়তো সিন্নিটা একটু বেশি খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। দরজার ওপাশে রামুদাকে দেখতে পেয়ে ইশারায় একটু জল দিতে বললাম।

নালুমামা একটু হাই তুলে নস্যির কৌটোটা অন্যমনস্কভাবে টেনে নিলেন। আস্তে-আস্তে ঢাকনা খুলে বললেন, "মরেছে! আমার নেশার জিনিসটা ফুরিয়ে গেছে যে! বাইরে তো আবার যাওয়া চলবে না!"

প্রশ্নটা ঠিক কাকে করা হল, বোঝা গেল না, তবে কথা শেষ করে নালুমামা এবার বড়মামার দিকে চেয়ে বললেন, "রামুকে দিয়ে আনানো চলবে তো?"

"ওরকম করে বলছ কেন!" বড়মামার গলায় বিষাদের সুর, "ব্যাপ্যারটা বড় লজ্জার নলিনাক্ষ, এ নিয়ে ঠাট্টা কোরো না। রামুকে বলো, এনে দেবে।"

রামুদা জল নিয়ে এসেছিল। পকেট থেকে একটা আধুলি বের করে কৌটোটা ওর দিকে এগিয়ে দিয়ে নালুমামা বললেন, "চট করে একটু নস্যি এনে দে তো বাবা। কতক্ষণ বসে থাকতে হবে, সে তো জানি না!"

নস্যির কৌটো নিয়ে রামুদা সবে দরজা পর্যন্ত গেছে, মাথার মধ্যে একটা অভাবনা কেমন যেন বিদ্যুতের মতো খেলে গেল আমার। দু-এক সেকেণ্ডের দ্বিধা, তারপরই গ্লাসটা নামিয়ে রেখে আমি উঠে দাঁড়িয়েছি, বলেছি, "দাঁড়াও রামুদা যেয়ো না।"

"রামুদা থমকে দাঁড়িয়েছে। নালুমামা অবাক হয়ে বললেন, "মানে? রামু যাবে না কেন? ও তো আর এই ঘরে ছিল না!"

"না, কিন্তু নস্যির কৌটোটা তো ছিল!"

নালুমামার মুখটা কি একটু ফ্যাকাসে হয়ে গেল! হলেও, সঙ্গে-সঙ্গে সামলে নিয়ে বললেন, "বাবা, এ যে দেখছি বাঁশের চেয়ে কঞ্চির দড়! নে বাবা, রামু, কৌটোটা খুলে ভাল করে পরীক্ষা করে নে। মণিটনি যদি থাকে!"

"খোকন!" বড়মামা একটা হালকা ধমক দিলেন আমাকে, "ওসব কথা বলছিস কেন?"

"কেন বলছি, কৌটোটা হাতে নিলেই তুমি বুঝতে পারবে।"

"মানে?"

"রামুদা!" অকস্মাৎ তীব্র চিৎকার করে উঠেছি আমি, কারণ ও তখন সুযোগ বুঝে কৌটো নিয়ে দরজার বাইরে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। চিৎকার শুনে থতমত খেয়ে ফিরে দাঁড়াল। আমি সেই ভাবেই বললাম, "কৌটোটা তুমি বড়মামার হাতে দাও।"

রামুদার মুখ কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই রক্তহীন হয়ে গেল। পায়ে-পায়ে এগিয়ে আসছিল, বড়মামার কাছাকাছি এসেই তাঁর পায়ের ওপর সটান আছড়ে পড়ে হাউমাউ করে কেঁদে উঠল, "বাবু, আপনার পায়ে পড়ি বাবু, এবারকার মতো আমারে মাপ করি দ্যান বাবু—"

এবকম কিছু যে হবে, বড়মামা নিজেও তা ভাবতে পারেননি বোধ হয়। কোনওরকমে পা সরিয়ে নিয়ে বললেন, "কী হয়েছে কী, সেটা বলবি তো!"

"অভাবে স্বভাব নষ্ট বাবু। মেয়েটার জোর অসুখ দেশ থেকে চিঠি পেইছি—ডাক্তার নাকি বলছে অপ্‌রেশন করতি হবে। দু' হাজার ট্যাকা খরচ। মাথা খারাপ হয়ে গেল বাবু, অত ট্যাকা তো আর আপনারে বলিলি আপনি দেবেন না! নালুব্যাবু কথাটা জানতি চাইলেন। —বললাম! তা বললেন, আমারে একটা ছোট্ট কাজ করে দে—দেবোনে দু' হাজার ট্যাকা। লোভ সামলাতে পারলাম না বাবু। তাই—

"তা তুমি মেন সুইচ বন্ধ করে নালুমামাকে হাত সাফাইয়ের সুযোগ দিলে!" আমি বললাম, "আর এখন যাচ্ছিলে সেটা সরিয়ে রাখতে। তাই না?"

"দাঁড়া, দাঁড়া," বড়মামা তাড়াতাড়ি কৌটোর ঢাকনি খুলে সেটা টেবিলের ওপর উপুড় করলেন। একরাশ নস্যির মধ্য থেকে ঠক করে মণিটা পড়ল টেবিলে। সঙ্গে সঙ্গে রুমাল দিয়ে মুছে সেটা হাতের তালুতে রাখলেন বড়মামা।

আঃ! নীলকান্তমণি তো নীলকান্তমণি! নীল আভায় ঘর একেবারে ঝকঝক করছে।

বড়মামা সাবধানে সেটা বাক্সে ভরতে-ভরতে বললেন, "কিন্তু এতসব ব্যাপার তুই বুঝলি কেমন করে?"

"আগে কিছুই বুঝিনি বড়মামা," আমি বললাম, "নস্যি আনার কথা শুনেই হঠাৎ আমার মনে পড়ে গেল নালুমামা তো সকালে কৌটো ভর্তি করে নস্যি আনিয়েছেন রামুদাকে দিয়ে—আমি দেখেছি। বাবাও তো খুব নস্যি নেন, কিন্তু যেদিন আনি সেদিন তো ফুরায় না, অন্তত দুদিন চলে। মনে হল ওর মধ্যেই নেই তো মণিটা! সঙ্গে-সঙ্গে আরও অনেক কথা খেলে গেল মাথায়। হাত-সাফাইয়ের খেলা নালুমামা খুব ভাল জানেন। আলোটা ঠিক ওই সময়েই বা নিভল কেন। ফিউজ কেটে গেছে? এত তাড়াতাড়ি কি ফিউজ পালটানো সম্ভব! এ-ঘরে আমরা সবাই বসে রয়েছি, গুরুদেবও রয়েছেন, ফিউজ

পালটাবার আগে রামুদা একটা আলো তো অন্তত দিয়ে যাবে এই ঘরে! সমস্ত মিলিয়ে এ যোগসাজসের ব্যাপারটা এমন স্পষ্ট হয়ে গেল যে, আমি—"

বড়মামা মুখে চোখে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন দেখে লজ্জায় আমি কথা শেষ করতে পারলাম না। বড়মামা মণিটার বাক্সটার গায়ে আর-একবার হাত বুলিয়ে বললেন, "নাঃ, চালটা নলিনাক্ষ ভালই চলেছিল! নস্যির কৌটোটা টেবিল থেকে তোলেন পর্যন্ত, পাছে সন্দেহ হয়। অথচ তোর চোখকে ফাঁকি দিতে পারল না, রে খোকন! জিতা রহো ভাগ্নে, আসল চ্যাম্পিয়ান তুই এবারই হলি। ক্যালকুলেটরে আর কুলোবে না, এবার তোকে একটা—"

খেয়াল করিনি, নালুমামা উঠে দাঁড়িয়েছেন। দরজার বাইরে পড়েছেন দেখেই বড়মামা চিৎকার করে উঠেছেন।

আমরা সকলেই উঠে পড়েরিলাম! কিন্তু—

কিন্তু তার আর দারকার ছিল না। বাইরের দরজায় ঠিক তখনই একটা জিপ এসে দাঁড়াবার শব্দ পাওয়া গেছে।

———



আমার নাম রনি

অনীশ দেব



আমি বন্দুকসমেত ডান হাতটা সামনে টান-টান করে বাড়িয়ে ধরলাম। কয়েক সেকেণ্ড অপেক্ষা করে বললাম, "কাঁধের কাছটায় লাগছে। তা ছাড়া লক্ষ্য করেছেন, হাতটা সামান্য কাঁপছে?"

ডক্টর মজুমদার আমার হাতটা ধরে সামান্য নেড়েচেড়ে দেখলেন। তারপর বললেন, "কাঁধের জয়েণ্টটা একবার চেক করে দিচ্ছি। আর সফ্‌টওয়্যারটা একটু ঠিকঠাক করে দিলেই কাঁপুনিটা থেমে যাবে।"

শুরু হল ডক্টর মজুমদারের খুঁটিনাটি চিকিৎসা। আমি চুপচাপ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। দেখতে লাগলাম লেসার বন্দুক-ধরা হাতটা। কেমন অবাক লাগল। আমার শরীরের কোথায় কী একটা মাইক্রোপ্রসেসর রয়েছে, তার প্রোগ্রাম সামান্য রদবদল করে দিলেই বন্দুক-ধরা হাতের কাঁপুনি থেমে যাবে। কী আশ্চর্য! অবশ্য এই বৃদ্ধ বিজ্ঞানীর পক্ষে সবই সম্ভব। রোবটশাস্ত্র আর কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার গবেষণায় দুনিয়াজোড়া নাম। আমাদের গোয়েন্দা-বিভাগ শুধু-শুধু এঁকে বিশাল অঙ্কের মাইনে দিয়ে রাখেনি। তা ছাড়া এই যে আমি এখন বেঁচেবর্তে চলেফিরে বেড়াচ্ছি, তা একমাত্র ডক্টর মজুমদারের জন্যই সম্ভব হয়েছে। নইলে আমি এখন কোথায়! এক মারাত্মক অ্যাকসিডেন্টের পর এই মানুষটাই আমাকে জোড়াতালি দিয়ে দাঁড় করিয়েছেন। এটা আমার দ্বিতীয় জীবন। আগের জীবনটা তেমন করে মনে পড়ে না।

প্রতি মাসে একবার করে আমি অভিজিৎ মজুমদারের কাছে চেকআপের জন্য আসি। এখনও এসেছি সেইজন্যই।

আমার কাঁধের কাছে ধাতব ঢাকনটা খুলে ডক্টর মজুমদার কী সব করছিলেন। এসব কাজের সময় মস্তিষ্কের সঙ্গে যোগাযোগ ছিন্ন করে দেন তিনি। ফলে আমি কিছুই টের পাচ্ছিলাম না। বরং বিশ বাই তিরিশ মাপের বিশাল ঘরের বিচিত্র জিনিসগুলো দেখছিলাম।

ঘরটা অগোছালো। দেওয়ালে টাঙানো নানা ছবি। শরীরের বিভিন্ন হাড়ের গঠন স্নায়ুবর্তনি হাত-পায়ের নানারকম জয়েন্ট, আরও কত কী। এ ছাড়া ঘরে ছড়ানো রয়েছে রাজ্যের ইলেকট্রনিক কম্পোনেন্ট, সল্ডারিং আয়রন, তার, ধাতুর পাত, মাইক্রোপ্রসেসর কিট, আর দুটো কম্পিউটার। এর মধ্যে একটা লালবাজারে আমাদের হেডকোয়ার্টারে হোস্ট কম্পিউটারের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া আছে। ফলে এটাই ওঁর অফিস, এটাই ওঁর বাড়ি।

এখন রাত দশটা। ডক্টর মজুমদার আমাকে সাধারণত রাতেই আসতে বলেন। কারণ তখন ওঁর ল্যাবের আর-সব লোকজন থাকে না। উনি জানেন, আমি নিরিবিলি পছন্দ করি।

হঠাৎই ডান হাতের সাড় ফিরে পেলাম। ডক্টর মজুমদার আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন। মাথার মাঝখানটায় টাক, চারপাশে সাদা চুলের ঝালর। বেঁটেখাটো মোটাসোটা মানুষটি। চোখে হাই পাওয়ারের চশমা। বয়সের ভারে একটু নুয়ে গেছেন। ফরসা চামড়া তামাটে হয়ে গেছে। চোখের নীচে ভাঁজ পড়েছে। ঢোলা ঘিয়ে রঙের জামা, তার চেয়েও ঢোলা কালো প্যান্ট। কোমরে সেকেলে ঢঙের বেল্ট। এই আমার জীবনদাতা, ঈশ্বর।

"নাও, রনি, এবারে ডান হাতটা নাড়াও দেখি—"

ওঁর কথামতো কাজ করলাম। না, আর কোনও অসুবিধে হচ্ছে না। এই বৃদ্ধ নিশ্চয়ই জাদু জানেন।

ঘরের শেষ প্রান্তে এককোণে একটা চৌকো বোর্ডে অনেক কালো বৃত্তের ছবি—শুটিং টারগেট। বৃদ্ধ বললেন, "রেডি—"

আমি টারগেট-বোর্ড লক্ষ্য করে খেলার বন্দুক উঁচিয়ে ধরলাম। এখান থেকে দূরত্ব ঊনত্রিশ ফুট। আমার ডিসট্যান্স মিটার সেইরকম সঙ্কেত জানাচ্ছিল আমাকে।

"অন ইয়োর মার্ক—"

আমার অপ্টো-ইলেকট্রনিক তীক্ষ্ন চোখ টারগেটের ঠিক মাঝখানের কালো বিন্দুটাই শুধু দেখতে পাচ্ছিল।

"ফায়ার—"

তৎক্ষণাৎ ফায়ার করলাম—পাঁচ সেকেন্ড সময়ের মধ্যে আঠারোবার।

ডক্টর মজুমদার হেসে বললেন, "দারুণ!" তারপর রওনা হলেন টারগেট বোর্ডের দিকে। বোধ হয় স্বচক্ষে দেখতে চান;-সেখানে প্রতিবারের মতো শুধু একটাই ক্ষতচিহ্ন রয়েছে কি না।

আমি চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম। ডক্টর মজুমদারকে দেখতে লাগলাম। উনি টারগেটের ছাপা কাগজটা হাতে নিয়ে ফিরে এলেন। বুল্স আইয়ের ফুটো দিয়ে আমাকে দেখতে-দেখতে মজা করে বললেন, "তোমার টিপ একেবারে যাচ্ছে তাই, রনি। আঠারোবার ফায়ার করলে, আর টারগেটে একটাই মাত্র ফুটো!"

আমি কষ্ট করে হাসলাম। মুখের পেশিতে টান লাগছিল। ডক্টর মজুমদার মুখের সামনে থেকে কাগজের আড়াল সরিয়ে অবাক হয়ে আমার হাসি দেখলেন। বললেন, "বাঃ, তুমি দেখছি রসিকতা বুঝতে পারছ! জানো, একটা সত্যিকারের রোবট কখনও রসিকতা বুঝতে পারে না!"

আমি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললাম, "আমি যে আসলে কী, তা-ই আমি জানি না, ডক্টর—"

আমার মাথার মধ্যে কষ্ট হচ্ছিল। কতগুলো স্মৃতি হাঁকপাঁক করছিল ফিরে আসার জন্য। কিন্তু কিছুতেই ধরা দিচ্ছে না ওরা।

অভিজিৎ মজুমদার একটা টুলে বসে পড়ে গালে হাত দিলেন। চোখ বুজে কীসব চিন্তা করলেন। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "ওসব কথা থাক, রনি। তুমি আমার কাছে একটা বড় চ্যালেঞ্জ। জানি, আমাকে তুমি হতাশ করবে না। একটু সময় দাও, সব ঠিক হয়ে যাবে। আর পুরনো কথা যখন যা মনে পড়বে, সব টেপ করে রাখবে—যেন কোনরকম ভুল না হয়।"

এসব কথা উনি প্রায়ই বলেন। প্রতি মাসেই একবার করে শুনতে হয়। কিন্তু এতে কী লাভ তা জানি না।

অভিজিৎ মজুমদার হঠাৎ-ই গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। আমার কাছে এসে বললেন, "নাও, এবারে শেষ কাজটুকু হয়ে যাক—প্রশ্ন-উত্তরের খেলা।"

প্রত্যেকবারই সব পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে এই প্রশ্ন-উত্তরের পরীক্ষা দিতে হয় আমাকে। যদি আমার উত্তরে কোনও গোলমাল হয়, তা হলে উনি বুঝতে পারেন আমার ব্রেন সার্কিট ঠিকমতো কাজ করছে না। এই পরীক্ষায় পাশ করলেই আমার ছুটি।

"তুমি কে?" ডক্টর মজুমদারের প্রথম প্রশ্ন।

আমার ইলেকট্রনিক স্মৃতিকোষে রাখা যাবতীয় তথ্য গড়গড় করে আওড়ে গেলাম।

"আমার নাম রনি সরকার। লালবাজারে ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের অপারেশন ডিভিশনের ইনস্পেক্টর।"

"তোমার আর কে-কে আছে?"

"কেউ নেই। আমি একা—"

"আমি একা", এই শব্দ দুটো আমার মাথার ভেতরে প্রতিধ্বনি তুলে ঘোরাফেরা করতে লাগল অনেকক্ষণ।

"তুমি থাকো কোথায়?"

"১৬৩ বিবেকানন্দ রোড, ব্লক-জি, ফ্ল্যাট নাম্বার ২৭২।"

"আমি তোমার কে হই?"

"আপনি, আপনি আমাকে প্রাণ দিয়েছেন। আপনি না থাকলে আমি—"

বৃদ্ধ ধমক দিয়ে বললেন, "না, আমি তোমার বন্ধু। তোমার ভাল চাই।"

আমি ওঁর কথাগুলো আবৃত্তি করলাম, আপনি আমার বন্ধু, আমার ভাল চান।"

ডক্টর মজুমদার হাসলেন, বললেন, "এই তো ভাল ছেলের মত কথা।" তারপর কিছুক্ষণ আনমনে কী ভেবে বললেন, "তোমার গলার আওয়াজে সামান্য একটু মেটালিক নয়েজ রয়ে গেছে। ওটা কী করে বাদ দেওয়া যায় দেখি। পারলে পরের মাসের চেক-আপের সময়—"

ঠিক সেই মুহূর্তে ঘরের একটা কম্পিউটার বিপ-বিপ শব্দ তুলে 'অন' হয়ে গেল। হেড-কোয়ার্টার থেকে কোনও খবর দেওয়ার থাকলেই এই কম্পিউটারটা চালু হয়ে যায়।

ডক্টর মজুমদার ব্যস্তভাবে ওটার দিকে এগিয়ে গেলেন। ওঁর পায়ে ধাক্কা লেগে বসার টুলটা কাত হয়ে পড়ে গেল। মেঝেতে কিছু কাগজপত্র ছিল—সেগুলো এলোমেলো হয়ে গেল। ততক্ষণে বৃদ্ধের অভিজ্ঞ হাত কি-বোর্ডের বোতাম টিপতে শুরু করেছে।

আমি "আসি, ডক্টর" বলে বেরিয়ে আসছিলাম, ডক্টর মজুমদার ডাকলেন আমাকে। "হেড-কোয়ার্টার থেকে তোমাকে চাইছে! ইমার্জেন্সি।"

আমি ভারী-ভারী পা ফেলে কম্পিউটারটার দিকে এগোলাম। লেসার বন্দুকটা উরুর লাগোয়া সিকিউরিটি চেম্বারে রেখে দিলাম। হেডকোয়ার্টার থেকে এত রাতে আবার কী ইমার্জেন্সি কল? আমি যে এখানে রুটিন চেক-আপের জন্য আসছি সেটা অপারেশন ডিপার্টমেন্টের ও-সি জানেন। কারণ খবর রেখে আসাটাই আমাদের রেওয়াজ!

কম্পিউটারের পরদার দিকে তাকিয়ে বুঝলাম কমিউনিকেশন নেটওয়ার্ক পুরোপুরি চালু হয়ে গেছে। কারণ, গোটা-গোটা হরফে ফুটে উঠেছে আমার কোড নম্বর আর নির্দেশ ঃ এক্ষুনি আমাকে পৌঁছে যেতে হবে সল্ট লেক সিটিতে, এ-ই ব্লকের ৬৭ নম্বর বাড়িতে। উল্টোডাঙা-ভি. আই. পি. রোডের মুখে এ এস আই বর্মন অপেক্ষা করবে। তার কোড নম্বরও ফুটে উঠল পরদায়। আমি যেন বর্মনকে গাড়িতে তুলে নিয়ে নির্দিষ্ট জায়গায় চলে যাই। যাওয়ার পথে বর্মন আমাকে সংক্ষেপে ব্যাপারটা জানিয়ে দেবে।

আমি সম্মতি জানিয়ে বোতাম টিপে আমার কোড নম্বর, জানালাম এবং বললাম যে, এক্ষুনি রওনা হচ্ছি। তারপর শেষ বোতামটা টিপতেই কম্পিউটারের সব লেখা মুছে গেল পলকে।

ডক্টর মজুমদার আমার কাঁধ চাপড়ে দিয়ে বললেন, "উইশ য়ু বেস্ট অব লাক।"

আমি বেরিয়ে আসার আগে প্রতিভাবান বৃদ্ধ মানুষটিকে কয়েক মুহূর্ত দেখলাম। এই লোকটি ছাড়া আর কেউই আমাকে ভালবাসে না। ওঁর চোখে আমি যেরকম স্নেহ-ভালবাসা মাখানো দৃষ্টি দেখি, আর কারও চোখে দেখি না। অথচ ভাসা-ভাসা মনে পড়ে, পুরনো জীবনে আমি কী সুখীই না ছিলাম।

উল্টোডাঙা-ভি. আই. পি. রোডের মোড়ে গাড়িটা পার্ক করতেই সন্দীপ বর্মন কোথা থেকে এসে গাড়িতে উঠল। আমার গাড়ির মাথায় ঘুরপাক-খাওয়া লাল-নীল বাতি রয়েছে। সুতরাং গাড়িটা

চিনে নিতে ওর অসুবিধে হয়নি। ওকে দেখেই সামনের সিটের দরজা খোলার অটোমেটিক বোতাম টিপে দিয়েছিলেন। লক্ষ্য করলাম, বর্মন একটু ইতস্তত করছে। বোধ হয় আমার পাশে বসে পথ চলায় ওর পুরোপুরি সায় নেই। আমি জানি, সহকর্মীরা আমাকে একটু-আধটু এড়িয়ে চলতে চায়। কিন্তু একসঙ্গে কাজ করতে গেলে আর উপায় কী! প্রথম-প্রথম খারাপ লাগত, কিন্তু এখন মজা পাই।

সুতরাং বর্মনকে ডাকলাম, "আরে, কী ভাবছেন, উঠে আসুন জলদি—"

বর্মন উঠে বসল আমার পাশে। গাড়ির দরজা কোনরকম শব্দ না করেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে লক হয়ে গেল আবার। ড্যাশ-বোর্ডের সেলুলার ফোন চালু করে হেডকোয়ার্টারে জানিয়ে দিলাম যে, বর্মন আমার গাড়িতে উঠে পড়েছে, আমরা আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই সল্ট লেক সিটির নির্দিষ্ট ঠিকানায় পৌঁছে যাচ্ছি।

বর্মনের চেহারা মোটার দিকে, তবে গায়ে জোর আছে। আমার সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে হেরে যাওয়ার আগে প্রায় সাত সেকেন্ড টিকে ছিল। আগে কথায়-কথায় আমাকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করত, পাঞ্জায় হেরে যাওয়ার পর থেকে আর করে না।

সন্দীপ বর্মনের বয়স চল্লিশের কাছাকাছি, থুতনিতে ভাঁজ, রগের চুলে নুন-মরিচ। সিগারেট খাওয়ার ভীষণ নেশা ওর। গাড়ি চলতে শুরু করতেই লাইটার জেবলে ফস করে সিগারেট ধরাল। ধোঁয়া ছেড়ে আমার দিকে না তাকাতেই বলল, "সরকার, এটা দয়া করে বস্‌কে জানাবেন না।"

আমি ধাতব শব্দ করে হাসলাম। বললাম, "না, বলব না। কিন্তু আমরা যাচ্ছি কোথায়? কোন ইমার্জেন্সি কাজে?"

বর্মন ভুরু বাঁকিয়ে তাকাল আমার দিকে! বলল, "আমরা প্রফেসর রূপেশ কোঠারির বাড়ি যাচ্ছি। ওঁর এগেইনস্টে কিডন্যাপিং-এর চার্জ আছে।"

আমি চমকে উঠলাম। প্রোফেসর রূপেশ কোঠারি। আপেক্ষিকতা তত্ত্ব নিয়ে গবেষণা করে সারা বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন তিনি। গত বছরে নোবেল পুরস্কারের তালিকায় তার নাম উঠেছিল। হয়তো এবার পেয়ে যাবেন। ওঁর 'ইউনিফায়েড জেনারেল থিওরি অব স্পেস-টাইম'কে বলা হয় গত সত্তর বছরের সেরা আবিষ্কার। কারণ একাত্তর বছর আগে ডিজিটাল কম্পিউটার আবিষ্কার করেছিলেন জন ভিনসেন্ট অ্যাটানাশফ ও ক্লিফোর্ড বেরি।

সেই রূপেশ কোঠারির বিরুদ্ধে অপহরণের অভিযোগ।

আমার মুখে অভিব্যক্তিগুলো ঠিকঠাক ফোটে না। সেটাই হয়তো বর্মন লক্ষ্য করছিল। দেখছি, সহকর্মীরা সবসময় আমাকে কৌতূহলের চোখে দেখে।

সন্দীপ বর্মন নির্বিকারভাবে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে লাগল। আমি গাড়ির নিয়ন্ত্রণ অটো-পাইলটের ওপরে ছেড়ে দিয়ে বর্মনের দিকে তাকিয়ে রইলাম। প্রায় দশ সেকেন্ড তাকিয়ে থাকার পর বললাম, "ব্যাপারটা খোলাখুলি জানতে পারি?"

উত্তেজিত হয়ে পড়লে আমার গলার স্বরে ধাতব ঝঙ্কার বেড়ে যায়। অন্তত ডক্টর মজুমদারের বক্তব্য তাই। এখন গলাটা অনেকটা সেইরকম শোনাল বলেই মনে হল।

বর্মন এবারে মুখ খুলল। ওর কাছ থেকে গোটা গল্পটা শোনা গেল।

রূপেশ কোঠারি ও বিক্রম সেনগুপ্ত দুই নামজাদা বিজ্ঞানী, আর ছোটবেলাকার বন্ধুও বটে। পদার্থবিদ্যার গবেষণায় ডক্টর কোঠারির খ্যাতি রীতিমত ঈর্ষা করার বিষয়। আর পাশাপাশি বিক্রম সেনগুপ্ত ভারতের একজন সম্মানিত বিজ্ঞানী হলেও, আন্তর্জাতিক আসরে কখনই রূপেশ কোঠারির মর্যাদা পাননি। কিন্তু তা সত্ত্বেও ওঁরা দু'জনে যৌথভাবে গবেষণা করেছেন, দু'জনের নামে বিদেশের পত্রপত্রিকায় কয়েকটি গবেষণাপত্রও প্রকাশিত হয়েছে। সম্প্রতি ওঁরা একটি চাঞ্চল্যকর তত্ত্ব আবিষ্কার করেছেন, তবে কে এর প্রধান আবিষ্কারক, তা নিয়ে দু'জনের মধ্যে বেঁধে গিয়েছিল ঠান্ডা লড়াই।

মনে পড়ে গেল, তিনদিন আগেই টিভি, নিউজপেপারে এই বিতর্কের খবর প্রচার করা হয়েছে এবং বিক্রম সেনগুপ্ত আবিষ্কারের সিংহভাগ দাবি করেছেন। তিনি এও বলেছেন, অধ্যাপক কোঠারির বহু গবেষণাপত্রেই তাঁর অবদান রয়েছে। সোজা কথায়, কোঠারি তাঁর গবেষণার ফল আগে একাধিবার আত্মসাৎ করেছেন। কিন্তু এইবার তিনি চুপ করে থাকতে পারেননি।

"এ-ব্যাপারে রূপেশ কোঠারি কী বলছেন? আমি জানতে চাইলাম। সন্দীপ বর্মনের সিগারেট শেষ হয়ে গিয়েছিল। সেটা গাড়ির ডিসপোজাল বক্সে ফেলে দিয়ে বলল, কী আবার বলবে, একই কথা। তিনি বলছেন, বহু ক্ষেত্রেই তিনি দয়া করে নিজের গবেষণায় বিক্রমকে ভাগ বসাতে দিয়েছেন। বিক্রম সেনগুপ্ত ব্যর্থ বিজ্ঞানী, অন্তত রূপেশ কোঠারির মতে।"

"এর মধ্যে কিডন্যাপিং এল কোত্থেকে?"

বর্মন হাসল, বলল, "শুনলে আপনি হাসবেন। আজ রাতে ডক্টর কোঠারির বাড়িতে ডক্টর সেনগুপ্তর নেমন্তন্ন ছিল—সপরিবারে। সেনগুপ্তের স্ত্রী আলসারের রুগি, তাই নেমন্তন্নে যান নি। তবে সেনগুপ্ত তাঁর মেয়ে নিনিকে নিয়ে গিয়েছিলেন কোঠারির বাড়িতে। নিনির বয়স বছর বারো, ক্লাশ সিক্সে পড়ে, লোরেটো—বউবাজারে। খাওয়াদাওয়ার শেষে নিনি নাকি ডক্টর কোঠারির ল্যাবরেটরি দেখতে চায়। বিক্রম সেনগুপ্ত তখন ড্রইংরুমে বসে কী একটা ম্যাগাজিন দেখছিলেন। রূপেশ কোঠারি নিজের বাড়িতেই বিশাল ল্যাবরেটরি করেছেন, সেটা আবার ড্রইংরুমের লাগোয়া। ফলে বলতে গেলে একরকম সেনগুপ্তের চোখের সামনে দিয়েই নিনি আর কোঠারি ল্যাবে ঢুকেছে, কিন্তু ল্যাব থেকে ওরা কেউ বেরোয়নি। কয়েক মিনিট পরেই সেনগুপ্ত ল্যাবে গিয়ে দেখেন, সেখানে কোঠারি একা দাঁড়িয়ে একটা ইলেকট্রোম্যাগনেটের সামনে ঝুঁকে পড়ে কী যেন করছেন। নিনি নেই! ভোজবাজির মতো মেয়েকে যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে!"

বুঝলাম, তারপরই হইচই, লালবাজারে টেলিফোন ইত্যাদি হয়েছে। রূপেশ কোঠারি প্রকান্ড মাপের বিজ্ঞানী, কিন্তু অভিযোগটাও তো নেহাত ছোট মাপের নয়।

বর্মনের কাছেই শুনলাম, ব্যাপারটা হেডকোয়ার্টারে পৌঁছয় সাড়ে আটটা নাগাদ। সঙ্গে-সঙ্গে তদন্তকারী দল হাজির হয়েছেন ডক্টর কোঠারির আস্তানায়। সেই দলে বর্মনও ছিল।

ডক্টর সেনগুপ্ত কোঠারির বাড়িতেই ছিলেন। কোঠারি বিয়ে-থা করেননি। সুতরাং বাড়িতে দু'জন কাজের লোক ছাড়া আর কেউ নেই। পুলিশ যতরকমভাবে সম্ভব জিজ্ঞাসাবাদ করেছে ওঁদের, তবে যথারীতি কোনও লাভ হয়নি। তারপর তারা হিমশিম খেয়ে গেছে দুই বিজ্ঞানীকে নিয়ে।

আমি সমস্যাটার কথা অবাক হয়ে ভাবছিলাম। বললাম, "কিডন্যাপিংয়ের ব্যাপার কোঠারি কী বলছেন?"

সল্ট লেকের ভেতরে ফাঁকা রাস্তা ধরে গাড়ি হু-হু করে ছুটছিল। জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে হাওয়া খেতে-খেতে বর্মন বলল, "কোঠারি বলছেন, নিনি একাই ল্যাব ছেড়ে বেরিয়ে গেছে। আর সেনগুপ্ত বলছেন, অসম্ভব। কারণ এক মুহূর্তের জন্যও ল্যাবের দরজা তাঁর চোখের আড়াল হয়নি। ব্যস!"

গাড়ির সেলুলার ফোন বিপ-বিপ করে বেজে উঠল। ফোন তুলে কানে দিলাম।

রনি সরকার বলছি—"

ওপাশ থেকে এ-সি বিকাশ মিত্রের গলা শোনা গেল।

"সরকার, আপনারা স্পটের প্রায় কাছাকাছি এসে গেছেন। বর্মন আপনাকে সব কথা হয়তো বলেছে, তবে সব খবর জানাতে পারলেও একটা ব্যাপার ও বলতে পারবে না। এই কেসে হঠাৎ আপনাকেই বা ডেকে পাঠানো হল কেন? সেটাই এখন আপনাকে জানাচ্ছি—আপনার জন্য দরকার।" চিফ একটু থেমে আবার বললেন, "নিনির উধাও হওয়ার পেছনে কোনও সায়েণ্টিফিক মিস্ট্রি রয়েছে বলে আমার ধারণা। কোঠারির ল্যাবের সমস্ত ডিটেইল্‌স আমাদের চাই। আমি জানি, আপনার অপ্টো-ইলেকট্রনিক চোখে কিছুই এড়িয়ে যায় না। আর আমার এই ডিপার্টমেণ্টে বিজ্ঞানের মার-প্যাঁচ আপনার চেয়ে ভাল কেউই বোঝে না। সুতরাং বেস্ট অব লাক।"

লাইন কেটে গেল।

সন্দীপ বর্মন একটা কথাও শুনতে পায়নি। ভুরু উঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল, "কে?"

আমি বললাম, "বসের ফোন।"

আর বারো সেকেণ্ডের মধ্যেই ডক্টর রূপেশ কোঠারির বাড়িতে পৌঁছে গেলাম আমরা।

অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকা আধুনিক স্থাপত্যের বিশাল বাড়িটা দেখে মনেই হয় না এ-বাড়িতে এরকম একটা ঘটনা ঘটেছে। নিনিকে শেষপর্যন্ত পাওয়া যাবে তো?

দোতলার আধুনিক সুসজ্জিত ড্রইংরুমে ওঁদের দু'জনকে পেলাম। যথেষ্ট দূরত্ব রেখে দুটো সোফায় বসে। একজনের হাতে একটা ম্যাগাজিন। অন্যজন দেওয়ালে টাঙানো রবীন্দ্রনাথের হস্তলিপির প্রতিকৃতি দেখছেন। রেখেই বোঝা যায়, দুই বিজ্ঞানীর এখনও আড়ি রয়েছে, ভাব হয়নি।

আমাদের ঢুকতে দেখেই দ্বিতীয়জন ছেঁড়া স্প্রিংয়ের মতো ছিটকে লাফিয়ে উঠলেন সোফা ছেড়ে! সন্দীপ বর্মনের কাছে গিয়ে বললেন, নিনিকে পাওয়া গেল, ইনস্পেক্টর?"

ভদ্রলোক যেরকম উদ্‌গ্রীব এবং তাঁর মুখচোখ যেরকম উদ্‌ভ্রান্ত, তাতে সন্দেহ নেই, ইনিই বিক্রম সেনগুপ্ত। পরনে ছাই রঙের সাফারি স্যুট। কপাল বেশ বড়। মাথার চুল তেলতেলে পরিপাটি করে আঁচড়ানো। চোখ বড়-বড়, বুদ্ধিদীপ্ত। ভুরু ঘন এবং টানা। মুখে বয়সের সূক্ষ্ম ভাঁজ। কথা বলেন সামান্য টেনে-টেনে।

বর্মন বেশ গম্ভীর মুখে আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল।

"ইনস্পেক্টর রনি সরকার। আপনাদের কেসটা এখন ইনিই ইনভেস্টিগেট করবেন—"

রূপেশ কোঠারি ইতিমধ্যে হাতের ম্যাগাজিন নামিয়ে রেখেছেন টেবিলে। কৌতূহলী চোখে আমাকে লক্ষ্য করতে করতে উঠে এসেছেন কাছে। স্মিত হেসে হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন হ্যান্ডশেক করার জন্য।

সাধারণত আমি হ্যান্ডশেক ব্যাপারটা এড়িয়ে চলি। কিন্তু এখন এড়ানো গেল না। আড়ষ্ট-ভাবে হ্যান্ডশেক করলাম। হাতের চাপ যতটা সম্ভব নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করলাম একই সঙ্গে। তবুও লক্ষ্য করলাম, রূপেশ কোঠারির মুখে কিছুটা যন্ত্রণা ও বিস্ময়ের ভাব ফুটে উঠেছে।

ঘরে বেশ কয়েকটা সোফা ছিল। আলাপের পালা শেষ করে আমরা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসলাম সোফাগুলোয়। আমি যে-সোফাটায় বসলাম, সেটা মচমচ শব্দ করে উঠল। তবে তার বেশি কিছু হল না।

অধৈর্য বিক্রম সেনগুপ্তকে হাতের ইশারায় শান্ত হয়ে বসতে বললাম আমি। তারপর রূপেশ কোঠারিকে উদ্দেশ করে বললাম, "প্রফেসর কোঠারি, পুরো ব্যাপারটা আপনার মুখ থেকে আর একবার শুনব। প্লিজ, বিরক্ত হবেন না।"

কোঠারি শব্দ করে হাসলেন। ওঁকে বয়সের তুলনায় ছোট দেখাচ্ছিল। চনমনে চোখ। লম্বাটে মুখ। দাড়ি এমনভাবে কামিয়েছেন যে, এত রাতেও খোঁচা-খোঁচা দাড়ি বেরোয়নি! সরু করে ছাঁটা গোঁফ। আর মাথার চুল প্রায় কদমছাঁট। পরনে সবুজ রঙের সরু চেক-কাটা বুশ শার্ট। সাদা টেরিকটের প্যান্টের ভেতর গুঁজে পরেছেন!

কোঠারির গলার স্বর বেশ চমৎকার। ভদ্রলোক বিজ্ঞান না শিখে গান শিখলেও বোধ হয় কেউকেটা হতে পারতেন। প্রায় ধারাবিবরণী দেওয়ার মতো করে নিনির উধাও হওয়ার ব্যাপারটা বলে গেলেন তিনি! ওঁর কথা বলার ফাঁকে-ফাঁকেই বিক্রম সেনগুপ্ত উত্তেজিত হয়ে বাধা দিয়ে উঠছিলেন, বর্মন কোনওরকমে তাঁকে নিরস্ত করে রাখল।

শুনছিলাম, আর বারো বছরের নিনির কথা ভাবছিলাম। মেয়েটা গেল কোথায়?

রূপেশ কোঠারির গল্পে নতুন আর কিছু পাওয়া গেল না। সুতরাং, বর্মনকে বিক্রম সেনগুপ্তের

কাছে বসতে বলে ডক্টর কোঠারিকে নিয়ে এগোলাম ল্যাবরেটরির দকে। বললাম, "চলুন প্রোফেসর কোঠারি, আপনার ল্যাবরেটরিটা একবার দেখব—"

প্রোফেসর কোঠারি এমনভাবে আমার দিকে তাকালেন, যার অর্থ হল, "ল্যাবরেটরি দেখে আপনি কি কিছু বুঝবেন ?

আমি ওঁর তাকানোয় আমল দিলাম না। কোঠারি জানেন না, আমি ঘুরে-ঘুরে ওঁর ল্যাবরেটরি দেখা মানেই ল্যাবরেটরির প্রতিটি ইঞ্চি ধরা পড়ে যাবে আমার অপ্টো-ইলেকট্রনিক চোখে এবং রেকর্ড হয়ে যাবে ভিডিও-টেপে।

বর্মন আমার দিকে তাকিয়ে ইশারায় কিছু একটা বলতে চাইল। আমি ওর চোখে চোখ রেখে বললাম, "কিছু বলবেন ?"

ও তখন ইতস্তত করছে দেখে বুঝলাম, দুই বিজ্ঞানী হাজির থাকায় ও ঠিক মুখ খুলতে পারছে না। আমি ঠোঁট টেনে হাসার চেষ্টা করে বললাম, "জোরে বলার দরকার নেই, শুধু ঠোঁট নাড়ালেই আমি বুঝতে পারব—"

বর্মনের বোধ হয় খেয়াল নেই, আমি লিপ রিড করতে পারি। আমার কথায় ওর খেয়াল হল। শুধু ঠোঁট নেড়ে ও বলল, "আমরা ল্যাবরেটরি তন্নতন্ন করে দেখেছি, ওখানে কিছু নেই। তা ছাড়া প্রত্যেকটা জানলায় শক্তপোক্ত গ্রিল লাগানো—"

আমি হাত নেড়ে ওকে আশ্বস্ত করে বললাম, "ঠিক আছে—"

তারপর কোঠারির সঙ্গে ঢুকে গেলাম ল্যাবরেটরিতে।

ল্যাবরেটরি আমি আগে অনেক দেখেছি, কিন্তু তা সত্ত্বেও ডক্টর কোঠারির ল্যাব আমাকে চমকে দিল।

বিশাল মাপের ঘরে প্রচুর যন্ত্রপাতি। তার কোনও-কোনওটার চেহারা যেমন প্রকাণ্ড, তেমনই কিম্ভূত। চেনা যন্ত্রের মধ্যে একটা পার্টিকল্ অ্যাকসিলারেটর আর একটা এক্স-রে ডিফ্র্যাকশন স্পেক্ ট্রোমিটার চোখে পড়ল।

রূপেশ কোঠারির খ্যাতি দুনিয়াজোড়া। সুতরাং ওঁকে ল্যাবরেটরি তৈরির টাকা দেওয়ার সংস্থার অভাব নেই। তা ছাড়া বহু বিদেশি যন্ত্রপাতি তিনি স্রেফ উপহার হিসেবে পেয়েছেন।

আমি ল্যাবরেটরি দেখছিলাম আর মনে মনে এ-পর্যন্ত পাওয়া তথ্যের লজিকগুলো যাচাই করে দেখছিলাম। কোথায় গেল নিনি ?

একটা বারো বছরের মেয়ে চোখের সামনে থেকে উধাও হয়ে গেল চিন্তার ব্যাপার। আর এক্ষেত্রে যেহেতু ব্যাপারটা হয়েছে রূপেশ কোঠারির বাড়িতে, সেহেতু তাঁর দুশ্চিন্তা হওয়া উচিত আরও বেশি। কিন্তু সেই তুলনায় তাঁকে যেন বেশ নিশ্চিন্তই দেখাচ্ছে! হাসিখুশি, খোশমেজাজি। বরং বিক্রম সেনগুপ্তের হাবভাব অনেক স্বাভাবিক। ওইরকম একটা মেয়ে হারিয়ে গেলে যেরকম দুঃখ পাওয়ার

কথা, যেরকম উদ্‌ভ্রান্ত হওয়ার কথা, ওঁকে দেখে ঠিক সেইরকম মনে হয়েছে। মেয়ে হারানোর কষ্ট বড় সাংঘাতিক। আমি জানি। আমারও একটা মেয়ে ছিল। কতই বা বয়স ছিল? সাত? আট? ঠিক মনে পড়ছে না।

রূপেশ কোঠারির কথায় সংবিৎ ফিরল। কোঠারি তখন বলছিলেন, "মিস্টার সরকার, বলুন, আমার ল্যাবের কী-কী দেখতে চান আপনি?

একপাশে একটা টেবিল নানান কাগজপত্রের স্তূপ পড়েছিল। আমি সেদিকে এগিয়ে যেতে-যেতে বললাম, "প্রফেসর কোঠারি, ডক্টর সেনগুপ্তের সঙ্গে আপনার কী ঝামেলা আছে জানি না, তবে এটা বলতে পারি, একটা ছোট্ট মেয়ে বোধ হয় কোনও দোষ করেনি—। বেচারা কৌতূহলের বশে শুধুই আপনার ল্যাব দেখতে চেয়েছিল।"

প্রফেসর কোঠারি বেশ বিরক্তভাবে বললেন, "ভেবেছিলাম, আপনি বোধ হয় অন্যদের তুলনায় ইনটেলিজেন্ট। এখন দেখছি, আমারই ভুল। কম করে হাজারবার আমি বলছি যে, নিনির ব্যাপারে আমি কিছু জানি না। ল্যাব দেখতে-দেখতে ও হঠাৎই এ-ঘর ছেড়ে বেরিয়ে চলে গেছে। তারপর কোথায় গেছে, সে আমি কী করে বলব!"

আমি টেবিলের কাছে গিয়ে কয়েকটা কাগজ উলটেপালটে দেখলাম। তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললাম, "আপনার ল্যাবের যন্ত্রগুলোর বিষয়ে আমাকে একটু সহজ করে বুঝিয়ে বলুন—যদি আপনার কোনওরকম আপত্তি না থাকে।"

"না, না, আপত্তির কী আছে?" রূপেশ কোঠারি দু' দিকে দু হাত ছড়িয়ে কাঁধ ঝাঁকালেন, "তবে, সবই কম্প্লিকেটেড অ্যাপারেটাস, কতটা সহজ করে বোঝাতে পারব জানি না—"

শেষদিকে ওঁর কথার মধ্যে একটা অবজ্ঞার সুর ধরা পড়ল। আমি সেটা গায়ে মাখলাম না। কারণ আমার শরীরে লুকিয়ে রাখা অটো-রেকর্ডার শুরু থেকেই চালু হয়ে গেছে। যাবতীয় শব্দ ধরা পড়ছে সেই নিখুঁত যন্ত্রে। পরে সেই যন্ত্রে প্লে-ব্যাক করে শোনা হবে বারবার। তারপর বিশেষজ্ঞরা তার চুলচেরা বিচার করবেন। সুতরাং যন্ত্রগুলোর বিবরণ বা কার্যপ্রণালী আমি না বুঝলেও কোনও ক্ষতি নেই। তবে বোঝার চেষ্টা আমাকে করতেই হবে।

ডক্টর কোঠারি বলতে শুরু করলেন। যন্ত্রগুলোর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিতে লাগলেন। তাঁর কথার মধ্যে নানান জটিল শব্দ উঁকি মারতে শুরু করল: স্পেস-টাইম কার্ভেচার, ট্যাকিয়ন অ্যাকসিলারেটর, এক্স-রে ডিফ্র্যাকশন, রিলেটিভ রিলেটিভিটি, অ্যান্টিগ্র্যাভিটেশন, ফিফ্‌থ ফোর্স এস্টিমেশন, ইত্যাদি।

এইসব কথার ফাঁকে আমি টেবিলের কাগজপত্রগুলোই ঘাঁটছিলাম। যদি কোন কিছুর হদিস পাওয়া যায়! এর মধ্যে হঠাৎই বিক্রম সেনগুপ্ত ক্ষিপ্তভাবে ছিটকে এলেন ঘরের মধ্যে। চিৎকার করে

বলে উঠলেন, "ইনস্পেক্টর সরকার, এভাবে আপনি ওর কাছ থেকে কোনও কথা বের করতে পারবেন না। ও বড় শক্ত চিজ—"

সঙ্গে-সঙ্গে সন্দীপ বর্মন এসে ঘরে ঢুকল। ও হাই তুলতেই তাকালাম হাতঘড়ির দিকে। রাত হয়েছে। প্রায় সাড়ে এগারোটা বাজে।

বর্মন তাড়াতাড়ি এসে প্রফেসর সেনগুপ্তের হাত ধরল, বলল, "প্লিজ প্রোফেসর, ও-ঘরে চলুন। এরকম করলে ইনভেস্টিগেশনে অসুবিধে হবে—"

প্রায় ধস্তাধস্তি শুরু হয়ে গেল দু'জনের। তখন আমি বর্মনকে ইশারায় থামতে বললাম। ডক্টর সেনগুপ্তের সাফারি স্যুটে ভাঁজ পড়েছে, মাথায় পরিপাটি চুল আর ততটা পরিপাটি নেই।

রূপেশ কোঠারি একটি যন্ত্রের পাশে চুপটি করে দাঁড়িয়েছিলেন। হাত নেড়ে কাল্পনিক ধুলো ঝাড়লেন চেক-শার্ট থেকে। লম্বাটে মুখে সামান্য যেন মজার ছোঁওয়া।

আমি বিক্রম সেনগুপ্তকে কাছে ডাকলাম। গলা নামিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, ড্রইংরুমে বসে আপনি এমন কিছুই শুনতে পাননি, যাতে ব্যাপারটার একটা আঁচ পাওয়া যায়! ভালভাবে মনে করে দেখুন তো!"

ডক্টর সেনগুপ্ত মাথার চুল ঠিকঠাক করতে-করতে বললেন, "মনে করে নতুন কী আর বলব! সবই তো বলেছি—" অসহায় চোখে বর্মনের দিকে তাকালেন তিনি।

আমার মাথার ভেতরে বিভিন্ন লজিক কাটাকুটি খেলছিল। রূপেশ কোঠারির চোখেমুখে সামান্য তাচ্ছিল্য, বিদ্রূপ, এইসব আরও উত্তেজিত করে তুলেছে বিক্রম সেনগুপ্ত।

আমি ওঁকে জিজ্ঞেস করলাম, "আচ্ছা, প্রফেসর কোঠারি রিনির সঙ্গে কী কথা বলেছিলেন? আপনি শুনতে পাননি কিছু?"

সেনগুপ্ত বললেন, "পাব না কেন? পুলিশকে সেসব বলেওছি।" একটু থেমে আবার বললেন, "নেহাতই মামুলি ছেলেমানুষি কথা।"

আমি বর্মনকে বললাম, "মিস্টার বর্মন, আপনি প্রফেসর কোঠারিকে নিয়ে পাশের ঘরে গিয়ে বসুন। আমরা একটু নিরিবিলি কথা বলব।"

সন্দীপ বর্মন ঠোঁট উলটে এমন একটা মুখের ভাব করল, যার অর্থ ঃ হুজুরের যা মরজি।

ওরা চলে যাওয়ার পর বিক্রম সেনগুপ্তকে বললাম, "প্রফেসর, আপনার সেই মামুলি ছেলেমানুষি কথাগুলো এবারে আর-একবার বলুন, প্লিজ—"

একটু সময় নিয়ে বিক্রম সেনগুপ্ত বোধ হয় মনে-মনে গুছিয়ে নিলেন নিজেকে। তারপর বলতে শুরু করলেন, "এই একবার শুনলাম রিনি বলেছে, বাব্বাঃ, ঘরটা কত বড়। এতসব যন্ত্র দিয়ে কী হয়? উত্তরে রূপেশ বলল, বিজ্ঞানের নানারকম গবেষণার কাজ হয়। তারপর আরও কী-কী বলেছিল, ভাল করে খেয়াল করিনি। আবার একসময় রিনির কথা কানে এল ঃ কাকু, একটাও

খেলার যন্ত্র নেই ঃ তাতে রূপেশ বলল, আছে, এই তো—লুকোচুরি খেলার যন্ত্র। নিনি বলল, কই, দেখি—। তারপর আর কোনও কথা শুনতে পাইনি।"

আমি বললাম, "নিনিকে আপনি খুব ভালবাসতেন ?"

অবাক মারমুখি নজরে আমাকে দেখলেন ডক্টর সেনগুপ্ত। প্রায় চিৎকার করে বললেন, "ভালবাসতেন ? তার মানে ? এখনও ভালবাসি, ইনস্পেক্টর। ওকে আপনি যে করে হোক খুঁজে এনে দিন—প্লিজ···"

শেষদিকে ভদ্রলোক কেঁদে ফেললেন। গলার স্বর ভেঙে গেল। হাত ঘষলেন চোখে।

আমার কষ্ট হচ্ছিল। শরীরের ভেতরে লজিক সারকিটগুলো ঠিকঠাক কাজ করছিল। মনে হল, বিক্রম সেনগুপ্ত বড় অসহায়। নিনি অন্তর্ধান রহস্যের উত্তর লুকিয়ে রয়েছে ডক্টর রূপেশ কোঠারির আস্তিনের ভেতরে। কোঠারি পৃথিবী বিখ্যাত বিজ্ঞানী হতে পারেন, কিন্তু পিতৃস্নেহ সম্পর্কে ওঁর জ্ঞান স্রেফ শূন্য।

ডক্টর সেনগুপ্তকে বললাম, "আপনি ড্রইংরুমে গিয়ে বিশ্রাম নিন—"

বিক্রম সেনগুপ্ত চলে যেতেই ঘরে আমি একা, আর শুধু কতগুলো জটিল যন্ত্র। এর মধ্যে সত্যিই কি কোনও লুকোচুরি খেলার যন্ত্র রয়েছে ?

যন্ত্রগুলো একে-একে দেখতে-দেখতে আবার ফিরে গেলাম টেবিলের কাছে। কাগজপত্রগুলো দেখতে শুরু করলাম আবার।

খুটিয়ে দেখতে-দেখতে হঠাৎ একটা কাগজে নজর আটকে গেল আমার। সাদা কাগজে কালি দিয়ে চৌকোনা ঘর আঁকা রয়েছে একটা। সেই ঘরের ভেতরে কিছুটা দূরত্বে আঁকা রয়েছে দুটো বিন্দু। বিন্দু দুটোর মাঝামাঝি বরাবর একটা ভাঁজের দাগ রয়েছে। তা ছাড়া ঘরের ছবিটার বাইরে ছোট মাপের কয়েকটা জ্যামিতির ছবিও আঁকা রয়েছে।

কেন জানি না, ছবিটা দেখামাত্রই একটা বিদ্যুৎরেখা যেন ঝলসে উঠল মাথার ভেতরে। কাগজটা হাতে নিয়ে বেরিয়ে এলাম ল্যাবের বাইরে। ড্রইংরুমের দরজায় উঁকি মেরে রূপেশ কোঠারিকে ডেকে নিলাম।

কোঠারি বেশ হাসিখুশি মেজাজে চটপটে পায়ে উঠে এলেন আমার কাছে। গালে একবার হাত বুলিয়ে বললেন, "অলওয়েজ অ্যাট ইয়োর সার্ভিস, ইনস্পেক্টর—"

আমি ওকে নিয়ে ল্যাবের প্রায় মাঝখানে এসে দাঁড়ালাম। বললাম, "প্রফেসর কোঠারি, আমি আপনার লুকোচুরি খেলার যন্ত্রটা দেখতে চাই—"

টের পেলাম কথাগুলো বলার সময় আমার গলায় ধাতব ঝঙ্কার বেশ প্রকট হল।

আমার কথায় রূপেশ কোঠারি যেন খানিকটা হকচকিয়ে গেলেন। মুখের হাসিখুশি ভাবের ওপরে চকিতে একটা মলিন ছায়া নেমে এল। একটু সময় নিয়ে নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে বললেন, "লুকোচুরি খেলার যন্ত্র ? তার মানে ?"

এইবার আমি ওঁর বাঁ হাতটা চেপে ধরলাম। ওঁর গায়ের জোরকে সরাসরি উপেক্ষা করে ওঁকে ঠেলে বসিয়ে দিলাম ফোমের গদিওয়ালা একটা সুদৃশ্য টুলের ওপরে। বললাম, "ডক্টর কোঠারি, আপনার নাম দুনিয়াজোড়া। সামনের বছর নোবেল প্রাইজও পেতে পারেন। কিন্তু নিনিকে ফিরিয়ে না দিলে আপনি কি কাউকে মুখ দেখাতে পারবেন?"

কথা শেষ করে আমি ওঁকে হাতের ভাঁজ করা কাগজটা দেখালাম। বললাম, "আপনার মতো একজন প্রতিভাবান বিজ্ঞানীকে কিডন্যাপার বলে ভাবতে আমার কষ্ট হচ্ছে। এই ব্যাপারটা জানাজানি হলে সবাই হয়তো বিক্রম সেনগুপ্তের অভিযোগগুলোই সত্যি বলে ধরে নেবে। ডক্টর সেনগুপ্তের বহু রিসার্চের ফল আপনি স্রেফ হজম করে নিজের নামে ছাপিয়েছেন, জালিয়াতি করে নাম কিনেছেন বিজ্ঞানীদের জগতে।"

রূপেশ কোঠারির মুখ ধীরে-ধীরে পালটে যাচ্ছিল। হাসির রেশটুকুও সেখানে আর নেই। এখন শুধু রাগ থমথম করছে। ডান হাত দিয়ে বাঁ হাতের একটা জায়গা ম্যাসাজ করছিলেন। ওই জায়গাটাই একটু আগে আমি চেপে ধরেছিলাম।

রূপেশ কোঠারি ছিটকে উঠে দাঁড়ালেন টুল ছেড়ে। হাত নেড়ে উত্তেজিতভাবে বলে উঠলেন, "না, ইনস্পেক্টর, রূপেশ কোঠারি আজ পর্যন্ত কোনদিনও কারও রিসার্চে ফাঁকি দিয়ে ভাগ বসায়নি! আপনি জানেন, বিক্রমের জন্য আমি কী না করেছি! আর ও কিনা টিভি নিউজে আমার নামে যা-তা রটিয়ে বেড়াচ্ছে!"

কথা বলতে-বলতে কোঠারি চলে গেলেন একটা দেওয়াল আলমারির কাছে। এক হ্যাঁচকায় তার পাল্লা খুলে একটা মোটা ফাইল বের করে নিয়ে আমার দিকে এগিয়ে দিলেন। বললেন, "আমার বায়োডেটা। মাধ্যমিক থেকে সব রেজাল্টই রয়েছে। কখনও সেকেন্ড হইনি। আর রিসার্চ পেপারের লিস্টটাও দেখুন।"

আমি ফাইলটা নিয়ে খুলে দেখলাম। সত্যিই, ভদ্রলোক অদ্বিতীয়। ওঁর সব গবেষণাপত্রই ছাপা হয়েছে পৃথিবীর সবচেয়ে নামী জার্নালগুলোতে।

হাঁফাতে-হাঁফাতে কোঠারি বললেন, "বিক্রমের জন্য আমি অনেক করেছি। কিন্তু হিংসের ওর এখন মাথা খারাপ হয়ে গেছে। তাই আমার নামে যাচ্ছেতাইভাবে কাদা ছোটাচ্ছে—"

আমি ফাইলটা রেখে দিলাম টুলের ওপরে। বললাম, "আর তাইতেই আপনার মতো লোকেরও মাথাখারাপ হয়ে গেল?"

রূপেশ কোঠারি ফাইলটার ওপরেই ধপ করে বসে পড়লেন। মাথা ঝুঁকিয়ে দু ভুরুর মাঝের অংশটা চেপে ধরলেন বাঁ হাতে। মাথা নাড়লেন বারকয়েক। একটা চাপা শব্দও বেরিয়ে এল মুখ দিয়ে।

যখন মুখ তুললেন, তখন একেবারে ভাঙাচোরা মানুষ। উঠে দাঁড়িয়ে এগিয়ে গেলেন 'স্পেস-

টাইম কার্ভেচা'র যন্ত্রটির দিকে। ভাঙা গলায় বললেন, "এটাই সেই লুকোচুরি খেলার যন্ত্র। নিনি এই ঘরেই আছে, অথচ আবার নেই। এই ঘরের স্পেসে একটা ভাঁজ তৈরি করে ওকে আমি লুকিয়ে ফেলেছি। রাগের মাথায় হঠাৎ যে কী হয়ে গেল···"

কথা বলতে-বলতে যন্ত্র চালু করে দিলেন তিনি। যন্ত্রের কয়েকটা বাতি জ্বলে উঠল। অসংখ্য ভিজিটাল মিটারে রিডিং পালটাতে লাগল খুব তাড়াতাড়ি। আমার শরীরের কয়েকটা সেন্সর সার্কিট হঠাৎই যেন একটা ঝটকা খেল। আর তারপরই···

ল্যাবরেটরির মেঝেতে আবির্ভূত হল নিনি। পরনে কচি-কলাপাতা রঙের সুন্দর কুচি-দেওয়া ফ্রক, তাতে সোনালি জরির কাজ। মেয়েটা ঘুমিয়ে আছে অঘোরে।

আমি আচমকাই ওর নাম ধরে ডেকে উঠলাম, "নিনি!"

হঠাৎই মনে পড়ল, আমার মেয়ের নাম ছিল টুসি। নিনির মতোই মিষ্টি নাম। মিষ্টি মেয়ে। নামটা আলতো করে উচ্চারণ করলাম, যাতে রেকর্ড হয়ে যায়। এটা শুনলে অভিজিৎ মজুমদার খুশি হবেন।

বোধ হয় আমার ডাক শুনতে পেয়েছিলেন বিক্রম সেনগুপ্ত। তিনি প্রায় ছুটেই ঢুকে পড়লেন ঘরের মধ্যে। নিনিকে দেখে পাগলের মতো মেয়ের নাম ধরে ডাকতে ডাকতে ছুটে গিয়ে ওকে কোলে তুলে নিলেন। তারপর ঘুমন্ত মেয়েকে আদর করতে লাগলেন। মনে হচ্ছিল, চার ঘণ্টা নয়, চার যুগ পরে বিক্রম সেনগুপ্ত মেয়েকে ফিরে পেয়েছেন। ওঁদের দেখে আমার খুব ভাল লাগছিল। আমার চোখে হয়তো জল আসত, কিন্তু এল না। কারণ আমার শরীরে ল্যাক্রিম্যাল গ্ল্যান্ডগুলো বসানো হয়নি। অভিজিৎ মজুমদার এখনও বসাতে দেননি। ওগুলো না থাকলে চোখের জল তৈরি হয় না।

নিনির ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। ওর চোখ ফোলা। হয়তো কেঁদে-কেঁদে ঘুমিয়ে পড়েছিল। জেগে উঠেই ও "বাপি" বলে ডেকে উঠল। জড়িয়ে ধরল বাবাকে।

ডক্টর সেনগুপ্তের পেছন-পেছন ঘরে ঢুকেছিল সন্দীপ বর্মন। ও অবস্থা দেখে কেমন হতভম্ব হয়ে গেল। আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, ইনস্পেক্টর সরকার, কী ব্যাপার?"

আমি বললাম, "পরে বলছি···"

রূপেশ কোঠারি ইতিমধ্যে বন্ধুর কাছে চলে এসেছেন। নিনির মাথায় আদর করে চুমু খেলেন একটা।

বিক্রম সেনগুপ্ত মেয়েকে কোল থেকে নামাতেই কোঠারি "বিক্রম!" বলে বন্ধুকে একেবারে বুকে ঝাপটে ধরলেন। বললেন, "আমার মাথার মধ্যে একটা অমানুষ ঢুকে পড়েছিল। আমাকে ক্ষমা করে দাও···"

কোঠারির কণ্ঠস্বরে বেদনা ছিল। চোখ চিকচিক করছে। ওঁর অনুশোচনা মিথ্যে নয়।

ডক্টর সেনগুপ্ত কোঠারির ডাকে সাড়া দিয়ে বললেন, "নিনিকে ফিরে পেয়েছি, তাই যথেষ্ট। তোমার ওপরে আর কোনও রাগ নেই। শুধু তুমি নও, ভুল আমিও করেছি। তোমার মতো বন্ধুকে হিংসে করাটা আমার অন্যায় হয়েছে। গবেষণার ব্যাপারে তোমার সঙ্গে আমার কোনও তুলনাই চলে না।"

এবারে আমার আর বর্মনের বিদায়ের পালা।

বিক্রম সেনগুপ্ত তাঁর সমস্ত অভিযোগ ফিরিয়ে নিলেন।

নিনি বলল, "বাপি, বাড়ি চলো, ভীষণ ঘুম পাচ্ছে।"

সন্দীপ বর্মন আমার কানের কাছে মুখ এনে বলল, "আমারও, ইনস্পেক্টর সরকার। চলুন এবারে যাওয়া যাক—"

আমরা বেরিয়ে এলাম রূপেশ কোঠারির বাড়ি ছেড়ে। গাড়িতে উঠে গাড়ি স্টার্ট দিলাম। টেলিফোন করে হেডকোয়ার্টারে জানিয়ে দিলাম, কাজ শেষ। নিনিকে পাওয়া গেছে, আর ডক্টর সেনগুপ্ত সব অভিযোগ ফিরিয়ে নিয়েছেন।

সন্দীপ বর্মন একটা সিগারেট ধরাল। বলল, "বসকে বলবেন না।" তারপর ধোঁয়া ছাড়তে গিয়ে হাই তুলল একটা।

কিছুক্ষণ চুপচাপ কেটে গেল আমাদের। বর্মন বোধ হয় বুঝল, আমি নিজে থেকে মুখ খুলব না। তখন বাঁকা সুরে জিজ্ঞেস করল, "নিনিকে কী করে পাওয়া গেল, সেটা জানতে পারি কি?"

আমার হাসি পেল। কয়েক ঘণ্টা আগে রূপেশ কোঠারির বাড়ি যাওয়ার পথে বর্মন আমাকে উৎকণ্ঠার মধ্যে রাখতে চেয়েছিল। এখন দান উলটে গেছে।

কোঠারির ল্যাব থেকে পাওয়া চৌকোনা ঘর-আঁকা কাগজটা আমার কাছেই ছিল। গাড়ির নিয়ন্ত্রণ অটোপাইলটের ওপরে ছেড়ে দিয়ে কাগজটা সমান করে পেতে দিলাম কোলের ওপরে। তারপর ড্যাশবোর্ডের খুদে ল্যাম্প জেবলে দিয়ে বর্মনকে বললাম, "এটা ভাল করে দেখুন—"

সন্দীপ বর্মন ছবিটার ওপরে ঝুঁকে পড়ল।

আমি বলতে শুরু করলাম, "এই চৌকোনা ঘরটা একটা টু ডাইমেনশনাল ওয়ার্ল্ড—দ্বিমাত্রিক জগৎ। তার মধ্যে এই ফুটকি দুটো হচ্ছে, ধরে নিন, দ্বিমাত্রিক জগতের দুটি প্রাণী। এরা কাগজের গায়ে লেপটে ঘুরে বেড়ায় এই চৌকানা ঘরের চৌহদ্দির মধ্যে। চৌহদ্দির লাইনগুলোই হচ্ছে ওদের কাছে দেওয়াল। কিন্তু আপনি বা আমি হচ্ছি ত্রিমাত্রিক জগতের জীব। আমরা যে-কেউ ইচ্ছেমতো একটা দ্বিমাত্রিক প্রাণীকে তুলে নিয়ে আসতে পারি আমাদের জগতে। তার জন্য ওদের দেওয়াল টপকানোর দরকার নেই—স্রেফ ওপর থেকে হাত বাড়িয়ে তুলে নিলেই হল। সুতরাং দ্বিমাত্রিক জগতের প্রাণীকে কোনও ঘর থেকে দেওয়াল না ভেঙে কিডন্যাপ করতে গেলে ত্রিমাত্রিক জগতের তৃতীয় মাত্রা

বা থার্ড ডাইমেনশনের দিক থেকে এগোতে হবে। এ ছাড়া আর-একভাবেও ব্যাপারটা হতে পারে

বর্মন সিগারেটে টান দিচ্ছিল ঘন-ঘন। কাগজটা একমনে দেখছিল। আমার কথার খেই ধরে বলে উঠল, "কাগজটা ভাঁজ করে ?"

আমি হাসতে চেষ্টা করলাম। মুখের পেশীতে টান লাগল। বললাম, "ঠিক তাই। এই দুটো ফুটকির মাঝ-বরাবর কাগজটা ভাঁজ করে দিলে একটা ফুটকি আর-একটা ফুটকিকে সরাসরি দেখতে পাবে না। কিন্তু এই ভাঁজটা করতে হবে ত্রিমাত্রিক জগতের মধ্য দিয়ে। কারণ, তখন কাগজটা আর নিছক দ্বিমাত্রিক সমতল থাকছে না—ভাঁজ হয়ে গেছে। রূপেশ কোঠারি ঠিক একই ভাবে ওঁর ল্যাবের স্পেসে একটা ভাঁজ তৈরি করে ফেলেছিল—ওই 'স্পেস-টাইম কার্ভেচার' মেশিন দিয়ে। ন্যাচারালি, ভাঁজটা করতে হচ্ছে ফোর্থ ডাইমেনশনাল স্পেসের মধ্যে দিয়ে। আর স্পেস-টাইম নিয়ে ওঁর-গবেষণা তো বলতে গেলে ওয়ার্ল্ড ফেমাস—"

নির্জন অন্ধকার পথ ধরে গাড়ি ছুটছিল। বর্মনের সিগারেট শেষ হয়ে গিয়েছিল। সেটা জানলা দিয়ে বাইরে ফেলে দিয়ে ও বলল, "সরকার, নিনি মেয়েটা বেশ লাকি। কিছুক্ষণের জন্য হলেও, ওই যে ফোর্থ ডাইমেনশমাল স্পেস না কী বললেন, ওখান থেকে দিব্যি বেড়িয়ে এল—"

আমি নিনির কথা ভাবলাম! তারপরই মনে পড়ল টুসির কথা। টুসি এখন কোথায়! ওর মিষ্টি মুখটা যে এখনও আমার মাঝে-মাঝে মনে পড়ে।

———



সেদিন অবেলায়

অমিতাভ মুখোপাধ্যায়



বলটা গড়াতে গড়াতে দুটো তক্তার মাঝের ফাঁক দিয়ে টুপ করে ওপাশে চলে গেল।

অর্ক আসলে এ-সময় এখানে আসে না। আসে বিকেলবেলা। খেলাটা তখন জমে ওঠে। কিন্তু আজকের দিনটা অন্যরকম। শরীরটা সকালে ভাল ছিল না বলে স্কুলে-না-যাওয়াটা মা মঞ্জুর করেছেন। বাবা অফিসে। মা গেছেন বুলুমাসির বাড়ি। ফিরতে বিকেল কিংবা সন্ধ্যে। মেঘের আড়ালে সূর্য মুখ লুকিয়েছে। ঘরে বসে থাকতে ভাল লাগছিল না।

"গেটের বাইরে যেয়ো না, যেন," সবিতাপিসি বলছিলেন। অর্ক বলটা হাতে নিয়ে নেমে এসেছিল। ছ'তলা ফ্ল্যাটবাড়িটার পেছন দিকে একচিলতে ফাঁকা জায়গা। লম্বা পাঁচিল ঘেরা। এখানে অর্ক এবং ওর বন্ধুরা ছাড়া আর কেউ বিশেষ আসে না। জায়গাটা অর্কের ভারী ভাল লাগে। বলটা আকাশের দিকে সোজা ছুঁড়ে দিয়ে আবার লুফে নিচ্ছিল সে। এ বারেই ফসকে গেল।

উঁচু পাঁচিলটার ওপাশটা দেখা যায় না এমনিতে। কয়েকটা ইঁট সরে গিয়ে জমি ঘেঁসে ছোট্ট ফোকর, সেখান দিয়ে অর্ক দেখেছে ওপাশে ডাঁই করে রাখা লোহা-লক্কড়। 'কমলা ইঞ্জিনিয়ারিং'-এর বন্ধ কারখানার পেছন দিক। ইটের ফোকরটা অবশ্য এখন নেই, পাঁচিলের ওদিক থেকে খাড়া দুটো তক্তা কারা আটকে দিয়েছে ক'দিন আগে।

কয়েক পা দৌড়ে এসে থমকে দাঁড়িয়ে গেল অর্ক। কী করে আনা যাবে বলটা? তক্তা দুটো না থাকলে কোনও অসুবিধেই ছিল না। কিন্তু এখন?

শেষ দুপুরের আকাশে মেঘ জমতে জমতে এখন আকাশের রং ঘোলা হয়ে গিয়েছে। ফ্ল্যাটবাড়ির ছাদের কার্ণিশে বসে দুটো কাক কা-কা ডেকে চলেছে। ধারেকাছে আর কেউ নেই।

ঘাসজমির ওপর হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল অর্ক। নিচু হয়ে তক্তার ফাঁকে হাত গলিয়ে দিল।

না, বলটা নেই। আরও খানিকটা। হাতের আঙুলগুলো এপাশ-ওপাশ করেও হাত ঠেকল না কিছুতে। ওপাশের ঢালু জমিতে বলটা নিশ্চয় অনেকটা দূরে গড়িয়ে গেছে। নাগালের বাইরে। হাতটা টেনে বের করে নিয়ে দুটো তক্তার মাঝামাঝি সরু ফাঁকটায় চোখ রাখল অর্ক। বলটাকে যদি দেখা যায়।

চোখের দৃষ্টি স্থির হতেই অর্কর সারা শরীর নিথর হয়ে গেল। যেন কোনও সাঁড়া নেই। ভাঙা ইটের ওপর হাতটাও বুঝি আটকে গেছে। নড়তে পারছে না অর্ক। সরে আসতে পারছে না।

কতক্ষণ এভাবে ছিল সে নিজেই জানে না। আচমকা একটা অচেনা চিৎকার যখন নিজেরই গলা ঠেলে বেরিয়ে এল, সংবিৎ ফিরল তার। ছিলে-ছেঁড়া ধনুকের মতো ছিটকে উঠে এল অর্ক, তারপরই দৌড়। ফাঁকা জায়গাটা পেরিয়ে ফ্ল্যাটবাড়ি আর পাঁচিলের মাঝের সরু প্যাসেজ দিয়ে সামনের দিকটায় এসে পড়ল। পাঁচিল ঘুরে এসে লোহার বড় গেট। তার ওপাশে রাস্তা। গেট খোলা নেই। এক মুহূর্ত থামল অর্ক। তাকাল গেটের দিকে। সে মুহূর্তেই দ্বিতীয় চিৎকারটা বেরিয়ে এল। অর্কর গলা দিয়ে! লোকটাকে দেখল অর্ক! গেটের সামনে।

অর্ক দেরি করেনি। ফ্ল্যাটবাড়ির সিঁড়ি পেরিয়ে নিজেদের ফ্ল্যাটের দরজায় ধাক্কা দিতেই দরজা খুলে দিলেন সবিতাপিসি।

"কী রে, কী হয়েছে? চলে এলি যে। হাঁপাচ্ছিস কেন?"

সবিতাপিসির কানে কথা ঢুকছে না। অর্ক শোবার ঘরের জানালায়। লোকটা দাঁড়িয়ে আছে। তাকিয়ে আছে ওপর দিকেই! জানলা বন্ধ করে পিঠ চেপে দাঁড়াল অর্ক।"

"কী হল তোর? কথা বলছিস না কেন?"

"একটু জল দাও।"

চোখটা বুজে ফেলল অর্ক। একটা গাড়ি স্টার্ট দেওয়ার শব্দ কানে এল।

"এই নে জল।"

জলটা ঢকঢক করে খেয়ে ফেলল অর্ক। পেটটা কেমন যেন গুলিয়ে উঠল! নিজেকে সামলাবার আপ্রাণ চেষ্টা করল সে।

"হ্যাঁ রে, শরীর খারাপ করছে আবার?"

মাথা নাড়ল অর্ক। "না।"

"কী যে হল, কিছুই বুঝতে পারছি না বাপু।"

"কিছু হয়নি। বলটা হারিয়ে গেছে।"

সবিতাপিসিকে এড়িয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল অর্ক। চোখের সামনে ভাসছে একটু আগে-দেখা দৃশ্যটা। লোকটা নিশ্চয় পাঁচিলের ওপাশ দিয়ে ছুটতে-ছুটতে এসেছিল। কী অদ্ভুত দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়েছিল ওর দিকে। অর্ক যদি চিৎকার না করত।

অর্ক'র চোখের সামনে সব কেমন ঝাপসা হয়ে গেল। বাইরে বৃষ্টি নামল ঝমঝম করে।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল দিগন্ত। বিকেল তিনটে। কাল বিকেল থেকে টানা বৃষ্টি হয়ে ঘণ্টাখানেক আগে থেমেছে। আকাশে এখনও মেঘ। তার ওপর একফালি পশ্চিমি রোদ খেলা করছে। 'সুবর্ণ আবাসন'-এর গেটের সামনে এক মুহূর্ত দাঁড়াল দিগন্ত। কাছাকাছি কেউ নেই। আবাসনের সীমানার পাঁচিলের পাশে সরু পথটায় পা রাখল দিগন্ত। পাঁচিল ঘেঁষে লম্বাটুকু পেরিয়ে পেছনের কারখানার চত্বর। বড়-বড় লোহার বিম আর টুকরো লোহালক্কড়ে জায়গাটা ভরে আছে। তার মাঝেমাঝে আগাছা আর ঘাস জন্মে গেছে। পাঁচ-ছ'বছর ধরে জায়গাটা এমনই পড়ে আছে। ওদিকে বড় রাস্তা থেকে এদিকে আসতে লোকে শর্টকাট হিসেবে এ জায়গাটুকু পেরিয়ে যায় এমনিতে জায়গাটা সুনসান। চারদিকটা খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখল দিগন্ত। কোনও অসঙ্গতি চোখ পড়ছে না। আবাসনের লম্বা পাঁচিল পাক খেয়ে আড়াআড়ি চলে গেছে। তার গা ঘেঁষে দুটো তক্তা দাঁড় করানো। জায়গাটাতে লম্বা-লম্বা ঘাস বর্ষার জল পেয়ে আরও বেড়ে উঠেছে। হাতিতনেক দূরে লোহার বড় একটা চাকতি। মাটির সঙ্গে গাঁথা। চিন্তিত মুখে দিগন্ত বসে পড়ল চাকতিটার কাছে। এক সময় এখানে আণ্ডারগ্রাউণ্ড রেজারভায়ার ছিল। কারখানা বন্ধ হওয়ার পর থেকে পরিত্যক্ত পড়ে আছে। বিপজ্জনক জায়গাটা, জানা না থাকলে। ঘাসের মধ্যে কী যেন একটা চকচক করছে। হাতে তুলে দিগন্ত দেখল একটা দামী লাইটার। একটা কোনও নামের আদ্যক্ষর খোদাই করা আছে। লাইটারটা পকেটে ঢোকাল দিগন্ত। তারপর লোহার ঢাকনির চারদিক খুব মনোযোগ দিয়ে দেখল। আস্তে করে লোহার চাকতিটার একদিক ধরে চাপ দিতেই খুব সহজেই ঢাকনাটা সরে এল। ভিতরটা অন্ধকার। তলায় বোধ হয় জল জমে আছে। উৎকট ভ্যাপসা পচা গন্ধ গা গুলিয়ে উঠল দিগন্তর। তাড়াতাড়ি ঢাকনাটা টেনে দিল। উঠে দাঁড়াতে খাড়া তক্তা দুটোর তলায় সবুজ আগাছার মধ্যে লাল একটা বল চোখে পড়ল। বলটা হাতে নিয়ে অন্যমনস্ক দিগন্ত ফিরে এল সুবর্ণ আবাসনের গেটের সামনে।

আস্তে-আস্তে বিছানা থেকে নামল অর্ক। কাল নাকি ওর ভীষণ জ্বর এসেছিল। ভুল বকছিল। সবিতাপিসি বলেছেন। ডাক্তারকাকুকে নিয়ে এসেছিলেন বাবা। আজ এখন জ্বর নেই। শরীরটাও ঝরঝরে। আস্তে-আস্তে রাস্তার দিকের জানালাটার সামনে এসে দাঁড়াল অর্ক। অনেক বৃষ্টির পর মিষ্টি রোদে চারিদিকটা ভারী ভাল লাগছে। নীচে গেটের দিকে তাকাল অর্ক। আবারও ভীষণ ভয় পেয়ে গেল। সেই লোকটা। হাতের ইশারায় ওকে ডাকছে। দড়াম করে জানালাটা বন্ধ করে খাটের কাছে ছুটে আসতে গিয়েই মাথাটা ঘুরে গেল। কোনওক্রমে বিছানায় উঠতে পারল অর্ক।

"মা, সবিতাপিসি।"

"কী হয়েছে অর্ক?"

"দরজাটা বন্ধ আছে?"

"হ্যাঁ। কেন?"

"সেই লোকটা আবার এসেছে।"

"কোন লোকটা অর্ক?"

অর্ক কোনও উত্তর দিল না। বালিসে মুখ গুঁজে নিজেকে সামলাবার চেষ্টা করল।

"সুবর্ণ আবাসন? মানে পূর্ণ দত্ত রোডের কাছে।"

"হ্যাঁ। আপনি চেনেন?"

"ওখানে আমার এক রিলেটিভের বাড়ি ছিল। কমলা ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের কাছে। আগে যেতাম কী হয়েছে ছেলের?"

অসীমবাবু গত চারদিনের কথা বলে গেলেন। টেবিলের ওপর পেপারওয়েটটা নাড়াচাড়া করতে করতে শুনলেন ডঃ মৃগাঙ্ক সেন।

"বেশ, আপনি একটু বাইরে ওয়েট করুন। আমি দেখছি।"

"অর্ক, ওই নীল আলোটার দিকে তাকিয়ে থাকো। তোমার ঘুম এসেছে। হাত ভারী হয়ে গেছে। শরীর ভারী হয়ে গেছে। তোমার পা নড়ছে না। চোখের পাতা ভারী হয়ে দু'চোখ ভরে ঘুম নেমে আসছে—শান্তির ঘুম। তোমার ভীষণ ভাল লাগছে। কোনও চিন্তা নেই। এই সুন্দর বিছানায় নরম আলোয় তুমি শুয়ে আছ।

"অর্ক। শুনতে পাচ্ছ? আমি তোমায় ডাকছি। শুনতে পাচ্ছ? অর্ক..."

আচ্ছন্ন অর্কর মৃদু কণ্ঠে জবাব দিল, "হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি।"

"কী হয়েছিল সেদিন? যেদিন একা-একা খেলতে গিয়েছিলে?"

অর্ক বলতে লাগল।

অর্ককে একা বসতে বলে অসীমবাবুকে ডাকলেন ডঃ সেন।

"আচ্ছা অসীমবাবু, আপনাদের এলাকায় গত কয়েকদিনের মধ্যে কোনও অন্য ধরনের ঘটনা বা কোনও অ্যাকসিডেন্ট..."

"হ্যাঁ। একটা ব্যাপার হয়েছে। কবে হয়েছে জানি না। সুবর্ণ আবাসনের পেছন দিকের মানে কমলা এঞ্জিনিয়ারিংয়ের পোড়ো জায়গাটা থেকে পুলিশ আজ সকালে একটা লাশ পেয়েছে। ওখানে একটা আন্ডারগ্রাউন্ড রেজারভোয়ারের মধ্যে কেউ দেহটা ফেলে রেখে গিয়েছিল। পুলিশ আশেপাশে কিছু জিজ্ঞাসাবাদও করেছে।"

"হুঁ। খুব চিন্তিত দেখাল ডঃ সেনকে।

"অর্ক'র কী হয়েছে, ডাক্তারবাবু ?"

"ও একটা স্ট্রেঞ্জ ডেসক্রিপশন দিচ্ছে। আমার মনে হয় ও কিছু একটা দেখেছে। বিশেষ করে একটি লোকের নিখুঁত বর্ণনা দিয়েছে অর্ক। হতে পারে ও মার্ডারটা দেখেছে। আর সেটাই ওর ভয়ের কারণ।"

"কিন্তু সেটা কী করে সম্ভব ?

"তা তো আমি বলতে পারব না। আচ্ছা, এই লাশটা যে পাওয়া গেছে অর্ক জানে ?"

"না।"

"সেটা ওকে না জানানোই ভাল। ব্যাপারটা একটা মিথ্যে ইলিউশন বলে ওর মন থেকে মুছে ফেলতে হবে। আমি চেষ্টা করব। ডঃ মিত্র যে ওষুধ দিয়েছেন, তাই চলবে। সামনের সপ্তাহে ওকে আবার নিয়ে আসবেন।"

"হ্যালো, রঞ্জিত, আমি ডাঃ মৃগাঙ্ক সেন বলছি।"

"ও মৃগাঙ্কদা , বলুন, কী ব্যাপার ?"

"কমলা এঞ্জিনিয়ারিংয়ের বাউন্ডারির মধ্যে একটা লাশ পাওয়া গেছে নাকি ?"

"হ্যাঁ। আজ সকালে। তার সঙ্গে আপনার···"

"সম্পর্ক কিছু আছে। ব্যাপারটা একটু বলবে ?"

"মামুলি ব্যাপার। ক'দিন আগে মার্ডার হয়েছে। রেজারভোয়ারের মধ্যে কেউ বডিটা ফেলে গিয়েছিল। লাশটা আইডেণ্টিফাই করার মতো অবস্থায় নেই। জমা জলে পচে গিয়ে বিচ্ছিরি অবস্থা। মনে হয় মাথার পিছন দিকে আঘাত করা হয়েছিল। পোস্টমর্টেম করার জন্যে পাঠিয়েছি। ট্রেশ করার চেষ্টা করছি। রুটিন মাফিক কাজ।"

"খবরটা পেলে কী করে ?"

"সুবর্ণ আবাসনের পিছন দিকের সি ব্লকের তিনতলায় এক ভদ্রলোক থাকেন। তিনি গতকাল ফোন করেছিলেন। দিন চারেক আগে দুপুরের দিকে দু'জন লোককে তিনি নাকি সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করতে দেখেছিলেন। গতকাল ওই জায়গা থেকে নাকি প্রচণ্ড দুর্গন্ধ পেয়েছেন ভদ্রলোক।"

"আর কিছু ?"

"না, না, এই ভদ্রলোক এটুকুই ইনফর্ম করেছেন। ওঁর পুরো স্টেটমেণ্ট নিয়েছি।···না না, ওঁকে সন্দেহ করার কিছু নেই। আমরা জানি। নির্বিরোধ ভালোমানুষ। একা থাকেন। কী ব্যাপার বলুন তো ? আপনার হঠাৎ···"

"আজ একটা অদ্ভুত কেস পেয়েছি। ব্যাপারটা যদি মার্ডার হয়, তোমাকে হয়তো খানিকটা সাহায্য করতে পারি। মার্ডারারকে শনাক্ত করার মতো খানিকটা সূত্র বোধহয় আছে।"

"ডিটেলসটা বলুন।"

"ডিটেলসটা এখন বলা যাবে না। শুধু খুনির একটা ডেসক্রিপশন দিতে পারি। ঝাঁকড়া চুল, প্রায় ছ'ফুটের মতো হাইট, মেদবিহীন চেহারা, কালো ট্রাউজার আর শাদা শার্ট পরনে, ইয়াং···।"

"বর্ণনাটা হুবহু আপনার চেহারার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে না। চারদিন আগে আপনি সারাদিন কী করেছেন সেটাই তাহলে আগে খোঁজ নিতে হবে!"

"ঠাট্টা নয় রঞ্জিত। পুরো ব্যাপারটা খুব ইন্টারেস্টিং। ওই ভদ্রলোকের সঙ্গে একবার কথা বলতে পারলে, আমার পেশেন্টের স্টেটমেন্টের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা যেত।"

"স্বচ্ছন্দে। ভদ্রলোকের নাম অবনী সান্যাল। আপনি যদি চান আমি না হয়···"

"আজ তো হবে না ভাই। যদি পারি, কাল তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করব।"

দরজায় বেশ কিছুক্ষণ নক করার পর সাড়া পাওয়া গেল। দরজাটা খুলে মুখ বাড়ালেন ভদ্রলোক। "আপনাকে তো ঠিক···"

"আমাকে আপনি চিনবেন না। একটা বিশেষ ব্যাপারে একটু কথা বলতে এসেছি। একটু বসা যাবে···?"

"কী ব্যাপার?"

"এখানে যে লাশটা পাওয়া গেছে···"

"আপনি পুলিশের লোক?"

"না। এই যে আমার কার্ড।"

"ও। কিন্তু ও ব্যাপারে তো পুলিশকে আমি যা বলবার বলেছি।"

"তবু তো।"

"ভেতরে আসুন।"

সামনের বসবার জায়গাটাতে একটা কম পাওয়ারের আলো জ্বলছে। আগন্তুক একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলেন।

"আপনি একাই থাকেন?"

"কাজের কথা বলুন।"

"আপনি পুলিশের কাছে মিথ্যে কথা বলেছেন।"

"না। আমি মিথ্যে বলি না।"

"তা হলে আপনি পুরো কথা বলেননি।"

"সেটা ঠিক। যেটুকু দরকার বলেছি।"

"আপনি সেদিন কী দেখেছিলেন?"

"তার সঙ্গে আপনার সম্পর্ক ?"

"সম্পর্ক যাই হোক। আপনি সত্যি বলুন।"

"পুরো ঘটনাটাই আমি দেখেছি। পুলিশকে বলিনি।"

"কিন্তু চারদিন পরে খবর দিলেন কেন ? ঘটনাটার সময় কোথায় ছিলেন আপনি ?"

"অন্য কেউ খবর দিলে ব্যাপারটাতে নিজেকে জড়াতাম না। কিন্তু চোখের সামনে দেখলাম একজন আর একজনকে মারল, ম্যানহোলের ঢাকনা খুলে লাশটা গায়েব করে দিল, চুপ করে বসে থাকব ?"

"আপনি কোথায় ছিলেন ?"

"এই ফ্ল্যাটের বাথরুমের জানালা থেকে জায়গাটা পরিষ্কার দেখা যায়।"

"লোক দু'জনকে আপনি স্পষ্ট দেখেছিলেন ?"

"হ্যাঁ। দেখলে চিনতে পারব কালপ্রিটটাকে। পুলিশকে অবশ্য একথা বলিনি।"

"প্রয়োজন হলে বলতে রাজি আছেন ?"

"হ্যাঁ।"

"বেশ। তা হলে আমি পরে যোগাযোগ করব। ধন্যবাদ অবনীবাবু। ও হ্যাঁ, আপনার এখানে কি ফোন আছে ?"

"না।"

উঠে পড়লেন আগন্তুক। বাইরে বেরিয়ে এলেন। "সিঁড়িতে আলো থাকে না ?"

"আছে। জ্বলে না সব সময়।"

খটখট শব্দ করে নেমে গেলেন মানুষটি। অবনীবাবু দরজা বন্ধ করে দিলেন।

"হ্যালো, ও সি সায়েব, আছেন নাকি ?"

"বলছি।"

"আমি মৃগাঙ্কদা বলছি।···আজ চেম্বার আওয়ার্সের পর একটু ফাঁকা থাকব। তোমার সেই অবনী সান্যালের কাছে একটু যাওয়া যাবে ?"

"লাভ নেই। ভদ্রলোক কাল রাত্তিরে মারা গেছেন।"

"মানে ?"

"সিম্পল অ্যাকসিডেন্ট। বয়স হয়েছিল। সিঁড়ি থেকে পা পিছলে পড়ে যান। সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু।"

"ব্যাপারটা কেমন হল, রঞ্জিত ?"

"না না, এর মধ্যে কোনও রহস্য নেই। চারতলার এক ভদ্রলোক অবনীবাবুকে সিঁড়ির কোণে

ঘাড় মুখ গুঁজে পড়ে থাকতে দেখেন। ডাক্তার মিত্র এসে দেখেছিলেন। আমিও গিয়েছিলাম। কিন্তু রহস্যজনক কিছুই দেখতে পাইনি। শুধু একটা ইনফরমেশন ছাড়া।"

"কী ইনফরমেশন ?"

"এক ভদ্রলোক রাত্তির আটটা নাগাদ অবনীবাবুর সঙ্গে দেখা করতে আসেন। চলেও যান। গেটের দারোয়ান বলেছে। চেহারার বর্ণনাটা আপনি যেমন বলেছিলেন তার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে।"

"স্ট্রেঞ্জ !"

"আমি নজর রাখবার চেষ্টা করছি। আপনার পেশেণ্টের কী খবর ?"

"ভাল আছে নিশ্চয়। ডেডবডি কার, কোনও হদিস পেলে ?"

"না। তবে পোষ্টমর্টেম রিপোর্ট পেয়েছি। ঘাড়ের কাছে আঘাত করা হয়েছিল। যে করেছে অ্যানাটমি সম্বন্ধে তার জ্ঞান নিখুঁত। পাঁচদিন আগে বিকেলবেলা ধরুন দুটো থেকে চারটের মধ্যে মার্ডার হয়। আর লোকটি মৃত্যুর কিছু আগে কোনও-না-কোন ওষুধ খেয়েইছিল।"

"ইণ্টারেস্টিং। ভাবছি তোমার কাছে একবার যাব। ছেলেটিকেও একবার দেখে আসব। মানে আমরা যে পেশেণ্টের জন্য তোমাকে···"

"জানি। অর্ক রায়। সুবর্ণ আবাসনের এ-ব্লকের দোতলায় থাকে। বাবার নাম অসীম রায়। একটা প্রাইভেট কনসার্নের মার্কেটিং ম্যানেজার।

"কে বলে পুলিশ কোনও কাজের নয় ? ঠিক আছে, কাল যদি···।"

"হ্যাঁ। আসুন না।"

"অর্ক আছে ?"

"হ্যাঁ। কিন্তু···"

"আমার নাম ডাঃ মৃগাঙ্ক সেন।"

"ওঃ। আপনি। আমি তো···"

"কেমন আছে, অর্ক ?"

"ভালই। ভেতরে আসুন। আমি তো ভাবতেই পারছি না।"

ভিতরে নিয়ে এসে বসালেন অর্কর মা। অর্ক এল। ডাঃ সেন আদর করে কাছে টেনে নিলেন।

"কী অর্কবাবু, কী খবর ? লোকটাকে দেখেছ আর ?"

"হ্যাঁ। কালও দেখেছি।"

"ভয় করেনি তো ?"

"না। এখন আর ভয় করছে না।"

"চলো, তোমার বলটা খুঁজে আনি। যাও, জামা পালটে এসো।"

অর্ক ভেতরে চলে গেল। সবিতা চা নিয়ে এল।

"আমি একবার অর্ককে নিয়ে ফ্ল্যাটবাড়ির পেছন দিকটায় যাব। আপনার আপত্তি নেই তো? আসলে ওর ভয়ের উৎসটাকে একেবারে নির্মূল করে দিতে হলে···"

"সে আর কী আছে! আপনি যা ভাল বুঝবেন। ভাগ্যিস ডাঃ মিত্র আপনার কাছে ছেলেকে নিয়ে যেতে বলেছিলেন, নইলে তো···"

আজও শেষ দুপুর। কিন্তু আকাশে মেঘ নেই। বর্ষার উজ্জ্বল রোদ্দুরে সবকিছু ঝকঝক করছে। অর্ক ডাক্তারকাকুকে দেখাল কোন জায়গায় ওর বলটা পড়ে গিয়েছিল। সেখান থেকে ঘুরে কারখানা চত্বরে অর্ককে নিয়ে এলেন ডাঃ সেন।

"একটা লোক আর একজনকে মারে কেন, ডাক্তারকাকু?" হঠাৎ প্রশ্ন করল অর্ক। মৃগাঙ্ক সেন তাকালেন অর্কের দিকে। তারপর হা-হা করে হেসে উঠলেন।

"মারে। মেরে ফেলে। আর একজনের বেঁচে থাকাটা সহ্য হয় না, তাই।"

"অর্কবাকু এইখানটাতেই তো তুমি দেখেছিলে···"

মৃগাঙ্ক সেন দাঁড়িয়ে আছেন লোহার চাকতিটার ঠিক সামনে। অর্ক হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, "ডাক্তারকাকু, ওই যে, ওই যে সেই লোকটা···"

"কোথায়? কোথায় সে—?"

কারখানার পোড়ো শেডটার দিকে হাত তুলে দেখাল অর্ক। মৃগাঙ্ক সেন হাঁফাচ্ছেন, চোখমুখ পালটে যাচ্ছে। একটানে ফুলহাতা জামার হাতের বোতাম দুটো খুলে ফেললেন মৃগাঙ্ক সেন। দু' হাতে দুটো হাতা গুটিয়ে নিলেন।

"কেউ কোথাও নেই অর্ক। শুধু আমি আছি। সেদিন···"

"তুমি। তুমি। তুমিই লোকটাকে মেরে ফেলেছিলে ডাক্তারকাকু উ-উ···"

চেঁচিয়ে উঠল অর্ক। মৃগাঙ্ক সেন সোজা তাকিয়ে আছেন অর্কের চোখের দিকে, মুখের পেশি শক্ত। চোয়াল ঝুলে এসেছে।

"তক্তার ফাঁক দিয়ে আমি তোমার হাত দেখেছি—ওই যে কালো দাগটা···"

"সে হাতগুলো কী করছিল, অর্ক, কী করছিল? সে হাত দুটো আজও যদি···"

অর্ক আর চেঁচাতে পারছে না। নড়তে পারছে না। চোখ সরাতে পারছে না মৃগাঙ্ক মেনের চোখ থেকে। মৃগাঙ্ক সেন দু'হাত বাগিয়ে এগিয়ে আসছেন!

হঠাৎ কে যেন লাফ দিয়ে পড়ল দু'জনের মাঝখানে আর নিমেষে অর্ককে তুলে নিয়ে ছুটে গেল দূরে। ঠিক সে সময়েই পিঠের ওপর একটা শীতল স্পর্শ অনুভব করলেন ডাঃ সেন। "সময় বসুর হত্যাকারী হিসেবে আপনাকে গ্রেফতার করছি ডাঃ সেন।"

"না", চিৎকার করে উঠলেন মৃগাঙ্ক সেন, "না, কোনও প্রমাণ নেই। আমি সমরকে মারিনি।"

"শুধু সমরকে নয়, অবনী স্যান্যালকেও আপনিই খুন করেছেন ঠাণ্ডা মাথায়। এইমাত্র আপনি যা করতে যাচ্ছিলেন, তার চেয়ে বড় প্রমাণ আর কী আছে? অর্ক আপনাকে ঠিক ঠিক আইডেণ্টিফাই করেছে।" ইস্পাতের মতো শক্ত-গলায় বললেন ইনস্পেক্টর রঞ্জিত সাহা।

একটু দূরে দিগন্তকে আঁকড়ে ধরে আছে অর্ক।

চায়ের কাপে লম্বা চুমুক দিয়ে বললেন রঞ্জিত সাহা, "পুরো ব্যাপারটায় যা কিছু কৃতিত্ব সেটা পাওনা দিগন্তর। ওর জন্যই এটা সম্ভব হয়েছে।"

অসীমবাবুদের ফ্ল্যাটে বসেছিলেন ওঁরা। অসীমবাবু চায়ের নেমতন্ন করেছিলেন।

"রঞ্জিতদা না থাকলে আমি কিছুই করতে পারতাম না।"

"কিন্তু মৃগাঙ্ক সেনের মতো একজন প্রথম সারির সাইকিয়াট্রিস্ট, তাঁকে সন্দেহ হল কী করে তোমার?" অসীমবাবু জানতে চাইলেন।

"অনুমান, প্রথম থেকেই", বলল দিগন্ত, কিন্তু কোনও প্রমাণ ছিল না।"

ঝাঁকড়া চুল, মেদহীন দিঘল চেহারা, বছর বাইশের শ্যামলা ছেলেটির দিকে তাকাল সকলে। এতক্ষণে একটু সপ্রতিভ হল দিগন্ত।

"আসলে পুরো ঘটনায় দুটি সমাপতন কাজ করেছে। প্রথম, ঘটনার দিন ঠিক ওই সময়েই এক বন্ধুর জন্যে আমি অপেক্ষা করছিলাম আপনাদের এই কম্পাউণ্ডের গেটের বাইরে। ডাঃ সেন আর সমরবাবুকে গাড়ি থেকে নেমে একসঙ্গে হেঁটে যেতে দেখেছিলাম। দু'জনের কাউকেই আমি চিনতাম না। একজন কেমন যেন ঘোরের মধ্যে হাঁটছেন, সেটা আমার নজর এড়ায়নি। আর বয়েস হওয়া সত্ত্বেও চেহারা, ডাঃ সেনের ওপরও চোখ পড়েছিল। এঁর পরনে ছিল কালো প্যাণ্ট আর শার্ট, আমারই মতো। খটকা লাগে অর্কর আচরণে। একটু পরেই ডাঃ সেন ফিরে এলেন একা। পুরো ব্যাপারটাতে কোথাও একটা অসঙ্গতি ছিল যা আমাকে ভাবিয়েছিল।

"পরের দিনই ঘটনাটা আমার কাছে পরিষ্কার হয়েছিল। স্পট থেকে পাওয়া ডাঃ সেনের লাইটার আর ওঁর গাড়ির নম্বর আমাকে সাহায্য করেছিল ডাঃ সেনের পরিচয় পেতে। পুরো দুটো দিন ধরে আমি ডাঃ সেনের সম্বন্ধে খোঁজ নিলাম, তাতেই ছবিটা পরিষ্কার হয়ে গেল।"

"অর্ক অবশ্য আমাকে খুনি বলেই ধরে নিয়েছিল", হাসল দিগন্ত। "ভয় পেলেও ও কিন্তু খুব বুদ্ধিমান ছেলে। তিনদিনের দিন, মানে গত শুক্রবার, ওর সঙ্গে আমার ভাব হয়ে গেল। আমার হাতে কোনও কালো দাগ নেই, তাতেই ও বুঝেছিল, আমি অন্যলোক, ওর বন্ধু। ও ঠিক-ঠিক আমার কথামতো কাজও করেছিল। আপনিও বুঝতে পারেননি যে আর ভয় পাচ্ছে না।" অর্কর মায়ের দিকে তাকিয়ে বলল দিগন্ত।

"ঘটনাটা দেখার সময় অর্ক ডাঃ সেনের মুখ দেখতে পায়নি, সবচেয়ে স্পষ্ট দেখেছিল দুটো হাত,

যার মধ্যে এক হাতে কালো জড়ুলের দাগ। আর অচৈতন্য বা মৃত সমরবাবুর দেহটাকে ঢাকনি সরিয়ে ঢুকিয়ে দেওয়া।

"দ্বিতীয় সমাপতন," একটু থেমে বলল দিগন্ত, "আপনাদের হাউস-ফিজিসিয়ান ডাঃ মিত্র যে অর্ককে ডাঃ সেনের কাছেই রেকমেণ্ড করলেন—এটা হিসেবের বাইরে ছিল। কিন্তু এটাই পুরো ঘটনাটা সহজ করে দিল। অর্ককে সম্মোহন করে ডাঃ সেন দেখলেন। হত্যাকাণ্ডের একটি প্রত্যক্ষদর্শী রয়েছে, যা ওঁর চিন্তাতেই আসেনি। অবনীবাবুর কথা অবশ্য রঞ্জিতদাই জানান ডাঃ সেনকে। তার আগেই আমি রঞ্জিতদার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলাম।"

"হ্যাঁ। আমি কিন্তু ওঁর কথায় গুরুত্ব দেওয়ার বদলে সন্দেহই করেছিলাম। তারপর যখন দেখলাম ওর দেওয়া তথ্যের প্রতিটিই সঠিক! তখনই ওর ওপর আস্থা বাড়ল।" ববলেন রঞ্জিত সাহা।

"ঘটনার দিন আমাকে দেখেছিলেন ডাঃ সেন। অর্কর বর্ণনা আর এই দেখাটা উনি কাজে লাগাতে চেয়েছিলেন। অর্ককে কিন্তু গুরুত্ব দেননি ডাঃ সেন। ওঁর নিজের ওপর আস্থা ছিল, অর্কর শিশুমন থেকে ছবিটা উনি মুছে ফেলতে পারবেন। কিন্তু আর-এক সাক্ষী—অবনীবাবুকে সরিয়ে দিতে হল।"

"কী করে? জিজ্ঞেস করলেন অসীমবাবু।

"খুব সহজে। যদিও বিরাট ঝুঁকিই নিয়েছিলেন ডাঃ সেন। উনি ধরে নিয়েছিলেন, অবনীবাবু ওঁকে চিনতে পারবেন আর পুলিশকে জানাবার চেষ্টা করবেন। কিন্তু ওঁর ফ্ল্যাটে ফোন আছে কিনা নেওয়াটা জরুরি ছিল। নিজের পরিচয়েই উনি এসেছিলেন অবনীবাবুর কাছে।

"সম্ভবত সিঁড়ির আলোটা নেভা দেখেই পরিকল্পনা ওঁর মাথায় আসে। নীচে নেমে গেলেও উনি চলে যাননি। কয়েক মিনিট পরে অবনীবাবু যখন দ্রুত নেমে আসছেন, তখন অল্প একটু ধাক্কাই যথেষ্ট ছিল। চিকিৎসক হিসেবে উনি জানতেন মেরুদণ্ডের ঠিক কোন জায়গায় আঘাত করলে সেটা সাঙ্ঘাতিক হবে। এটুকু করে স্বচ্ছন্দে উনি চলে এসেছিলেন বাইরে।"

"হ্যাঁ," রঞ্জিত সাহা বললেন, "ওই সময়ই আমি ওকে অ্যারেস্ট করতে পারতাম। কিন্তু তাতে প্রথম ঘটনাটার কিনারা হত না।"

"পরের ব্যাপার আপনাদের জানা। বলল দিগন্ত।

"এ পরিকল্পনাটাও অবশ্য দিগন্তর।"

"হ্যাঁ, ডাঃ সেন যে অর্ককে একা পেতে চেষ্টা করবেন, এ-ব্যাপারে আমি প্রায় স্থির নিশ্চিত ছিলাম।"

"বাবাঃ, অর্ককে ওঁর হাতে ছেড়ে দিয়ে আমি প্রায় দমবন্ধ করে বসেছিলাম। শুধু রঞ্জিতবাবু ছিলেন বলে," বললেন অর্কর মা।

"অর্ক নিখুঁত ভূমিকাই পালন করেছিল।" অর্কর পিঠ চাপড়ে দিলেন রঞ্জিত সাহা।

"নইলে ভাবুন, কোথায় এই বেলেঘাটার পোড়ো কারখানা আর কোথায় রাসবিহারী অ্যাভিনিউতে ডাঃ সেনের বাড়ি। ওঁর নিখুঁত অ্যালিবাইও ছিল। প্রতি মঙ্গলবারই উনি রামানন্দ মেণ্টাল হসপিটালে দুপুর বারোটা থেকে বিকেল পাঁচটা অবধি থাকতেন। ঘটনার দিনও ছিলেন, অন্তত সাক্ষী-সাবুদ, অফিস রেকর্ড সবেতেই সে প্রমাণ ছিল। অর্ক না থাকলে···"

"কিন্তু সমরবাবু? অসীমবাবু জানতে চাইলেন।

"সেটাই সবচেয়ে ইণ্টারেস্টিং। সমরবাবু সেনের ছোটবেলার বন্ধু। উনিই একমাত্র জানতেন ডাঃ সেনের এমন দুর্বলতার কথা, যা তাঁর প্রতীক্ষা আর পেশার ক্ষতি করতে পারত। ডাঃ সেন নিজেই মানসিক অবসাদগ্রস্ত ছিলেন। সেজন্য তিনি দিল্লি গিয়ে চিকিৎসাও করান। পাগলের ডাক্তার নিজেই পাগল, এটা ওঁর খ্যাতির বিরুদ্ধে যেতে পারত।"

"এটাকে কাজে লাগাতেন সমরবাবু।" বললেন রঞ্জিত সাহা, "বলতে পারেন ব্ল্যাক মেইল। ডাঃ সেন তাঁর জবানবন্দিতে বলেছেন, তার চেয়েও মারাত্মক ছিল আর-একটা ব্যাপার। সমরবাবু ডাঃ সেনের চিকিৎসা-পদ্ধতি নিয়েও বিদ্রূপ করাতন। চ্যালেঞ্জও জানাতেন সমরবাবুকে কোনওদিনই সম্মোহন করতে পারবেন না। অথচ এটাই ছিল ডাঃ সেনের সাফল্যের চাবিকাঠি, পেশার ভাইটাল জায়গা।"

"সমরবাবুর শেষ দাবিটা ছিল একটা মোটা অঙ্কের টাকা। আর ধৈর্য রাখতে পারেননি ডাঃ সেন। যদি সমরবাবু সম্মোহিত না হন, তবেই টাকা পাবেন—এই ছিল ডাঃ সেনের শর্ত। এই জায়গাটা দু'জনেরই পরিচিত। দশ বছর আগে পূর্ণ দত্ত রোডেই থাকতেন ডাঃ সেন। চ্যালেঞ্জর মোকাবিলা করতে এসেছিলেন সমরবাবু আর তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেছিলেন ডাঃ সেন।

রঞ্জিত সাহা বললেন, "কিন্তু উনি যাকে বলে বর্ণ-ক্রিমিন্যাল, তা ছিলেন না। পুরো ব্যাপারটাতে যে খুব দক্ষ পরিকল্পনা ছিল, তা বলা যায় না।"

"তবু অপরাধ, অপরাধই, তার জালেই জড়িয়েছিলেন ডাঃ সেন।"

দিগন্ত উঠে পড়ল। অর্ক এরে হাত ধরল তার।

"তুমি আর আসবে না?"

"আসব। এদিকে এলেই তোমার কাছে আসব।"

হাসিমুখে সকলের দিকে তাকাল দিগন্ত। তারপর লিভিং রুমের বাইরে পা রাখবার আগে কাঁধে ঝোলানো ব্যাগ থেকে একটা বল বার করে এগিয়ে দিল অর্কর দিকে।

"তোমার বলটা। আচ্ছা, চলি।"

———



জুহু বিচে তদন্ত

শচীপদ চট্টোপাধ্যায়



সকালে ঘুম থেকে উঠে বাগানে একটু পায়চারি করে যখন কেয়ারি করা রঙ্গন গাছগুলোর পাশে এসে দাঁড়িয়েছি, ঠিক তখনই রাখহরি এসে খবরের কাগজটা হাতে দিল। কাগজের প্রথম পাতায় চাঞ্চল্যকর একটি সংবাদের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে চমকে উঠলাম। এক অদ্ভুত প্রতারণার খবর।

রাখহরি বলল, "আপনার চা কি এখানে নিয়ে আসব ?"

আমি রাখহরির মুখের দিকে একটুক্ষণ স্থিরভাবে চেয়ে থেকে বললাম, "নাঃ, থাক। আমিই ভেতরে যাচ্ছি।" বলে ঘরে এসেই ডায়াল ঘুরিয়ে ফোন করলাম। যেখানে ফোন করলাম, সেখানে লাইন ঠিকমতো পাওয়া গেলেও ফোন ধরল না কেউ। অর্থাৎ সোনালি অ্যাপার্টমেন্টের ওই ঘরটিতে এখন কেউ নেই।

ফোন নামিয়ে রেখে আমি যখন ইজিচেয়ারটায় গা এলিয়ে খবরের বিষয়বস্তুর ওপর মন রেখেছি, রাখহরি তখন চা নিয়ে এল। সঙ্গে দুটো বিস্কুট।

আমি বিস্কুট খেয়ে চায়ে চুমুক দিলাম। যে খবরটা আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে, তা এইরকম, গতকাল দুপুরে বউবাজার অঞ্চলে একটি গহনার দোকানে অভিনব কায়দায় প্রতারণা করা হয়েছে। দুপুর একটা নাগাদ এক দম্পতি একটি দোকানে এসে লক্ষাধিক টাকার গয়না কেনেন। তারপর সেল ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়ার জন্য রসিদ না নিয়েই চলে যায়। দোকানদারও টাকা গুনে সিন্দুক ভর্তি করে খদ্দেরকে বিদায় দেন। এইরকম খদ্দের যে এই প্রথম তা নয়, মাঝেমধ্যেই এইরকম দু-একজন আসেন। সম্পত্তি কেনাবেচার ব্যাপারেও এইরকম ফাঁকিবাজি চলে। তিন লাখ টাকার সম্পত্তিকে দু'লাখ টাকা দেখিয়ে দলিল করা হয়। তাতে অনেক টাকার স্ট্যাম্পপেপার বেঁচে যায়। সে যাক, রহস্য ঘনাল এর

পরেই। ওই দম্পতি গয়না নিয়ে চলে যাওয়ার পরই আরও দু'জন খদ্দের আসেন। এ-ক্ষেত্রেও একজন পুরুষ, অন্যজন মহিলা। তাঁরাও ওই একই দামের গয়না কিনে নিয়ে রসিদ নিয়ে যখন উঠে আসতে যান, নাটক তখনই জমে। দোকানদার বিনীতভাবে বলেন, "আমার টাকাটা ?"

দম্পতি বলেন, "টাকা তো আপনাকে দিয়ে দিয়েছি !"

দোকানদারের চোখ কপালে উঠে যায়, "সে কী মশাই, কখন আমাকে টাকা দিলেন ?"

দম্পতি শুরু করেন চেঁচামেচি, "ঠগ জোচ্চার, মিথ্যেবাদী।" সে এক মহা কেলেঙ্কারি। খদ্দের ও দোকানদারের চেঁচামেচিতে লোকজন জড়ো হয়ে যায়। পুলিশ আসে। পুলিশ এসে দম্পতিকে বলে, "আপনারা যে টাকা দিয়েছেন, তার কোনও প্রমাণ আছে।

দম্পতি বলেন, "আছে বইকী। প্রতিটি নোটের নম্বর আমাদের কাছে নোট করা আছে। এই দেখুন।" পুলিশ তখন দোকানদারের সিন্দুক খুলিয়ে টাকা বের করে নোটের নম্বর মিলিয়ে দেখে। প্রতারকরা সসম্মানে তাঁদের গয়না নিয়ে চলে যান। আর দোকানদার ? মাথা হেঁট করে বসে থেকে জনসাধারণের ধিক্কার এবং বিদ্রূপাত্মক বাক্যবাণ হজম করতে থাকেন।

চাঞ্চল্যকর এই সংবাদটা পড়ে দেখলেই বোঝা যায় প্রতারণার ব্যাপার সুপরিকল্পিত। অর্থাৎ দুই দম্পতি একই চক্রের হয়ে কাজ করেছেন। আর সবচেয়ে মজার ব্যাপার যে দোকানদার এই প্রতারণার বলি হয়েছেন তিনি আমার বিশেষ পরিচিত। নাম গুণধর পাইন। ফরসা রং। মাঝারি চেহারা। সব সময় মুখে পান আর পরণে ধুতি-পাঞ্জাবি, অত্যন্ত বিচক্ষণ ব্যক্তি। এ হেন লোক যে খদ্দেরকে সন্তুষ্ট করতে গিয়ে কেন এমন ভুল করলেন, তা ভেবে পেলাম না।

কাগজটা নামিয়ে রেখে যখন বিষয়টা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করছি সেই সময় রাখহরি এসে বলল, "এক ভদ্রলোক আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।"

"উনি কি একাই, না সঙ্গে কেউ আছেন ?"

"বারো-চোদ্দ বছরের একটি ছেলেও আছে !"

"ওঁদের ভেতরে আসতে বলো। আর চা করো সকলের জন্য।"

একটু পরেই পায়ের শব্দ শোনা গেল। চেহারা না দেখেই বললাম, "আসুন গুণধরবাবু, আসতে আজ্ঞা হোক।"

গুণধরবাবু বিনয়ের হাসি হেসে বললেন, "কী করে জানলেন আমি ?"

"আজ সকালে আপনার গুণের খবর কাগজে ফলাও করে ছাপা হয়েছে দেখেই অনুমান করেছি, এইবার আমার কথা আপনার নিশ্চয়ই মনে পড়বে।"

গুণধরবাবু নিজে থেকেই আসন গ্রহণ করলে বললাম, "এই ছেলেটি কে ?"

"আমার একজন কর্মচারী।"

রাখহরি চা দিয়ে গেলে আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা বেশ ভাল করে শুনলাম গুণধরবাবুর মুখ থেকে। শুনে বললাম, "এখন আমাকে আপনি কী করতে বলেন?"

গুণধরবাবু বললেন, "শোনো ভাই, আমার তো যা হওয়ার তা হয়েইছে। এই ব্যাপারে আইন আদালত করতে গেলে কর ফাঁকি দেওয়ার অপরাধে আমিই ফেঁসে যাব। বহু কষ্টে পুলিশি ঝামেলার হাত থেকেও রেহাই পেয়েছি। এখন আমি চাই, এই প্রতারকদের তুমি খুঁজে বার করো!"

"তাতে লাভ? আপনার গয়না কি আপনি ফেরত পাবেন?"

"না। গয়নাও পাব না। টাকাও না। তবু চাই এই জাল ছিঁড়ে যাক। অপরাধী ধরা পড়ুক।"

আমি বললাম, "এই ধরনের অপরাধীর শাস্তি পাওয়া অবশ্যই দরকার, কিন্তু এই জনবহুল শহরে কোথায় কোনখানে যে রয়েছে তারা, কোন সূত্র ধরে তা আবিষ্কার করব? এই মুহূর্তে তারা যে পুনে কিংবা বাঙ্গালোরের কোন কফি হাউসে বসে নেই তাই বা কে বলতে পারে?"

"তা হলে?"

"চেষ্টা অবশ্যই করব। করছিও।" বলে আর একবার উঠে গিয়ে ডায়াল ঘুরিয়ে ফোন করলাম।"

এবারে সাড়া এল, "হ্যালো!"

"ইনস্পেক্টর ভদ্র? আমি অম্বর বলছি। অম্বর চ্যাটার্জী।"

"হ্যাঁ বলুন। কী ব্যাপার?"

"একটু আগে আপনার অ্যাপার্টমেণ্টে ফোন করেছিলাম।"

"আমি মার্কেটিংয়ে গিয়েছিলাম।"

"আপনার ঘরে কেউ নেই? ফোন ধরল না কেন?"

"জানেন তো আমি ব্যাচিলর মানুষ! আর কাজের লোকটির আন্ত্রিক দেখা দেওয়ায় তাকে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছি।"

"বেশ করেছেন। একটা ব্যাপারে আমি আপনার একটু হেল্‌প চাইছি। কাল বউবাজারে একটি গয়নার দোকানে···।" লাইনটা হঠাৎ কেটে গেল।

আমি গুণধরবাবুকে বললাম, "আপনার গাড়ি আছে?"

"গাড়ি নিয়েই এসেছি আমি।"

"তা হলে ড্রাইভারকে বলুন, একবার সোনালি অ্যাপার্টমেণ্টে আমাদের নিয়ে যেতে।"

"সেটা কোথায়?"

"কোলার স্বর্ণখনির কাছে নয়, এই কলকাতার মধ্যেই।"

রাখহরি আজকের জন্য একটু মাংস-ভাত করে রাখতে বলে গুণধরবাবুকে নিয়ে সোনালি অ্যাপার্টমেণ্টে এলাম।

ইনস্পেক্টর ভি কে ভদ্র একজন সুদর্শন যুবক। পুলিশের চাকরিতে ওঁর মতো ভদ্র যুবকের সত্যিই প্রয়োজন। খুব শান্ত প্রকৃতির কিন্তু রাগলে ভীষণ।

আমরা যেতে সাদর অভ্যর্থনা করে বসালেন আমাদের। তারপর ধীরেসুস্থে গুণধরবাবুর মুখ থেকে সবকিছু শুনে বললেন, "দেখুন, কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ না বের হয়। তবে কলকাতা শহরের বুক দিনদুপুরে এইরকম প্রতারণা সত্যিই নজিরবিহীন। এখন আমাকে কী করতে হবে বলুন?"

গুণধরের হয়ে আমি বললাম, "দেখুন, কেসটা যেরকম তাতে দোকানদারকে যে ব্ল্যাকমেল করা হচ্ছে একটা কি আপনি বুঝতে পারেননি? ওই দম্পত্তিকে চলে যাওয়ার সুযোগ না দিয়ে আপনি যদি ওদের জেরা করতেন, এত টাকা কোথা থেকে পেলেন সে-কথা জানতে চাইতেন বা ওদের পেছনে ধাওয়া করে ডেরাটা দেখে আসতেন তা হলে কিন্তু হাতেনাতে ধরা পড়ত চক্রটা।"

ভদ্র কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, "এই কথাটা যে আমারও মনে হয়নি তা নয়। এবং এই ভুলটা যে মারাত্মক তা আমিও স্বীকার করছি। কিন্তু মুশকিল হল গুণধরবাবু তখন চোখ-মুখের ভাব এমন করলেন যে, মনে হয়েছিল উনিই আসলে খদ্দেরকে ব্ল্যাকমেল করতে চাইছিলেন। তাই আমরা ওঁকেই ভৎর্সনা করছিলাম। ইতিমধ্যে পাখি ফুড়ুত।"

আমি গুণধরবাবুকে বললাম, "ওই দম্পত্তি দুজনকে এর আগে আপনি আর কখনও দেখেছিলেন?"

হতাশ গুণধরবাবু বললেন, "না ভাই। মনে তো পড়ছে না।"

গুণধরবাবুর সঙ্গে যে ছেলেটি ছিল তাকে প্রশ্ন করলাম এবার, "তোমার নাম কী ভাই?"

"আমার নাম নন্দ।"

"তোমার বাড়ি কোথায়?"

নন্দর হয়ে গুণধরবাবুই বললেন, "ওর বাড়ি হরিপালের কাছে এক গ্রামে। বাপ-মা মরা ছেলে। আমার কাছেই মানুষ।"

নন্দকে বললাম, "ওই মুখগুলো আর একবার দেখলে তুমি চিনতে পারবে?"

"নন্দ বলল, "হ্যাঁ পারব।"

"আচ্ছা, ওঁদের কাউকে আর কখনও এই দোকানে তুমি আসতে দেখেছিলে?"

"মনে হচ্ছে একবার যেন দেখেছিলাম। দু-তিন মাস আগে এক মহিলা দুপুরবেলা এসে আমার কাছ থোক ডিজাইনের বইটা চেয়ে অনেকক্ষণ ধরে কী সব দেখে ব্রজদার সঙ্গে কথা বলে চলে গেলেন।"

"ব্রজদা! ব্রজদা কে?"

"আগে কাজ করত আমাদের দোকানে।"

"এখন করে না?"

"না।"

আমি গুণধরবাবুকে বললাম, "সেদিন দুপুরে আপনি কোথায় ছিলেন ?"

গুণধরবাবু বললেন, "আমি বরাবরই বিকেলের দিকে আসতাম এবং রাত অবধি থেকে ক্যাশ নিয়ে বাড়ি যেতাম। এখন ব্রজ চলে যাওয়ায় সব সময়ই আমাকে দোকানে থাকতে হয়।"

"আপনার সেই ব্রজ এখন কোথায় ?"

"ও পাথর সেটিং-এর কাজ জানত। শুনেছি সেই কাজ নিয়ে ও এখন বম্বের জাভেরি মার্কেটে ভাল রোজগার করছে।"

"ওর বাড়ি কোথায় জানেন ?"

"ডোমজুড়ের কাছে নিবড়ে নামে একটা গ্রাম আছে, সেইখানে। তবে ও বউবাজারেই মেসে থাকত। সেই ঠিকানাটা আমি জানি। কিন্তু ব্রজ অত্যন্ত ভাল ছেলে। ওকে সন্দেহ করার কোনও কারণ তো আমি দেখতে পাচ্ছি না।"

"সন্দেহ করছি না তো। তবে একেবারে হাল ছেড়ে না দিয়ে ভাই একটু ফুঁ দিয়ে দেখছি ছাইচাপা কিছু যদি থাকে।"

ইন্সপেক্টর ভদ্রর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বউবাজারের মেসে এসে ব্রজর বম্বের ঠিকানা সংগ্রহ করলাম। ওর দু-একটা চিঠিপত্তর যা বন্ধুদের লিখেছিল, তা পড়ে দেখলাম। বম্বে থেকে পাঠানো ওর দু-একটা ফোটোও সংগ্রহ করলাম বন্ধুদের কাছ থেকে। যা গুণধরবাবুর কাছে নেহাতই অর্থহীন বলে মনে হল।

সব কাজ সেরে যখন বাড়ি ফিরলাম দুপুর তখন দেড়টা। রাখহরি আমার জন্য হানটান করছিল। বলল, "আপনি এত দেরী করলেন দাদাবাবু! একটু আগে অশোকবাবু এসেছিলেন। আপনার জন্যে অপেক্ষা করে চলে গেলেন।"

"অশোকবাবু! মানে অশোক পালিত! সেই প্রেস ফোটোগ্রাফার ছেলেটি ?"

"হ্যাঁ। বলে গেছেন আবার আসবেন সন্ধ্যের সময়। আপনি যেন কোথাও যাবেন না। বিশেষ দরকার।"

আমি চিন্তিত হয়ে বললাম, "কী এমন দরকার যে, এইভাবে থাকতে বলল ?"

"তা জানি না। তবে একটা কাগজ রেখে গেছেন। আপনাকে দেখতে বলেছেন।"

আমি ভেতরে ঢুকে পোশাক পরিবর্তন না করেই অশোকের রেখে যাওয়া কাগজের পাতায় চোখ বোলালাম। নতুন বেরিয়েছে কাগজটা। লোকের হাতে-হাতে না ঘুরলেও হকাররা রাখে। বিক্রিও হয়। সেই কাগজের প্রথম পাতায় বউবাজারের প্রতারণার বিবরণটা ফলাও করে ছাপা তো হয়েইছে, সেই সঙ্গে রয়েছে অশোকের তোলা একটি সুন্দর আলোকচিত্র। যাতে দেখা যাচ্ছে গয়নার বাক্স নিয়ে

সেই দম্পতি অপেক্ষমান একটি মারুতিতে উঠছেন। এই ছবি একমাত্র এই একটি দৈনিকেই ছাপা হয়েছে।

কাগজটা রেখে মনের আনন্দে স্নান-খাওয়া সেরে বারবার সেই ছবির মুখগুলো দেখতে লাগলাম। আর ভাবতে লাগলাম এ জগতে কোনও কিছুই তুচ্ছ নয়, অশোক পালিতও নয়, আর এই কাগজটাও নয়। সবারই কিছু-না-কিছু অবদান থাকে।

অশোকের কথামতো আমি সারাটা দিন ঘরে রইলাম। কিন্তু না। দুপুর গড়িয়ে বিকেল, বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যে পার হয়ে গেল তবুও অশোক এল না। রাত্রিবেলা ওর কাগজের অফিসে ফোন করলাম। সেখান থেকেও ওর কোনও খোঁজখবর দিতে পারল না কেউ।

সে রাত্রে অশোকের জন্য অপেক্ষা করে করে আমি নিজেও কোথাও গেলাম না। পরদিন সকালে কাগজেই খবর পেলাম, অশোকের মৃতদেহ মধ্যরাত্রে কে বা কারা যেন ওদের অফিসের সামনে রাস্তার ওপর শুইয়ে রেখে গেছে।

শিউরে ওঠার মতো খবর। চক্রটি যে শুধু প্রতারণা করে, তাই নয়। খুন করতেও পিছপা হয় না। সামান্য একটি আলোকচিত্র প্রকাশ করার অপরাধে যারা একজন নিরীহ ফোটোগ্রাফারকে হত্যা করতে পারে তারা যে কী সাঙ্ঘাতিক তা যে-কেউ ধারণা করতে পারবে। আমি সেই কাগজের কাটিং সঙ্গে নিয়ে প্রথমেই গেলাম গুণধর পাইনের ওখানে। নন্দকে ছবিটা দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "তুমি এঁদের চিনতে পারো?"

নন্দ বলল, "হ্যাঁ। এরাই তো এসেছিল কাল।"

আমি সেই মহিলার ছবি দেখিয়ে বলেছিলাম, "ইনিই কি তোমার ব্রজদার সঙ্গে কথা বলেছিলেন?"

"না সে ছিল প্রথমজন।"

তারপর সোজা চলে এলাম সদর দফতরে। সেখানেও পুলিশের সংগ্রহে থাকা অপরাধীদের ছবির সঙ্গে মিলিয়ে এই ছবির দু'জনের একজনেরও কোনও মিল পেলাম না। অবশেষে হতাশ হয়েই বাড়ি ফিরে এলাম।

কীভাবে যে তদন্তের কাজ এগিয়ে নিয়ে যাব, তা ভেবে পেলাম না। রহস্যের জট খুলতে পারি এমন কোনও সূত্রও খুঁজে পেলাম না কোথাও।

এখন একমাত্র ভরসা ব্রজগোপাল। তবে সেখানেও যে খুব একটা আশার আলো আছে, তা নয়। সে বেচারা নির্দোষও হতে পারে। দোকানে কত কাস্টমার আসে, তাদের সঙ্গে কথাও বলতে হয়। তবু···

তবু চেষ্টা একটু চালিয়ে যাই। সারাদন অনেক চিন্তাভাবনাকরার পর একটা উপস্থিত বুদ্ধি মাথায় এল। গগজের কাটিংটা সঙ্গে নিয়ে কলকাতার বিভিন্ন হোটেলে খোঁজখবর শুরু করলাম।

বেশী খুঁজতে হল না, শিয়ালদহেই উড়ালপুলের পাশে সাধারণ একটি লজের ম্যানেজার ছবি দেখেই বললেন, "কী আশ্চর্য ! এঁরা তো আমাদেরই অতিথি। প্রায়ই আসেন এখানে।"

"আমি একটু দেখা করতে চাই।"

ম্যানেজার ঘাড় নেড়ে বললেন, "সরি। কাল রাতেই এঁরা চলে গেছেন ঘর ছেড়ে দিয়ে।"

"সেই ঘরে নতুন কেউ কি এসেছেন এখনও ?"

"না। ঘর খালি আছে।"

"একবার দেখতে পারি ঘরটা ?"

"আপনার পরিচয় ?"

পরিচয় দিলাম। ম্যানেজার নিজে সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন ওপরের ঘরে। কিন্তু তন্নতন্ন করে খুঁজেও কিছুই যখন পেলাম না তখন হঠাৎ ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটের মধ্যে কিছু বাজে কাগজের সঙ্গে একটা ট্রেনের টিকিট উদ্ধার হল। টিকিটটা বম্বে ভিটি টু হাওড়ার, পাঁচদিন আগেকার। টিকিটও দু'জনের। মিঃ পি কে সিনহা এবং মিসেস সিনহা। ছবির বয়সের সঙ্গে বয়সও মিলে যাচ্ছে। আমি উৎফুল্ল চিত্তে টিকিটটা পকেটে নিয়ে সহযোগিতার জন্য ম্যানেজারকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিলাম হোটেল থেকে। কী ভাগ্যিস চাপরাশি কাগজগুলো ঘর ঝাঁট দিয়ে বাইরে ফেলে দেয়নি।

পরদিন দুপুরেই গীতাঞ্জলি এক্সপ্রেসে ভি· আই· পি· কোটায় দুটো বার্থ নিয়ে চলে এলাম বম্বেতে। অবশ্য একা আসিনি। ইনস্পেক্টর ভদ্রও সিভিল ড্রেসে সঙ্গে এসেছেন। কলকাতা থেকে একটা হোটেলে জানিয়ে এসেছিলাম। তাই আমাদের থাকার জন্য ঘরও রেডি ছিল !

যথাসময়ে বম্বে পৌঁছে হোটেলে খাওয়া-দাওয়া করে রেস্ট নিলাম। প্রথমেই বম্বে পুলিশের সাহায্য নিয়ে আমরা রিজার্ভেশন টিকিট দেখিয়ে রেল দফতর থেকে উদ্ধার করলাম মিঃ সিনহার ঠিকানাটা। তারপর গেলাম ব্রজর খোঁজে।

পায়ধনির একটি তিনতলার ফ্ল্যাটে ব্রজগোপাল এম· কে· নম্বরির দোকানে কাজ করে। আমরা ওপরে উঠে খোঁজ নিতেই ওর শেঠ এসে বললেন, "ওকে তো আজ পাবেন না আপনারা। পেলেও ফিরতে অনেক রাত হবে।"

"কোথায় গেছেন উনি।"

"আন্ধেরিতে ওর দিদির বাড়ি। আপনারা ?"

"আমরা ওঁকে দিয়ে কিছু কাজ করাব। তাই।"

"এ কাজে দায়িত্ব আমিও তো নিতে পারি ?"

"আমরা কাল ওঁর সঙ্গে দেখা করব।

আমরা সকালের দিকে অন্য কোথাও না গিয়ে একটা ট্যাক্সি নিয়ে গেটওয়ে অব ইণ্ডিয়া থেকে

নরিম্যান পয়েন্ট হয়ে চৌপাট্টি পর্যন্ত ঘুরলাম। তারপর বিকেলবেলা রোদের তেজ একটু কমলে মেরিন লাইন্স থেকে ট্রেন ধরে সোজা চলে এলাম আন্ধেরিতে। ঠিকানা আমাদের কাছেই আছে। রেল দফতর রিজার্ভেশন স্লিপ ঘেঁটে যে ঠিকানা আমাদের দিয়েছে সেটাও আন্ধেরির।

আন্ধেরির জুহুতে এসে সমুদ্রের ধারে বেশ কিছুক্ষণ ঘুরে বেড়ালাম আমরা। তারপর খুঁজে বের করলাম মিঃ এবং মিসেস সিনহার ফ্ল্যাটটাকে। খুবই উন্নতমানের ফ্ল্যাট। তবে দুঃখের বিষয় ঘরে তালা দেওয়া। আর সমুদ্রতীরে বসেই ফ্ল্যাটের দিকে নজর রাখলাম। আলো জ্বললেই ধরব।

এখানে জিহু বিচে এখন টুরিস্টের মেলা। বোম্বাইয়ের চৌপাট্টির থেকেও এখানটা আরও আকর্ষক, লোভনীয়। অনেক রাত পর্যন্ত এখানে মানুষের মেলা বসে থাকে। এই শহর দিন-রাতেও ঘুমোয় না তাই।

হঠাৎ একসময় একজনের দিকে নজর পড়ল আমার। ফ্রেঞ্চকাট দাড়ির এক যুবক সমুদ্রের দিকে মুখ করে বারবার সিগারেট, ধরাতে গিয়ে ব্যর্থ হচ্ছে। বললাম, "একে কি একটুও চেনা-চেনা লাগছে মিঃ ভদ্র ?

"হ্যাঁ। ইনিই তো-সেই ব্রজগোপাল।"

আমি লাইটারটা নিয়ে ব্রজর দিকে এগিয়ে গিয়ে ফট করে ওর মুখের সামনে জেবলে ধরলাম-সেটা।

ব্রজ প্রথমে একটু চমকে উঠল। তারপর সিগারেট ধরিয়ে বলল, "থ্যাংকস।"

আমিও মিষ্টি হেসে ঘাড় নেড়ে ধন্যবাদ গ্রহণ করলাম।

ব্রজ কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ঘাড় নেড়ে চলে যেতে চাইল।

আমি বললাম, "আপনাকে কলকাতায় কোথায় যেন দেখেছি মনে হচ্ছে।"

"ভুল দেখেছেন। আমি বম্বেতেই থাকি।"

"বউবাজারের কোনও সোনার দোকানে কখনও গেছেন কি ?"

মাঝে-মাঝে গেছি হয়তো, সোনাদানা কিনতে।"

"বোম্বাই থেকে কলকাতায় কেউ সোনা কিনতে যায় ? আপনি গুণধর পাইনকে চেনেন ?"

আর চেনা। ব্রজ অতর্কিতে আমাকে এমনভাবে আক্রমণ করল যে, এক ঝটকাতেই ধরাশায়ী হলাম। তারপর আমি উঠে দাঁড়াবার আগেই দৌড় শুরু করল সে। ততক্ষণে মিঃ ভদ্র এসে চেপে ধরেছেন তাকে।

ব্রজ ভয়ে ফ্যাকাসে হয়ে কাঁপা-কাঁপা গলায় বলল, "কে, কে, কে আপনারা ? আপনারা কারা ? আমি আপনাদের চিনি না।

আমি তখন ওর পেটের কাছে রিভলবার ধরে বললাম, "আমাদের তুমি নিশ্চয়ই চিনবে ব্রজদুলাল।"

"আমি ব্রজদুলাল নই। আপনারা ভুল করছেন। আমি ব্রজগোপাল।"

"এখানে কোথায় এসেছিলে ? দিদির বাড়ি ?"

"আমার কোনও দিদি-টিদি নেই।"

আমি খবরের কাগজের কাটিংটা ওর দিকে মেলে ধরে বললাম, "এঁদের তুমি চেনো ? এরা কারা ? এখানকার সাউথপয়েন্ট ব্লকে ফিফ্‌থ ফ্লোরে কারা থাকে ?"

ব্রজ তখন দু'হাতে মুখ ঢেকে কেঁদে ফেলল। বলল, "সব বলব আপনাদের। আমাকে ছেড়ে দিন। আপনারা নিশ্চয়ই পুলিশের লোক ?"

"হ্যাঁ। অনেকক্ষণ থেকে আমরা ওঁত পেতে আছি তোমাদের ধরবার জন্য। ওঁদের ফ্লাটে তালা দেওয়া। কোথায় গেছেন ওঁরা ?"

"আমরা সবাই গিয়েছিলাম বজ্রেশ্বরী। একটু আগেই ফিরেছি।"

"তা হলে চলো। ওঁদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় একটু করিয়ে দাও।"

জুহু বিচ ঘিরে তখন উৎসাহী জনতার কোতূহলী দৃষ্টি। আমরা হাতের ইঙ্গিতে তাদের সরে যেতে বলে টেলিফোন বুথে গিয়ে লোকাল থানায় একটা ফোন করলাম। বোম্বাই পুলিশকে আগে থেকেই জানানো ছিল ব্যাপারটা। তারাই এখানকার ফোন নম্বর আমাদের দিয়েছিলেন। তাই অসুবিধা হল না।

আমরা ব্রজকে সঙ্গে নিয়ে মিঃ অ্যান্ড মিসেস সিনহার ফ্ল্যাটে যখন পৌঁছলাম, তখন আমাদের দেখেই ভূত দেখার মতো চমকে উঠলেন তাঁরা। আমাদের দু'জনের হাতে রিভলবার আর ব্রজগোপালের অবস্থা দেখেই ব্যাপারটা যে কী হতে চলেছে, তা অনুমান করতে পারলেন।

একটু পরেই স্থানীয় পুলিশও এসে গেল।

জেরার মুখে অপরাধ স্বীকার করল অপরাধীরা। উদ্ধার হল লক্ষাধিক টাকার সমস্ত গয়না। ব্রজগোপাল স্বীকার করল, এরাই তার নিজের দিদি-জামাইবাবু। এই জামাইবাবুই তাকে বোম্বাইতে নিয়ে আসেন। এইখানে বসেই এই অভিনব প্রতারণার পরিকল্পনা করে ওরা। উদ্দেশ্য, এইভাবে সোনা সংগ্রহ করে নিজেরা স্বাধীনভাবে এখানে একটা ব্যবসা করবে। তবে পার্কস্ট্রিটের শম্ভু মালিক এবং তাঁর স্ত্রী হচ্ছেন আসল নাটের গুরু। প্রতারণা ছাড়াও আরও অনেক বাজে কাজ তাঁরা করে থাকেন। মিঃ সিনহাকে নিয়ে কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে এবং অন্যান্য বড়-বড় শহরে বেশ কিছুদিন ধরে এইরকম প্রতারণার ফাঁদ পেতে আসছিলেন। শুধু ভাগ্য বিপর্যয়ে এইবার বমাল সমেত ধরা পড়লেন সকলে।

বোম্বাই পুলিশ প্রতারণার দায়ে তিনজনকেই গ্রেফতার করল। ওদিকে টেলিফোনে খবর পেয়ে কলকাতা পুলিশও অ্যারেস্ট করল শম্ভু মালিক ও তাঁর স্ত্রীকে। তাঁদের বিরুদ্ধে শুধু প্রতারণা নয়, খুনের অভিযোগও আনা হল।

আমরা গুণধরবাবুকে পরদিন বিমানযোগে বোম্বাই আসতে বলে ভি. টি-তে ফিরে এলাম। এখন পূর্ণ বিশ্রাম। কাল গুণধরবাবুও এলে ওঁর হাতে গয়নার বাক্স তুলে দিয়ে ভাবছি গোয়াটা একবার ঘুরে যাব।

———

গোয়েন্দা কম্পিউটার ক্লাব

পার্থপ্রতিম সেনগুপ্ত



রবিবারের সকালবেলা যথারীতি গোলোকদা'র বাড়ির হলঘরে পাড়ার ছোটদের কম্পিউটার ক্লাবের জমজমাট আড্ডায় তীর্থ, রনি, শাঁওন, বুবাই—আমরা সকলেই জড়ো হয়েছি। গোলোকদা একমনে এক বাক্সফ্লপি ডিস্কের ওপর ফেল্ট পেন দিয়ে নামধাম, বিষয় লিখছেন। ওঁর পি. সি. অর্থাৎ পার্সোনাল কম্পিউটারের ডিস্কে প্রয়োজনীয় বিষয়ের ওপর রকমারি তথ্যের এক বিশাল লাইব্রেরি তৈরি করা এখন গোলোকদার লেটেস্ট হবি। ওঁরই উদ্ভাবন করা এক সহজ "ক্ল্যাসিফিকেশন সিস্টেম' ব্যবহার করার ফলে সেই লাইব্রেরি থেকে তথ্য খুঁজে বের করাও দেখছি দারুণ সহজ। অন্তত মোটা-মোটা বই বা এনসাইক্লোপিডিয়ার পাতা ঘেঁটে খোঁজার চেয়ে অনেকগুণে তো বটেই।

"মে উই কাম ইন ?"

গম্ভীর শানানো গলার ডাক শুনে আমরা তাকাই। হলঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে জোড়া-মূর্তি। গোলকদার কাছে হরদম নানা লোকের আনাগোনা, ফ্রিল্যান্স কনসালটেন্সি শুরু করার পর ব্যাপারটা আরও বেড়েছে। তবে রবিবারের সকালগুলোতে গোলকদা কোনও অ্যাপয়েন্টমেন্ট রাখেন না আমরা জানি। তাই গোলকদার দেড় ইঞ্চি ওঠানো ভুরুতে ঈষৎ বিরক্তির ইঙ্গিত।

"ইয়েস", বলে গোলকদা হাত বাড়িয়ে আগন্তুক দু'জনকে ভেতরে আসতে বলার সঙ্গে-সঙ্গে ঘরের মধ্যে যেন একটা 'থানা-পুলিশ, থামা-পুলিশ গন্ধ' এসে ঢুকল। দু'জনের মধ্যে প্রথম জনের ফরসা রং, ঈষৎ টাক, মাঝারি হাইট, পরনে বাদামি সাফারি সুট' সোনালি ফ্রেমের চশমা, হাঁটা-চলা দেখে বোঝা যায় কর্তৃত্ব করতে অভ্যস্ত। দ্বিতীয়জন লম্বা-চওড়া. ময়লা রং, চোখে কড়া দৃষ্টি, হাতে একতাড় কাগজপত্র।

"বলুন", গোলকদার চোখ থেকে বিরক্তির আভাসটা তখনও মোছেনি।

"বিরক্ত করার জন্য মাপ চেয়ে নিচ্ছি। আমরা আসছি দিল্লির রেভিনিউ ইনটেলিজেন্স ডিপার্টমেণ্ট থেকে।"

ভদ্রলোক বসবার পর একপাশে কাত হয়ে প্যাণ্টের পকেট থেকে আইডেনটিটি কার্ড বের করে ইংরেজিতে বললেন, "আমি এস. কে. জামকর। উনি আমার সহকর্মী মিঃ পি. এন. প্রধান। আপনাদের পাড়ায় আমরা সকাল থেকে এক প্রতিবেশীর বাড়িতে একটা 'সার্চ অ্যাণ্ড সিজার' অপারেশন চালাচ্ছি।"

"আয়কর হানা?" গোলকদা জিজ্ঞেস করলেন, "মানে রেইড?"

"হ্যাঁ। ভদ্রলোককে চেনেন নিশ্চয়ই, মিঃ নিরুপম ঢনঢনিয়া?"

"থার্টি বাই টু, আশাবরী অ্যাপার্টমেণ্ট, তিনতলায়, নাক-কান গলা ডাক্তার হাজরা'র ফ্ল্যাটের উলটোদিকের ফ্ল্যাট," বলে ওঠে রনি। বলেই জিভ কাটে নাক-কান-গলা বিশেষজ্ঞ ডাক্তার হাজরার পাড়ায় চালু বিশেষণটা বলে ফেলে।

"ইয়েস। বাট ডক্টর হাজরা ইজ মোস্ট আনকোঅপারেটিভ," রনির দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসেন মিঃ জামকর, "এই সমস্ত ব্যাপার পাবলিক কো-অপারেশনকে আমরা খুব মূল্য দিই। সেই প্রসঙ্গেই আপনার কাছে আসা। কম্পিউটার সোসাইটির মিঃ শ্রীনিবাসন আপনার কথা রেকমেণ্ড করেছেন আমাদের ডিপার্টমেণ্টকে। আপনাকে লেখা একটা চিঠিও আছে।"

গোলকদা চিঠিটায় একঝলক চোখ বুলিয়ে বললেন, "ঠিক আছে। বলুন মিঃ জামকর, কীভাবে আপনাকে সাহায্য করতে পারি। আপনাদের কফি চলবে।"

'না। ধন্যবাদ, আমরা ডিউটিতে আছি। ব্যাপারটা সংক্ষেপে বলি। আমাদের কাছে গোপন খবর ছিল, মিঃ ঢনঢনিয়া ইমপোর্ট-এক্সপোর্ট, কাস্টমস ডিউটি অ্যাক্ট, ফরেন এক্সচেঞ্জ কণ্ট্রোল ইত্যাদির আইনকানুন ভেঙে 'হাওয়ালা' অর্থাৎ বেআইনি লেনদেনেনের ব্যবসা চালান। আজ ভোর থেকে আমাদের টিম ওঁর বাড়ি আর অফিসে তল্লাসি চালিয়েও কোন সূত্র খুঁজে পায়নি, কারণ ওর হিসেবপত্র সব কিছুই দেখছি কম্পিউটারাইজ্‌ড। আমাদের সঙ্গে একজন কম্পিউটার-এক্সপার্টও এসেছেন, এই মিঃ প্রধান। ইনিই বলবেন সমস্যাটা কী বা আপনার থেকে কী সাহায্য আমরা চাইছি।"

লম্বা-চওড়া ভদ্রলোকটি এবার গোলকদার দিকে তাকিয়ে মাথা নেড়ে ছোট্ট 'নড' করে বললেন, "মিঃ রাহা, আপনার কথা অনেক শুনেছি। কম্পিউটার ক্রাইম ও সিকিউরিটি সিস্টেমের ওপর আপনার বিখ্যাত প্রবন্ধগুলোও আমার চোখে পড়েছে। আমাদের পদ্ধতিমতো নানা চেষ্টা চালিয়েও এই ঢনঢনিয়ার কম্পিউটার কোডগুলো আমরা উদ্ধার করতে পারছি না। যার ফলে ওঁর কম্পিউটারে রাখা গোপন সূত্রগুলোর নাগালও পাওয়া যাচ্ছে না। আমাদের সব চেষ্টা বিফল হওয়ার পরই আপনার কাছে আসা।"

"দেখুন, মিঃ জামকর, অন্যের প্রাইভেসিতে নাক গলানোটা কতটা প্রতিবেশীসুলভ কাজ হবে, সেটা আমি বুঝতে পারছি না।"

"মিঃ ঢনঢনিয়ার কার্যকলাপগুলো যে বেআইনি সে-ব্যাপারে কোনও প্রমাণ আমাকে দেখাতে পারেন?"

দুই ভদ্রলোক মুখ চাওয়াচাওয়ি করেন। একটু চুপ করে থেকে সোনালি চশমা বললেন, "জোরালো সন্দেহ আছে। গোপনসূত্রে পাওয়া কিছু তথ্য আছে। কিন্তু সেগুলো তো গ্রেডেড ইনফরমেশন, মানে গোপনীয়, তা তো আপনাকে, মানে পাবলিকের কাউকেই দেখানোর আদেশ নেই।"

গোলোকদা ঠাণ্ডা গলায় বললেন, "আপনার অফিস ম্যানুয়াল কী বলছে, সে-ব্যাপারে আমার মাথাব্যথা নেই। কিন্তু শুধুমাত্র মৌখিক সন্দেহের ওপর ভিত্তি করে আমি কারও অধিকার ডাঙায় সাহায্য করতে পারব না। দুঃখিত। মিঃ শ্রীনিবাসনকে বলবেন, উনি বুঝবেন। উনি আমাকে চেনেন।"

সোনালি চশমার ফরসা মুখ টাক অবধি লাল হয়ে উঠল। হাত দুটোর আঙুল শক্ত করে সোফার হাতলে হাত রেখে বললেন, "কিন্তু মিঃ রাহা, সরকারকে সাহায্য করাটাও কী আপনার কর্তব্য নয়?"

"সেটা কী কাজে সাহায্য করছি, তার ওপর নির্ভর করছে।" গোলোকদা উঠে দাঁড়ান। ইঙ্গিতটা স্পষ্ট। গোলকদার দিকে বেশ কয়েক সেকেণ্ড তাকিয়ে থেকে সোনালি চশমা যেন হার মেনে; চোখ সরিয়ে লম্বা-চওড়ার দিকে চেয়ে একটু মাথা হেলালেন। উনি আবার আড়চোখে আমাদের দিকে দৃষ্টি ফেললেন। মুখে একটু বিব্রত হাসি।

গোলোকদা বসতে বসতে বললেন, "ওরা সবাই আমার কম্পিউটার ক্লাবের খুদে রহস্য। আমার সহকারী দলও বলতে পারেন। যা বলার স্বচ্ছন্দে বলুন।"

ততক্ষণে গর্বে আমাদের বুকটুক ফুলে উঠেছে। একজন অন্যকে ঠেলাঠেলি করে নিঃশব্দে মজাটা ভাগ করে নিচ্ছি। ইতিমধ্যে লম্বা ভদ্রলোকটি গোলকদার পাশে উঠে গিয়ে দু-একটা ফোটো আর কাগজপত্র দেখাতে শুরু করেছেন আর কথা বলছেন ফিস ফিস করে। তাঁর ভাবভঙ্গি দেখে আমরা বেশ মজা পাচ্ছিলাম। তা ছাড়া গোলোকদার কাছে সোনালি চশমা একটু 'টাইট' হওয়ায়, আমাদের খুশি চেপে রাখা যাচ্ছিল না।

"আমি এতে মাথা গলাতে চাইতাম না," গোলকদা সোনালি চশমা-র দিকে চেয়ে বলেন "তবে ব্যাপারটার মধ্যে প্রবলেম সলভিংয়ের চ্যালেঞ্জ আছে। সেটা আমাকে টানছে। শোনা যাক আমাদের কথা।"

দুই মূর্তির মুখে তখন হাঁপ-ছাড়া হাসি। মিঃ প্রধান বললেন, "এই ঢনঢনিয়া ও'র পি. সিগুলোতে যে পাসওয়ার্ড, মানে গোপন সঙ্কেত দিয়ে রেখেছেন সেটা না জানলে তো আমরা

কিছুতেই পি. সি-র মেমোরিতে রাখা ফাইলগুলো আর সেই ফাইলে লুকনো হিসেবনিকেশ, সূত্র বা তথ্য কিছুই পড়তে পারছি না। সাধারণত এই সঙ্কেতগুলো লোকে নিজের বা আত্মীয়দের নাম, ডাকনাম, জন্মতারিখ, গাড়ির নম্বর, ব্যাঙ্কের অ্যাকাউণ্ট নম্বর, ইনশিওরেন্স পলিসি নম্বর, ফ্ল্যাটের নম্বর ইত্যাদি একান্ত ব্যক্তিগত তথ্য দিয়ে তৈরি করে রাখে। কিন্তু এই ঢনঢনিয়া গভীর জলের মাছ। আমরা ওর নাড়িনক্ষত্র তোলপাড় করে দেখার চেস্টা করছি, এমনকি, ওর পোষা কুকুরের নামও। কিন্তু সবটাই পণ্ডশ্রম।"

মিঃ ঢনঢনিয়াকে আমি পাড়ায় দেখেছি। একটা মারুতি—ওয়ান থাউজেণ্ড নিয়ে চলাফেরা করেন। অতিশয় ভদ্র। একবার ওঁর গাড়িতে লিফটও দিয়েছিলেন, মনে পড়ছে। খুব পানের মশলা খান। কম্পিউটার নিয়ে কিছু কথা বলছিলেন। ইমপোর্ট-এক্সপোর্টের ব্যবসার কথাও। হরদম বিদেশ যান শুনেছি। ঠিক ?"

"ঠিক। এ ছাড়াও ওঁর সম্বন্ধে অনেক তথ্য আমাদের কাছে আছে। ওঁর ডেসিয়ারটা পাঠিয়ে দিচ্ছি। দেখতে পারেন। ঢনঢনিয়ার কম্পিটারগুলো আমরা সিজ করে নিয়ে এসেছি, সেটাও দেখতে পারেন যখন খুশি।"

"না। পাসওয়ার্ড জানার জন্য তার দরকার পড়বে বলে মনে হয় না। তবে আমাকে কিছু সময় দিতে হবে। আপনারা উঠেছেন কোথায় ?"

"আমাদের পুরো টিমটাই উঠেছি হোটেলে। ফোন নম্বর রইল। আমরা অপেক্ষা করে থাকব। যা-যা দরকার জানাবেন। বুঝতেই পারছেন ব্যাপারটা বড় জরুরি আর গুরুত্বপূর্ণ। এর একটা হিল্লে হলে গভর্নমেণ্টের তরফ থেকে আপনার প্রচুর ধন্যবাদ এবং অবশাই কিছু ক্যাশ পুরস্কারের ব্যবস্থা করা হবে।"

"তার কোনও প্রয়োজন হবে না। কথাটা মিঃ শ্রীনিবাসনের প্রতি আমার শুভেচ্ছার নিদর্শন হিসেবে ধরে নেবেন।"

যুগল-মূর্তি বিদায় নিলে, গোলকদা বললেন, "তাই তো হে। ব্যাপারটা নিয়ে ভাবতে হচ্ছে,

নিরুপম ঢনঢনিয়া
হাইটেক্ ফান্দি নিয়া
রেখেছেন ডিস্কে পি. সি'র
লুকনো হিসেব কষি
যত দুই নম্বরিয়া।

গোলোকদার মুখে তৈরি লিমেরিক বা ধাঁধাঁ বা কুটকবিতা মানেই ওঁর মেজাজ শরিফ। দেখেছি মনের মতো সমস্যার সন্ধ্যান পেলেই ওঁর মনের স্ফূর্তিটা জমে ওঠে, তখন ওঁর কথাবার্তা

ভাবভঙ্গি সবই শোনার আর দেখার মতো হয়ে ওঠে। "তা তোমাদের লোকাল রেকর্ড বুক, ভার্সন জিরো ওয়ান, এই মিঃ ঢনঢনিয়া সম্বন্ধে কী বলছে ?" গোলোকদা আমাদের দিকে তাকিয়ে বলেন।

এর একটু ছোট্ট ইতিহাস আছে। 'লিমকা' বা 'গিনেল' বুক অব রেকর্ডস নিয়ে আমাদের মাতামাতি দেখে গোলোকদা একদিন বলেছিলেন, "চোখের সামনে অনেক কিছু দেখেও আমি দেখি না। আমাদের পাড়াতেই কত বিস্ময়কর ব্যাপার রয়েছে তার খোঁজ না রাখাটা কোন কাজের কথা নয়।"

সেই সূত্রেই আমরা জানতে পেরেছি, অনেক অবাক-করা খবর। যেমন আমাদের পাড়ার সবচেয়ে লম্বা লোক হচ্ছেন পাক্কা ছ'ফুট চার ইঞ্চি ইনসিওরেন্স এজেন্ট দেবাশিস রায়, কিন্তু তাঁর বাবা অবিনাশবাবু, মাত্র পাঁচ ফুট এক ইঞ্চি লম্বা। আমাদের পাড়াতেই এক খেয়ালি ভদ্রলোক আছেন, যিনি হাওয়াই গিটারকে স্প্যানিশ করে সরোদের কায়দায় দারুন সেতার বাজান, দূর থেকে শুনলে ম্যান্ডোলিন মনে হয়। আর এক ভদ্রলোক আছেন যিনি দামি হোটেলের মোগলাই শেফ, মাইনে পান নাকি ত্রিশ হাজার টাকা। তিনি নাকি এক হোটেল থেকে চাকরি ছেড়ে অন্য হোটেলে যাওয়ার সময় ষোলজন সহকর্মীর দলটাকেও সঙ্গে নিয়ে যান। নতুন চাকরিতে যোগ দেওয়ার সেটাও নাকি শর্ত। এ ছাড়া আমাদের পাড়াতেই আছেন মহিম মিত্রমশাই, যাঁর পায়রা পোষার শখ নাকি সারা ভারতে সুবিদিত। তাঁর কাছে লক্কা, মুখ্খি, নোটন, রেশমি, সিরাজি, গুলি, অপরাজিতা, গোরারাজ ইত্যাদি দেশি পায়রা থেকে শুরু করে আর্কেজেল, লার্ব মডেনা, ব্লিন্ডনেট, রাণ্ট ইত্যাদি বিলিতি পায়রা প্রায় দেড় হাজারটি আছে। আমরা তাঁর বাড়ির ছাদে গিয়ে দেখে এসেছি, জলভরা গামলা ছাদের মাঝখানে রেখে মিত্রমশাই গেরোবাজদের উড়িয়ে দিয়েছেন আর ওদের ছায়া ঘুরে ঘুরে ঠিক গামলার জলের মধ্যেই ফিরে আসছে। ওর কাছেই বিলিতি হোমিং পিজিয়ন দেখেছি, যে নাকি ৫০০ মাইল দূর থেকেও বাড়ি ফিরে আসে ঘণ্টায় ৪০ মাইল বেগে। এসব তথ্য জোগাড় হওয়ার পর, গোলকদাই বলেছেন সবকিছু একটা ছকে ফেলে, নিয়ম অনুযায়ী সাজিয়ে গুছিয়ে তুলে রাখতে। গোলোকদা'র ভাষায় এটা হল 'লোকাল রেকর্ড বুক, ভার্সন জিরো ওয়ান, সমস্তটাই একটা ফ্লপি ডিস্কে এণ্ট্রি করে ঢোকানো আছে। গোলোকদা বলেছিলেন জিনিসটা কাজে লাগতেও পারে।

আজ সেই কাজে লাগার দিন। তীর্থ ডিস্কটা পি. সি-তে ঢুকিয়ে কম্পিউটারের পরদায় চোখ রেখে ঝানু রিপোর্টারের ভঙ্গিতে বলিতে থাকে, "নিরুপম ঢনঢনিয়া। ঠিকানা ঃ আশাবরী অ্যাপার্টমেণ্ট, ফোর বাই থ্রি নং অফিস ঃ কুইন'স ম্যানসন, পার্ক স্টিট। বয়স ঃ ৪০/৪২। চেহারা ঃ হ্যাণ্ডসাম, ড্যাশিং। পেশা ঃ ব্যবসা। ইয়ার্ন আর টেক্সটাইলের এক্সপোর্টার। শিক্ষা ঃ বি. কম. কম্পিউটার ঃ পরিবারের সদস্য ঃ স্ত্রী রেখা। ওই এক ছেলে, ডাকনাম পাম্পু, ভাল নাম অভিষেক। বৈশিষ্ট্য ঃ বহুদেশ ভ্রমণ করেছেন। বেশ কটা ভাষা জানেন বলে দাবি। প্রমাণ নেই। তবে ভাল ইংরেজি ও বাংলা জানেন।

গোলোকদা চুপ করে শুনছিলেন। বললেন, "হোটেলে ফোন করে মিঃ জামকরকে চাও তো।"

"মিঃ জামকর, দুটো জিনিস পাঠান এক্ষুনি। আপনারা হানা দেওয়ার পর মিঃ ঢনঢনিয়ার বাড়ি ও অফিসে যা-যা পাওয়া গেছে তার একটা তালিকা, আপনারা যাকে বলেন 'ইনভেনটরি লিস্ট'। আর, ওঁর ব্যাঙ্কের বেনামে বা স্বনামে লকারগুলো সিজ করা হয়েছে তো? গুড। এবার প্রত্যেকটা লকারের পাসওয়ার্ডগুলো আমার চাই। ব্যাঙ্কে খোঁজ করলেই পাবেন।"

আধঘণ্টার মধ্যে এক চটপটে ভদ্রলোক গোলোকদার হাতে জিনিসগুলো পৌঁছে দিয়ে গেলেন। আমরা উঁকি মেরে দেখি একগোছা কাগজে টাইপ-করা লিস্ট, তাতে ২৭৪টা আইটেম। প্রথম আইটেমটা ৫১ ইঞ্চি কালার টি. ভি আর শেষটা চিনেমাটির ফ্লাওয়ার ভাস। অন্য একচিলতে কাগজে ব্যাঙ্কের পাঁচটা লকারের নম্বর আর পরিষ্কার হাতে লেখা পাঁচটি ইংরেজি শব্দ ঃ

Enemy, Panel, Analog, Reign. Spruey. গোলোকদা খুব মন দিয়ে আট-দশ পাতার লিস্টটা খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে পড়লেন। নোট নিলেন। এবার আবার ফোন তুলে বললেন, "মিঃ জামকর, ইনভেনটরি লিস্টে দেখছি বুকস অ্যান্ড পিরিয়ডিক্যালস, টোয়েন্টি নাম্বার্স। এগুলো স্কুলের টেক্সট বইটই নয় তো? তা হলে বইগুলোর নাম চাই।" আমাদের দিকে ফিরে, "পাঁড় ব্যবসায়ীর বাড়িতে কুড়িটা বই! ভাবনার কথা।" দশ মিনিটের মধ্যে ফোন এল। "শুধুই টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রির ট্রেড জার্নাল? পনেরোটাই? বাকিগুলো? তিনটে? আর? আশ্চর্য তো। নাম বলুন, নাম বলুন," গোলোকদা দ্রুত হাতে নোট নেন।

এর পর গোলোকদা ওঁর পি. সি-তে গিয়ে বসলেন। ইংরেজি শব্দ পাঁচটা টাইপ করেন। কী একটা প্রোগ্রাম চালান।

আবার ফোন তোলেন, "মিঃ ঢনঢনিয়ার পাসপোর্ট-টাসপোর্ট থেকে উনি কোন-কোন দেশে ঘুরেছেন তার নামগুলো পাওয়া যাবে? বেশ, বলুন। দাঁড়ান, দাঁড়ান, মিলিয়ে দেখুন তো ইয়েমেন, নেপাল, অ্যাঙ্গোলা, নাইজার, সাইপ্রাস এসব আছে? ওঃ, নেপাল ছাড়া সবকটা আছে? আচ্ছা, আচ্ছা, নেপাল যেতে তো পাসপোর্ট লাগে না। চমৎকার! মিলে যাচ্ছে? কেমন করে বুঝলাম? অ্যালগরিদ্‌ম বোঝেন? মানে যুক্তির সূত্র। সেই অ্যালগরিদ্‌ম দিয়ে। যাক, বাকি দেশগুলোর নাম বলুন তো। হুঁ, বতসোয়ানা, সুরিনাম, সিঙ্গাপুর, ইউ. এস. এ, দুবাই, কাতার, সুদান, আলজিরিয়া। ব্যস? ঠিক আছে। এবার একটু মিঃ প্রধানকে ফোনটা দিন না। মিঃ প্রধান? পাসওয়ার্ডটার ক'টা অক্ষর হবে মনে হয়? পাঁচটা থেকে আটটা? ভেরি গুড।"

এবার গোলোকদা আবার পি, সি-র সামনে বসেন। কিছুক্ষণ কি-বোর্ড নাড়াচাড়া করে, আবার টেলিফোন। কানেকশন না হওয়ায় ওঁর বিরক্তিটা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। লাইন পেতেই বললেন, "এইটা ট্রাই করে দেখুন তো, এস. ডব্লিউ. এ. এন. বি. ও. এ. টি—সোয়ানবোট। হাঁ সোয়ানবোট।"

আমরা হতবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম। মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। সোয়ানবোট? সেটা আবার কী? 'রাজহংস তরণী'? তার মানে? এটাই কি ঢনঢনিয়াজির গুপ্ত পাসওয়ার্ড?

তাই যদি হবে তবে, গোলোকদা সেটা এখানে বসে-বসে, ঢনঢনিয়াজির কম্পিউটারে একবার চোখও না বুলিয়ে খুঁজে বের করলেন কী করে ?

গোলোকদা নির্বিকার মুখে বললেন, "অবাক হচ্ছ ? এর নাম গোলোকট্রিক। গোলোকট্রিক শক্ !"

পঁচিশ মিনিটের মধ্যে, গাড়ি থামার শব্দ, দরজা খোলা ও বন্ধের শব্দ আর দু'জোড়া পায়ের দ্রুত আওয়াজ শুনে তাকিয়ে দেখি, মিঃ জামকর ও মিঃ প্রধান প্রায় দৌড়ে-দৌড়েই ঢুকছেন। মিঃ জামকর গোলোকদার হাত দুটো জড়িয়ে ধরে বললেন, "এ কি ম্যাজিক ? আপনি জাদুকর ? দিস ইজ উইচ-ক্রাফ্ট ইন ব্রড ডে-লাইট। অবিশ্বাস্য ! আপনি তো ঢনঢনিয়ার কম্পিউটারে হাতও লাগাননি !

একগাল হাসি হেসে মিঃ প্রধান বললেন, "আমরা ঢনঢনিয়ার কম্পিউটারের ডিস্ক সিল করে দিয়েছি। গোটা ডিস্কের কপিও নিয়ে নিয়েছি। এবার দিল্লি গিয়ে ধীরেসুস্থে ওর নাড়ির খবর সব টেনে বের করব। এবার একেবারে হাতেনাতে ধরা পড়ে গেছে।"

মিঃ জামকর বললেন, "আমরা আপনার কাছে কৃতজ্ঞ। এটা একটা মস্ত ব্রেক-থ্রু। ঢনঢনিয়া একটা নাটের গুরু। ডিপার্টমেন্ট খুব খুশি হবে। সরকার আপনাকে অ্যাপ্রিসিয়েশন পাঠাবে। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে আমার তরফ থেকে…"

গোলোকদা হাতের একটা ছোট্ট ভঙ্গি আর চোখের দৃষ্টিতে তাকে থামিয়ে দেন, তাঁর ভঙ্গিতে এমন একটা কিছু ছিল মুখে কিছুই বলতে হল না। মিঃ জামকর অপ্রস্তুত হয়ে থেমে গেলেন। আমাদের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে বললেন, "কিন্তু আপনার, মানে, কীভাবে আপনি রহস্যভেদ করলেন, যদি…"

"না। সেটা আমার প্রফেশন্যাল সিক্রেট ! আশা করি মার্জনা করবেন ! তবে একটা ছোট্ট সূত্র দিচ্ছি, 'অ্যানাগ্রাম'।"

কথাটা শুনে মিঃ জামকরের মুখটা একটু ফাঁক হয়ে গেল, সঙ্গে-সঙ্গে সেটা উনি সামলে নিলেন, কিন্তু মিঃ প্রধানের ফ্যালফ্যালে চাউনিটা ল্যাম্পপোস্টে আটকানো কাটা ঘুড়ির মতো তাঁর মুখে লটকে রইল।

গাড়ির আওয়াজ মিলিয়ে যেতে আমরা গোলোকদাকে ঘিরে ধরলাম হইহই করে। "আমরা কিন্তু ছাড়ছি না। ওসব সিক্রেট-টিক্রেট বুঝি না। বুঝিয়ে বলুন।"

গোলোকদা বলেন, "স্রেফ অ্যালগরিদ্‌ম। ঢনঢনিয়ার বাড়িতে অ্যানাগ্রাম প্যালিনড্রোম-এর দু-দুটো ইংরেজি বই পাওয়া গেছে শুনে আমার প্রথম সন্দেহ হয়। সে পড়ুয়া লোক নয় বোঝাই যায়, তাই এরকম স্পেশালাইজড বই তার কাছে থাকাটা একটু খটকা লাগায়। তারপর ব্যাঙ্কের লকারের পাসওয়ার্ডগুলো ভাল করে দেখেই বুঝি এগুলো অ্যানাগ্রাম করা শব্দ, কারণ একটার সঙ্গে অন্যটার কোনও লজিক্যাল মিলই নেই।"

"অ্যানাগ্রাম মানে একটা শব্দের অক্ষরগুলোকে অন্যভাবে সাজিয়ে নতুন শব্দ তৈরি করার খেলা। যেমন ঢনঢনিয়াজির ব্যাঙ্ক লকারের পাসওয়ার্ডগুলোই ধরা যাক ঃ

Enemy-এর অ্যানাগ্রাম Yemen

Panel-এর Nepal

Analog-এর Augoia

Reign-এর Niger

Sprucy-এর Cyprus

"বুঝতেই পারছ প্রতিটা এক-একটা দেশের নাম। আমার কম্পিউটারের তথ্যভাণ্ডার আবার জানাল এইসব ক'টা দেশই টেক্সটাইল ইমপোর্ট করে। ঢনঢনিয়াজি যা এক্সপোর্ট করেন। দুয়ে-দুরে চার। ব্যাঙ্কের পাসওয়ার্ডে যিনি দেশের নাম ব্যবহার করেছেন, অন্যত্রও একই লজিক ব্যবহার করবেন এটাই স্বাভাবিক। আবার দেশের নাম খুঁজতে গিয়ে ঢনঢনিয়াজিকে অন্ধকারে হাতড়াতে হবে না কারণ উনি প্রচুর টুর করেন। যে দেশে গেছেন, সেই দেশের নাম মনে পড়াই স্বাভাবিক। ওঁর পাসপোর্ট থেকে বাকি দেশগুলির নাম পাওয়া গেল। পাসওয়ার্ডটা পাঁচ থেকে আট অক্ষরের। তাই আট অক্ষরের Betswana-কেই বেছে নিলাম, এর কোনও অ্যানাগ্রাম হয় কি না পরীক্ষা করে দেখতে। আমার কম্পিউটার মুহূর্তের মধ্যে তা করে দিল—SWANBOAT। আর এটাই দেখা গেল শেষ পর্যন্ত ঢনঢনিয়াজির লুকনো কম্পিউটার পাসওয়ার্ডে হয়ে দাঁড়াল।"

"আর প্যালিনড্রোম ?" সাগরনীলের জিজ্ঞাসা।

"প্যালিনড্রোম মানে শব্দের ফেরতাই। অবশ্য এর সঙ্গে ঢনঢনিয়াজির পাসওয়ার্ডের সম্পর্ক নেই। এটাও এক ধরণের শব্দের খেলা। যেমন ধরো, ইভের সঙ্গে প্রথম দেখা হওয়ার পর আদম বলল, 'Madam I'm adam'। উত্তরে ইভ শুধু একটা কথা বলল, 'Eve'। দুটোই প্যালিড্রোমের উদাহরণ, উল্টোদিক থেকে পড়ো, দ্যাখো ঠিক একই বাক্য বা শব্দ। আরও শুনবে ? 'থাক রবি কবির কথা।"

"আমি একটা জানি," বুবাই বলে, "বেনে তেল সলতে নেবে।" আমার দাদু শিখিয়েছেন।"

"বাঃ। ভারী সুন্দর তো।" গোলোকদার উচ্ছ্বাস।

আমাদের কথাবার্তার মধ্যে ধবধবে আলিগড়ি পাজামা আর মোটা কলারের কুর্তা পরা, হাতে পানমসলার কৌটো, ধারালো চেহারার যে ভদ্রলোকটি দরজায় দাঁড়িয়ে, তিনিই যে স্বয়ং নিরুপম ঢনঢনিয়া, তা বুঝতে সময় লাগল না।

"নমস্কার। আপনিই ভো গোলোকধান্ধাজি ? আমার নাম নিরুপম ঢনঢনিয়া। আসতে পারি ?"

সর্বনাশ! ধাঁধাঁর ভক্ত গোলোকদাকে পাড়ার কিশোর মহল যে গোলকধাঁধাঁ বলে আড়ালে ডাকে, ইনি তা জানলেন কী করে ? পাম্পুর কাছে শুনেছেন ?

"আসুন, আমার নাম গোলকবিজয় রাহা। ছোটদের ভালবাসায় দেওয়া দারুণ জুতসই নামও ধেড়েদের মুখে বেমানান শোনায়।"

বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে ঢনঢনিয়াজি ভেতরে ঢুকলেন। হাতজোড় করে বললেন, "আমি আপনার প্রতিবেশী। শুনলাম আই. টি. ডিপার্টমেন্টের আদমিরা আপনার কাছে এসেছিল। ওরা আমার কম্পিউটার নিয়ে চলে গেল। শুনলাম আমার পাসওয়ার্ড ওরা খুঁজে পেয়েছে। আমি জানতে এলাম। এতে আপনার কোনও হাঁথ আছে কি না।"

"হ্যাঁ," গোলোকদা বলেন, "আমার হাত আছে। আমিই আপনার অ্যানাগ্রাম করা পাসওয়ার্ড খুঁজে বার করেছি।"

"ইউ আর এ ডার্লিং মিঃ রাহা। অ্যান্ড এ জিনিয়াস টু। আপনার নামডাক আমি শুনেছিলাম। তাপনি সফট ওয়্যার উইজার্ড। কিন্তু আমার পাসওয়ার্ডটা ধরলেন কী করে?"

"ভেরি ইজি। আপনার ব্যাঙ্কের লকারগুলোতে কী-কী পাসওয়ার্ড দিয়েছিলেন মনে আছে?"

"ওহ্। যাকগে। আমার কোনও ক্ষতি এতে হবে না। আমার ল-ইয়াররা আমার সিজ করা অ্যাকাউন্ট আর লকারগুলো সব ফেরত আনার বন্দোবস্ত করবে কাল থেকেই। ডিপার্টমেন্ট ওর কাজ করল। আমি আমার কাজ করব।"

"কিন্তু, আপনার সব সিক্রেট ইনফরমেশন তো ওদের হাতে।"

"ওঃ, ইউ আর সাচ এ ডার্লিং মিঃ রাহা। এই সুইট ইনোসেন্ট ডার্লিং! আপনি সত্যি ভাবছেন আমার ডিস্কে সিক্রেট ইনফরমেশন কিছু আমি রেখেছিলাম? হ্যাভেন্ট আই ওয়াইপড্ ইন ক্লিন? লাইক এ ক্লিনশেভ্ড হেড। ন্যাড়া মাথার মতো পরিষ্কার করে দিয়েছিলাম, বুঝলেন। দেন আই পুট টন্স অব গার্বেজ ইনটু ইট। মানে যত্তসব আবোলতাবোল জঞ্জাল, অর্থহীন ডেটা ঢুকিয়ে রেখেছিলাম ডিস্কে। ওদের আমি বিলকুল বুদ্ধু বানিয়ে দিলাম। ওরা মিথ্যে পাসওয়ার্ড নিয়ে মাথা ঘামাল, আমি অনেক সময় পেলাম। মূল্যবান সময়। সেটা আমি কাজে লাগালাম।"

গোলোকদা ঢনঢনিয়াজিকে থামিয়ে দেন, "তার মানে আপনি জানতেন আজ আপনার বাড়ি বা অফিসে রেইড হবে?"

"নিশ্চয়ই।"

"আপত্তি না থাকলে বলবেন কিভাবে?"

"আরত্তির কিছু নেই। সিমপল ডিডাকশান। বোম্বাই, মাদ্রাজ, দিল্লিতে কিছুদিন আগেই রেইড হয়েছে। একসাথ বিশ-তিশ জায়গায়। এবার নিশ্চয়ই বাঙ্গালোর, কলকাতা, ইত্যাদির পালা। তাই অ্যালার্ট ছিলাম। এইসব রেইড একসঙ্গে এত জায়গায় হয় যে, লোকাল স্টাফে কুলোয় না। তা ছাড়া এতবড় তোড়জোড় লোকাল অফিস থেকে করলে ইনফরমেশন লিক হয়ে যেতে পারে। তাই

ওরা অন্য শহর, স্পেশ্যালি দিল্লি থেকে অফিসার নিয়ে আসে। এই অনুমানের ওপর আমার আদমি হোটেলে খোঁজ রাখছিল একসাথ বিশ-তিশ আদমি ব্লক বুকিং করছে কি না। তা ছাড়া এয়ারপোর্টেও আমার আদমি ছিল। দিল্লী ফ্লাইটের ওপর নজর রাখার জন্য। সেখান থেকে খবর পেলাম কাল সাতাইশ আদমির পার্টি ইভনিং ফ্লাইটে কলকত্তা নামল, ব্যস।"

গোলোকদা তারিফ করার গলায় বললেন, "বাঃ, চমৎকার অ্যালগরিদ্‌ম।"

"আপনি আমার মাথা খাটিয়ে বের করা পাসওয়ার্ড ধরে ফেলেছেন। তার মানে আপনার মাথা খুব সাফ। আমি এলাম আপনাকে বন্ধু বানাতে। আপনি আমার কম্পিউটার কনসালট্যাণ্ট বনে যান। অব কোর্স, আপনার ঠিকঠাক ফিজ্‌ আমি দিতে রাজি। এনি অ্যামাউণ্ট। আমার নাম N. Dhandhania'র অ্যানাগ্রাম কী হয় জানেন তো? A hand-in-hand. তাই আপনার হাঁথে হাঁথ মেলাতে এলাম।" বলে একটা হাত গোলোকদার দিকে বাড়িয়ে দেন ঢলঢনিয়াজি।

গোলোকদা হাতটা বাড়িয়ে দেন, "অতি বুদ্ধিমান প্রতিবেশীর সঙ্গে হাত মেলাতে কারও আপত্তি হওয়ার কথা নয়। কিন্তু আপনার আরও একটা পরিচয়ও যে আমি জেনেছি। আপনি ট্যাক্স ফাঁকি দেন, ডিউটি ফাঁকি দেন, চোরাই লেনদেন, জালিয়াতি করেন, আপনার টাকা কামানোর আসল উপায়-গুলো সবই বেআইনি। আপনার হাতে তাই অনেক ময়লা।" গোলোকদা পকেট থেকে রুমাল বের করে ডান হাতটা মুছতে মুছতে বলেন, "আমার এই হাতটা তাই ভাল করে মুছে নেওয়ার দরকার।"

ঢরঢনিয়াজি ধীরেসুস্থে কোটো খুলে পরপর তিন চামচ পানের মসলা মুখে ফেললেন, "আমি বিজনেসম্যান। ইনসাল্ট আমরা গায় মাখি না। আমার অফারটা কিন্তু স্ট্যাণ্ড করছে। আপনি রাজি খুশি থাকলে আপনারও লাভ, আমারও। কথাটা কিন্তু ভেবে দেখবেন। চললাম, নমস্কার।"

"দাঁড়ান।" গোলোকদা ধারালো গলায় বলেন, "আমার কথাটাও তা হলে শুনে যান। আপনার প্রস্তাবটার জন্য ধন্যবাদ। কিন্তু গোলোকবিজয় রাহা যে কোনও চুক্তিতে কাজ করে না সেটা না জেনে প্রস্তাবটা করা আপনার ঠিক হয়নি। কোন কাজটা আমি নেব, সেটা আমিই ঠিক করি, অন্যে নয়। তা ছাড়া যে কম্পিউটারে আপনি আপনার উলটাফুলটা'র হিসেব কষবেন, সেটা যে আমি বাঁ হাত দিয়েও ছোঁব না, সেটা আপনার বোঝা উচিত ছিল। পাড়ায় যখন থাকি, আবার নিশ্চয়ই দেখা হবে, তবে তার জন্য আমি যে খুব উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করব তা বললে ভুল হবে। আসুন। নমস্কার।"

"ওয়েল, ওয়েল" বলে কাঁধ ঝাঁকালেন মিঃ ঢনঢনিয়া, "অ্যাজ ইউ প্লিজ, মাই ডার্লিং' আপনার মর্জি।" বলতে-বলতে উনি বেরিয়ে যান।

ঠিক সেই সময় পাড়ার একটা নেড়ি কুকুর বাইরে ঘেউ-ঘেউ করে ডেকে উঠল।



একটি টিকিটের সূত্রে

শিবায়ন ঘোষ



শেষ পর্যন্ত রবি পুলিশে চাকরি পেল। অথচ চাকরির আগে পর্যন্ত ও বলত 'পুলিশের চাকরিতে আমি নেই, ভাই। দরকার হলে কালুমুদির দোকানের দাঁড়িপাল্লায় বসে তেল, নুন, ডাল, পোস্ত, চিনি মাপতেও রাজি আছি।"

এই বাল্যবন্ধুটার স্বভাবচরিত্র আমাদের আদ্যোপান্ত জানা। একে খুব নরম মনের ছেলে, মজবুত শরীর-স্বাস্থ্য নিয়েও কেমন যেন কুঁকড়ে থাকে, তার ওপর ওর বাবা স্কুলের শিক্ষক। কাজেই ওর স্বপ্ন থাকতেই পারে অধ্যাপনা করার। অথচ হল উলটো। দেখা গেল, এক ঝকঝকে শরতের সকালে রবি হুট করে কলকাতায় চলল পুলিশের চাকরি করতে।

আমরা তো, যাকে বলে, একদম হাঁ হয়ে গেলাম।

বছর ছয়েক পরে ফিরে এসে রবি অন্যরকম ভাষায় বলতে শুরু করল, "আসলে কী জানিস, বাঁচার জন্যে একটা কিছু তো করতে হবেই, একটু তো লেখাপড়া শিখেছি। নিছক কালুমুদির দোকানে তো আর বসতে পারি না, তাই।"

আমরা মজা করে বলতাম, "শেষে না আবার খুন দেখে মূর্ছা যাস, দেখিস। তুই তো আবার ভয় পেলে কুঁকড়ে কেন্নো হয়ে যাস।"

কথাটা বোধ হয় রবির গায়ে লাগল। ও বলল, "এখন আর আমি আগের রবি নেই। যে চাকরির যা শর্ত। আসলে আমাদের ট্রেনিংটা বড্ড কড়া। সাধারণ লোককেও পুলিশ করে দেয়। আর তা ছাড়া, খাকি পোশাকটার একটা মন্ত্রশক্তি আছে।"

"গায়ে চড়ালেই মেজাজ চড়ে, তাই না ?"

বড় ভাল বলল কথাটা শিশির।

নৌকোর পাটাতনে বসে প্রতিদিনের মতো বিকেলের আড্ডা চলছিল আমাদের। সবাই তো গ্রামছুট। পুজোর ছুটিতে এই যা কয়েকদিনের জন্য বন্ধুদের দেখাসাক্ষাৎ। তাও পুজোর ছুটির অনেক আগে থেকে বন্ধুদের মধ্যে চিঠি-চালাচালি হয়। শেষ অবধি দেখা যায় তবুও দু-একজন এসে পৌঁছয় না। যেমন, এবারে অনিমেষ এল না। গত বছর আমিও আসিনি।

তো পুজোয় এসে যে ক'দিন থাকি তার রোজ বিকেলটা এই নদীর ধারে ছিপ নৌকোগুলির ওপরে বসে গল্পে-গানে কাটাই। সুখ, দুঃখ, চাকরিবাকরি নিয়ে কথাবার্তা হয়।

একমাত্র রবি ছাড়া আমরা বিশাল কেরানিকুলের এক-একজন। সেদিক থেকে আমাদের চোখে ওর চাকরির একটা আলাদা মেজাজ, তেজ, গাম্ভীর্য ও রহস্য আছে।

কথাটা আমিই তুললাম। বললাম, "আচ্ছা রবি, তোদের চাকরিতে তো অনেক রহস্য, রোমাঞ্চ, খুন- রাহাজানি, লুটতরাজ, ডাকাতি আছে?"

রবি চট করে কথাটা গায়ে মেখে নিয়ে বলল, "অনেক, অনেক। শুনলে স্তম্ভিত হয়ে যাবি। এখন চাকরিটায় আমি বেশ মজা পাই। এমন এক-একটা ঘটনা ঘটে, শুনলে তোদের দম বন্ধ হয়ে যাবে। এই তো কয়েকদিন আগেই একটা অদ্ভুত খুনের তদন্ত করলাম।"

রবিকে এতক্ষণে ঠিক জায়গায় পৌঁছে দিতে পেরে আমি নিজেকে নিজেই বাহবা দিচ্ছি। শিশির গল্পের গন্ধ পেয়ে চোখ নাচাল। পরিতোষ ও গৌতম টানটান হয়ে উঠে বসল।

রবি এখন চায়ের বদলে কফি খায়। সবাই চা আর কফির কাপে চুমুক দিচ্ছি। রবি বলল, "পুলিশকে ছোট ভাববি না।"

"উঁহু, কাগজে লেখে বটে একটু আধটু—"

সেই মুখফোঁড় শিশির। আমার হাতের কড়া একটা চিমটি খেয়ে বলল, "দুঃখিত! সরি ফর ইন্টারুপশন!"

গৌতম উৎসাহ দিতে রবি বলল, "পুলিশ পারে না এমন কাজ নেই। হঠাৎ একটা তদন্তের ভার মাথায় চেপে বসলে প্রথম একটু বিরক্তির বোঝা মনে হয়, কিন্তু এগোতে-এগোতে যখন অদ্ভুত একটা কিনারা পাওয়া যায়, তখন যে কত আনন্দ! শোন, আমার এই ছোট্ট চাকরি জীবনের সেরা একটা তদন্তের কথা বলি।

"এটা ধর অক্টোবর, সেটা হচ্ছে চোদ্দই আগস্ট। সারারাত ডিউটি করে ক্লান্ত, চোখ টেনে আসছে ঘুম। থানায় ফিরে ভাবছি, কোয়ার্টারে গিয়ে স্নানটান করে একপ্রস্থ নাক ডাকিয়ে ঘুম দেব। ঠিক এমনই সময়ে টেলিফোন বেজে উঠল।

"রিসিভার কানে দিয়ে চমকে উঠলাম।

"হ্যালো? হ্যা, কী বলছেন? বাবু সেন? বাবু সেন খুন হয়েছেন? আশ্চর্য? কী নাম বললেন? হ্যাঁ, আপনার নাম? হ্যাঁ, ক্ষুর দিয়ে কাটা মনে হচ্ছে?"

"নামটা বলল না।"

"চটপট বেরোতে হল। দু'জন কনস্টেবল নিয়ে জিপ ছুটল বুবু সেনের বাড়ি। কাছেই। ভাল কথা, বুবু সেন সম্বন্ধে তোদের দু-চার কথা বলা দরকার।

বাবু সেন হচ্ছেন ওখানকার নামী ক্লাবের সেক্রেটারি, তার ওপর অত্যন্ত প্রভাবশালী যুবক। বুঝতেই পারছিস, কী কঠিন দায়িত্ব এসে পড়ল হুড়মুড় করে, কাঁধের ওপরে। আমি ঠিক তাল পাচ্ছি না।"

পরিতোষের মধ্যে চাঞ্চল্য, পরের রহস্যের জন্য। গল্পের গন্ধ পেয়ে শিশির, গৌতম নড়েচড়ে বসল, আর আমি বলতে গেলে উদ্যোক্তা। বললাম, "তারপর ?"

"হুঁ, তারপরটাই আসল।"

বলে, রবি যেন এই এখনই তদন্তে এসেছে এমনভাবে বলল, "বাবু সেনের ঘরের বাইরে অনেক লোক। কলেজ, স্কুলের ছেলেমেয়েরাও ভিড় করে আছে। জোর স্লোগান চলছে, 'বাবু সেনের খুনি। পাকড়াও এক্ষুনি' ইত্যাদি।

"এই সময় পুলিশের নুয়ে পড়লে চলে না। আমি বেশ কঠিন হয়ে আছি। ভিড় কাটিয়ে ঘরে ঢুকলাম। মেঝেতে পড়ে আছেন বাবু সেন। উপুড় হয়ে, গায়ে কোনও জামা নেই, পরনে পাজামা। হাত দুটি দু'দিকে ছড়ানো। আমার নির্দেশে এক কনস্টেবল দেহটা বন্দুকের কুঁদো দিয়ে চিত করে দিতেই, বুকটা কী বলব, ছ্যাঁত করে উঠল। ভীষণ, মর্ম্মন্তুদ দৃশ্য। পেট থেকে নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে গেছে। জমাট বেঁধে গেছে রক্ত। ইঞ্চি আটেক তো হবেই। ধারালো ছুরি দিয়ে আড়া-আড়ি পেটের এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত চিরে দিয়েছে। কী নির্মম! মুখে বাঁধা বাবু সেনের পাশ-বালিশের ওয়াড়। বোঝা যায়, ছুরি মারার পরেও খুনি ওর ওপর প্রাণপণ শক্তিতে চেপে বসে ছিল, তেমন নড়াচড়া করতে দেয়নি! নইলে রক্তটা মেঝেতে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ত। কাজ শেষ করে তবেই খুনি পালিয়েছে।"

"বলিসনি, বলিসনি, আমার কেমন বমি-বমি পাচ্ছে, রক্ত আমি একদম চোখে দেখতে পারি না।"

গৌতম কথাটা বলামাত্র, পরিতোষ কনুইয়ের গুঁতো দিয়ে বলল, "উঠে যা, তোর থেকে কাজ নেই! তবু তো গল্প শুনছিস, সত্যি-সত্যি হলে যে কী করতিস!

খোঁচা খেয়ে গৌতম চুপ হয়ে গেল।

রবি বলতে শুরু করল, "অর্থাৎ, একটা ব্যাপার নিয়ে আমাদের সন্দেহ রইল না। এটা বোঝা গেল যে পরিষ্কার একটা খুন, এটা কোনও আত্মহত্যা নয়। তারপর তো যা হয়ে থাকে। ফরেনসিক রিপোর্টের জন্য অনেক কিছু নেওয়া হল। লাশটা পাঠানো হল মর্গে। মর্গের গুমোটে মর্গের আর কী!"

রবির মধ্যে এখনও কবিতার চোরা ঢেউটা একটু-আধটু আছে, তা বোঝা গেল।

রবি খুব বেশি কফি খায় এখন। বোধ হয় টেনশনে থাকলেই বেশি খায়। ও কফির কাপে চুমুক দিয়ে বলল, "শেষে মুশকিল হল তদন্তে। কোনওভাবেই খুনের কিনারা পাওয়া যাচ্ছে না। ওপর থেকে বারবার ফোন আসছে তদন্তের ফলাফল জানতে চেয়ে। আর ওখানকার আর-এক যুবক পলু মিত্তিরের নেতৃত্বে প্রায় রোজ রুটিনমাফিক থানা ঘেরাও হচ্ছে, বুবু সেনের হত্যাকারীকে ধরার জন্যে চাপ দিয়ে। চিন্তা কর, পুলিশের চাকরির কী সাঙ্ঘাতিক হ্যাপা!"

বর্ষায় তখন নদীতে ইলিশ ধরা চলছে। আমাদের খুব কাছেই ইলিশের জালে অনেক ইলিশ আটকেছে দেখে, শিশির বলল, "দ্যাখ, দ্যাখ, কী সুন্দর সব ইলিশ, আঃ, ডিম আর তেল খেতে যা লাগবে না?"

শিশির কথার মধ্যে বড্ড কথা বলে। একটা প্রসঙ্গে কথা হচ্ছে, ও হঠাৎ করে আর-একটা প্রসঙ্গ এনে মূল সুরটাই কেটে দেয়।

রবিও হয়েছে তেমন! কোথায় হবে বাংলার অধ্যাপক, হয়ে বসল পুলিশ। সেও শিশিরের কথায় তাল দিয়ে বলল, "জলের রুপোলি আকাঙ্ক্ষা।"

আমি আর পরিতোষ আবার রবিকে কবিতার ভাবরাজ্য থেকে তদন্তের রাজ্যে টেনে নামালাম।

আমি বললাম, "তারপর কী হল, সেইটে বল। শেষ পর্যন্ত ধরতে পারলি?"

"না ধরে উপায় আছে? তবে ভাগ্যের জোরে।"

"তোরা ভাগ্যটাগ্য মানিস?"

এটি পরিতোষের গলা। গলাটা আমারও হতে পারত। আসলে রবি একটু নাস্তিক গোছের। বন্ধুরা মজা করে বলি 'হাফ-নাস্তিক', 'ওয়ান-থার্ড আস্তিক'—এইরকম। এমনিতে ভূত, ভগবান, ভাগ্য-ভবিষ্যৎ সেরকম মানে না, কিন্তু ঘোরতর বিপদে পড়লে বা আশঙ্কা করলে চুপিচুপি মন্দিরে গিয়ে গড় হয়ে আসে। পরীক্ষা দিতে যাওয়ার আগে শ্বেতবেড়েলার মূল-শেকড় ডান হাতের অনামিকায় পরে নেয়। স্বভাবতই যে বন্ধুর নাড়ি-নক্ষত্র আমাদের জানা আছে, তার সম্বন্ধে এরকম প্রশ্ন করা যেতেই পারে।

রবি কথাটার পাশ কাটাল। বলল, "ভাগ্য মানে ঠিক তোরা যে-ভাগ্য ভাবছিস, সেরকম নয়। তোদের বোঝার সুবিধে হবে বলে ভাগ্য কথাটা ব্যবহার করলাম।"

বলে, বেশ উত্তর দিতে পারা গেছে ভেবে নিজে একটু মুচকি-মুচকি হেসে নিল। এবং তারপর বলতে শুরু করল বাকি ঘটনাটা।

অনেক খুনের ঘটনা বইয়ে পড়েছি বটে, কিন্তু এটি হচ্ছে একদম নতুন।

বুবু সেনের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল পলু মিত্তির। বুবু সেন সেক্রেটারি, তো পলু মিত্তির

ক্যাশিয়ার। একজনকে ছাড়া অন্যের চলে না। দু'জনেই বেকার। দু'জনের মধ্যেই অদ্ভুত বনিবনা। বললে কিংবদন্তি মনে হবে।

দু'জনে হঠাৎ কী খেয়ালে লটারির টিকিট কাটল। কথা রইল, যার টিকিটেই লাগুক, দু'জনে আধাআধি ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নেবে।

বিড়ালের ভাগ্যেও শিকে তো ছেঁড়ে, অতীতে কখনও নিশ্চয়ই ছিঁড়েছিল, অন্তত একবারও, নইলে কথাটা চালু হত না। তো সেরকম কতকটা কাকতালীয় ভাবে দেখা গেল, পলু মিত্তিরের টিকিটে লটারির প্রথম পুরস্কার পাঁচ লাখ টাকা লেগে গেল। ট্যাক্স ফ্যাক্স বাদ দিলেও লাখতিনেক থাকবে। অর্থাৎ পলু দেড় লাখ, বুবু সেন দেড় লাখ।

কী আনন্দ তখন দু'জনের। এতদিনের দীর্ঘ বেকারত্ব ঘুচল। দিনে অন্তত বার দশ-বারো শলাপরামর্শ হচ্ছে, কী করবে টাকা দিয়ে! পলু মিত্তির প্রস্তাব দিল, "স্রেফ ব্যবসা! ভাবছি, শিলিগুড়ির দিকে একটা কাপড়ের দোকান খুলব, পাইকারি। ওখানে আমার বড় মেসো থাকে। দোকান-টোকান পাওয়া কঠিন হবে না।"

"এই কয়টা টাকায় পাইকারি ব্যবসা? তোর মাথা খারাপ?"

বুবু সেন উৎসাহ দিচ্ছে না।

"আরে বাবা, মাথা আমার খুব সাফ। তিন লাখ টাকা মূলধন হিসেবে লগ্নি করলে, বড়বাজারে এমন ব্যবসায়ী আছে, তোকে দশ লাখ টাকার কাপড় দেবে। তিন লাখ ক্যাশ থাকলে, আরও সাত লাখ বিশ্বাস কেনা যায়।"

চোখেমুখে আনন্দ ফুটে উঠল বুবু সেনের। বলল, "বেশ তো, তুই কাল-পরশুর মধ্যে শিলিগুড়ি রওনা হয়ে যা, আমি বড়বাজারে যোগাযোগ করছি।"

যেদিন এ-কথা হল, তার দিন দুয়েকের মধ্যেই খুন হয়ে গেলেন বুবু সেন, অর্থাৎ ওদের দুই প্রাণের বন্ধুর স্বপ্ন সত্যি হল না।

এমনকী কাজটা অনেকদূর এগিয়ে গিয়েছিল পর্যন্ত। নিউজলপাইগুড়ি রেল স্টেশনের পোস্ট অফিসের সিলমোহর নিয়ে বুবু সেনের নামে একটা চিঠিও এল। তাতে লেখা ঃ

প্রিয় বুবু,

তোর কথামতো শিলিগুড়ির এদিকে এসে একটা ভাল দোকানের খোঁজ পেয়েছি, বড়-মেসো খুব উৎসাহ দিচ্ছেন। দোকানটা চলবে বলেই বিশ্বাস। তুই কথাবার্তা বলে পাকা ব্যবস্থা করে রাখিস। আমি দু-একদিনের মধ্যেই ফিরছি। ভাল থাকিস। ব্যস্ত আছি। শুভেচ্ছা।

পুলিশ যে পুলিশ, সেও আফসোস করল চিঠিটা পেয়ে। ইস্, দুটো বন্ধুর এত সুন্দর একটা স্বপ্ন এভাবে মাটি হয়ে গেল।

বাকি কথা শোনা যাক রবির নিজের মুখে, নিজের ভাষায়।

"আমি তখন উঠেপড়ে লেগেছি। ঘুম নেই, খাওয়া নেই। আর-সব ফাইল একপাশে করে বাবু সেনের কেস নিয়ে সময় কাটছে। একটিই প্রশ্ন। কে খুন করল? কে আততায়ী? উদ্দেশ্যই বা কী? বিশেষ করে পৃথিবীতে যার এখনও ভালমতো শত্রু তৈরী হওয়ারই বয়স হয়নি?

"সঞ্জয় বসুকে ধরে আনা হল। গত বছর ক্লাবের নির্বাচনে বাবু সেনের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। এ-বছর নির্বাচনের আগেই তাঁর পথের কাঁটা সাফ করতে তাঁর ছোরা নিয়ে ফুঁসে উঠতেই পারে।

"কিন্তু লাভ হল না। সঞ্জয় বসু বেশ দৃঢ়তার সঙ্গে জানালেন, 'এসব ভুল সন্দেহ দারোগাবাবু, হাজার হোক, বাবু তো আমারও বন্ধু, ক্লাস নাইন পর্যন্ত একই স্কুলে পড়েছি। ভেতরে আমাদের কখনও অমিল নেই। ওর জণ্ডিস হলে আমিই বিছানার কাছে কাটিয়েছি।"

"টেলিফোন করেছিলেন কেন?"

"কাকে দারোগাবাবু?"

"চোপ! গলা চিনতে পারিনি ভাবছেন?"

"আমি টেলিফোন করিনি! নেভার। টেলিফোন—টেলিফোন—এসব কী বলছেন?

"সঞ্জয় বসু প্রায় কেঁদেই ফেললেন। ছলছল চোখ, কাঁদো-কাঁদো মুখ। এমনকী, বাবু সেনের মা এবং বাবাও একযোগে জানালেন, "সঞ্জু আমাদের ছেলের মতন, ওকে অপদস্থ করবেন না।"

"বেশ, আপনার কাকে সন্দেহ হয়?"

"সঞ্জয় বসু চুপ করে থাকলেন।"

"বলুন শির্গাগির?"

"কাউকেই না।" সঞ্জয় বসু খুব স্পষ্ট করে উত্তর দিলেন।

"মাথায় অবশ্য আমাদের অনেক নাম ছিল। তাদের প্রত্যেককেই জেরা করা হল। বিশেষ করে, নটরাজ টোবাকো ফ্যাক্টরির মালিক নিত্যগোপাল পালকে পাকড়ে আনা হল। লোকটার নাকি অনেক কাঁচা টাকা আছে। লোকমুখে প্রকাশ, পলু মিত্তির টিকিটে টাকা পাওয়ার পর কালো টাকাটাকে সাদা করার জন্য প্রিমিয়াম দিয়ে টিকিটটা কিনতে চেয়েছিল। পলু রাজি ছিল, কিন্তু বাবু সেন আদর্শের প্রশ্ন তুলে নাকচ করে দেয়। তার পক্ষে রাগবশত কিছু করে থাকা সম্ভব।

"কিন্তু সেটিও মিস-ফায়ার। সেও শোনামাত্র ভয়ে যাকে বলে হকচকিয়ে গেল। কপালে হাত ঠেকিয়ে প্রণাম করে বলল, 'এ অধমের কাজ আমাকে দিয়ে হতে পারবে না দারোগাবাবু। বাবু সেন আমাকে যে কাকাবাবু বলে ডাকত!'

"অর্থাৎ সুবিধে হল না।"

"ইতিমধ্যে ফরেনসিক রিপোর্ট এল, জানা কথা, কী থাকতে পারে। চেনা পরিচিত কারও সম্বন্ধে কোনও হদিস মিলছে না।

"চোখে তখন আমার ঘুম নেই। রাতগুলি কাটছে যেন দিন।"

"হঠাৎ একদিন দুপুরের পর, মানে খুনের দিন ছয়েকের মাথায় জেল সদর থেকে খবর এল, শিলিগুড়ি থেকে নাকি রেডিয়োগ্রামে বার্তা এসেছে, পলু মিত্তির সম্বন্ধে বিস্তারিত খোঁজখবর নিতে। প্রয়োজনে আমাকে নির্দেশ দেওয়া হল, ওর বাড়ি সার্চ করতে।

"দ্যাখ, ঘটনা কোনদিকে গড়ায়। সার্চ করা হল প্রায় তখনই। কিন্তু কিছু নেই! নো ক্লু!"

"কিন্তু পলু মিত্তিরকে সার্চ করা হল কী ব্যাপারে?"

শিশির উৎসাহিত, আমিও। আমরা সবাই।

রবি রহস্য খেলিয়ে বলল, "আছে, আছে। রিজন হ্যাজ।"

বলেই ফের জানাল, "প্রথমেই যা করলাম, শুনলে অবাক হয়ে যাবি? হঠাৎ আমার মাথায় একটা খটকা লাগল। তখুনিই শিলিগুড়ির সঙ্গে যোগাযোগ করলাম! জানালাম, 'হ্যালো, সার্চ তো বিফল হয়ে গেল। নো রেজাল্ট! আমাকে নিশিকান্তের ঠিকানাটা দিন।'

"লিখুন কেয়ার অব সম্রাট সেলুন?"

"সম্রাট সেলুন?"

"ভাল শোনা যাচ্ছিল না, আমি আবার প্রশ্ন করলাম। 'সেলুন? মানে···'

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, চুল-দাড়ি কাটে যে সেলুনে!"

ও-প্রান্তের উত্তর পাওয়ার পর, বাকি আর কিছু শুনিনি পর্যন্ত। সঙ্গে-সঙ্গে একাই জিপ হাঁকড়ে হাজির হলাম সম্রাট সেলুনে। নিশিকান্ত ধাড়া ওখানকার বয়স্ক কর্মচারী। কথামতো মেয়ের বিয়ের পাত্র দেখতে দিন কয়েক ছুটি নিয়ে মুর্শিদাবাদ গেছে।

"সেলুনের মালিককে জেরা করলাম। বললাম, 'বলতে পারেন, নিশিকান্ত ক'টা ক্ষুর ব্যবহার করত?'

'সেলুনের মালিক চোখ বড় করে বলল, 'দাঁড়ান দারোগাবাবু, এক মিনিট।'

"বলে, সেলুনের মালিক নয়ন পাত্র ডাক দিল, 'মদনা আছিস? হেই মদনা?'

"রোগামতো কমবয়সী একটা ছেলে এসে ভয়ে-ভয়ে নমস্কার করে দাঁড়াল।

"আমাকে কিছুই বলতে হল না, নয়ন পাত্রই বলল, 'নিশিকান্তর ক'টা ক্ষুর পাওয়া যাচ্ছে না?"

'নতুনটা।'

'আমি উঠছি নয়নবাবু। একটু কষ্ট দিলাম। পরে আপনাকে দরকার হতে পারে, আর হ্যাঁ ওই ছেলেটিকে থাকতে বলবেন।'

'তা হলে তুই বলছিস, খুনটা নিশিকান্তই করেছে?'

'হান্ড্রেড পারসেন্ট। তোদের বোধ হয় মনে আছে, প্রথম যখন টেলিফোনে বাবু সেনের খুনের খবর পাই, তখন ও-প্রান্তের লোকটি 'ক্ষুর দিয়ে কাটা হয়েছে' বলে সন্দেহ করেছিল।'

"হুঁ, তাই তো।"

গৌতম এতক্ষণে একটা কথা বলল।

পরিতোষ মজা করল, "বোবা কথা বলছে, আহা রে!"

শিশির পরিতোষকে থামিয়ে দিয়ে বলল, "কিন্তু নিশিকান্ত যে খুন করেছে, কারণ কী?"

"দাঁড়াও পথিকবর! জন্ম যদি তব বঙ্গে। বলছি, অধৈর্য হোয়ো না।

"নিউজলপাইগুড়ি রেল স্টেশনে সেদিন টিকিটের জোর চেকিং হচ্ছে দুর্নীতির নানা অভিযোগে।

"চেকারের হাতে টিকিট দিয়ে প্রায় গেট পেরিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল সম্রাট সেলুনের বয়স্ক কর্মচারী নিশিকান্ত ধাড়া, কিন্তু টিকিটের দিকে এক পলক দেখেই চেকার খপ করে ওর হাত পাকড়ে ধরল। শুধু তাই নয়, সোজা শ্রীঘরে। টিকিটে বয়স লেখা ছাব্বিশ, অথচ নিশিকান্তের বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি।

"জেরার উত্তরে ফাঁস করে দেয়, সে আসলে পলু মিত্তিরের কাছ থেকে টিকিটটা নিয়েছিল।

"শিলিগুড়ি পুলিশের তখন আনন্দ অনেক। এই বুঝি জাল টিকিট-চক্রের খোঁজ পেয়েছে তারা। আর তখনই তো জেলা সদরে রেডিয়োগ্রামে খবর পাঠিয়ে পলু মিত্তিরের বাড়ি রেইড করতে বলল।"

রবি একটু থামতেই আমরা চারজন প্রায় সমস্বরে বললাম, "তারপর কী হল? খুনটা কে করেছে? পলু মিত্তির, না নিশিকান্ত?"

"ধীরে বৎস, ধীরে।"

একটু থেমে বলল রবি, "পলু মিত্তিরও তো প্রভাবশালী। তাকে গ্রেফতার করতে হলে পুলিশের নিঃসন্দেহ হওয়া দরকার। টিকিটটা একটা বড় সূত্র, কিন্তু একমাত্র নয়।"

"কেন, কেন?"

"পলু মিত্তির যে চিঠিটা লিখেছে শিলিগুড়ি থেকে। সেটিও একটা রেলেভেন্ট ডকুমেন্ট। একজন লোক মেটেরিয়াল টাইমে এখানে এবং শিলিগুড়িতে তো আর থাকতে পারে না!"

সবাই আমরা হকচকিয়ে গেলাম, তাও তো বটে! এটা একটা কথা।

শেষে রবিই বলল, "তো হ্যাঁ, পালটা রেডিয়োগ্রাম করে শিলিগুড়িতে খোঁজ নিয়ে জানা গেল, পলু মিত্তিরের মেসোর সঙ্গে পলু মিত্তিরের দেখাই হয়নি। অর্থাৎ, পলু মিত্তির কাছাকাছি কোথাও আত্মগোপন করে ছিল।

"আমি তখন সময় নষ্ট না করে, একদম বুকের কাছে রিভলভার তাক করে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললাম, 'হুঁ, এতদিনে একজন আসল বন্ধু চেনা গেল।

"পলু মিত্তিরও খুব জনপ্রিয়। সেও অনেক লোককে ঘোল খাইয়েছে এ পর্যন্ত। একটুও দমে

গেল না, বাজের শব্দ বলে বোমার শব্দ উড়িয়ে দিতে পারে। পালটা ধমক দিয়ে বলল, 'এটা অন্যায়, নিছক সন্দেহবশত কাউকে গ্রেফতার করার অর্থ তার সাংবিধানিক অধিকারে হস্তক্ষেপ করা। নো মিস্টার দারোগা, কোর্টে নির্দোষ প্রমাণিত হয়ে ফিরে এলে, ফলটা টের পাবেন।'

"ইয়েস, আই নো দ্যাট। আপাতত···।'

"রিভলভার তেমনই তাক করা, আমি চোখের মুদ্রায় জিপটা দেখালাম।"

"সত্যি চমকপ্রদ ব্যাপার।"

আবার সেই শিশিরের মন্তব্য। পরিতোষ ওকে একটু ধমকের সুরে বলল, "ফুট কাটবি না।"

রবি বেশ পরিতৃপ্তির হাসি হেসে বলল, "আরও কী আশ্চর্য দ্যাখ, নিশিকান্তকে সার্চ করে যা-যা পাওয়া গেল, তার তালিকাও করা হল। পুলিশ ওকে ডাকাতও ভেবেছিল।"

আমাদের প্রশ্ন করার আগেই বলল, "ঝকঝকে তাজা কারখানার গন্ধে ভরপুর প্রায় হাজার চব্বিশ টাকা পাওয়া গেল নিশিকান্তের কাছ থেকে।"

"রিয়েলি ?"

এবার কিন্তু আমিই বলে ফেললাম।

"কোথাকার টাকা জানিস ?"

"ব্যাঙ্ক-ডাকাতির ?"

"সত্যি ? তোরা হতাশ করলি, তোরা ওই যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ, লসাগু গসাগু করগে যা। একটুও যদি খুপরিতে কিছু থাকে ?"

রবি কার্যত আমাদের সবাইকে এক পাল্লায় ওজন করে ফেলল। তারপর বলল, "লটারির টাকা। পলু মিস্তিরের টাকার সিরিয়াল নম্বর আর নিশিকান্তের কাছে পাওয়া টাকার সিরিয়াল নম্বর ক্রম-অনুযায়ী। ব্যস, গ্রেট সাকসেস। পুলিশকে বোকা বানানোর জন্যে নিজের নামের টিকিটটা দিয়ে নিশিকান্তের মতো গবেটকে ট্রেনে চাপিয়ে দিয়েছে, আবার একটা চিঠিও লিখে দিয়েছে বুবু সেনের নামে। বেচারা নিশিকান্ত! কথামতো ট্রেন থেকে নেমেই চিঠিটা পোস্টও করেছিল, কিন্তু তাড়া-হুড়ো করে বেরোতে গিয়ে বিপদ ঘটাল।"

"তুই হলে কী করতিস ?"

শিশির নয়, এবারে মৌনমুখর সেই গৌতম বলল।

"আমি হলে টিকিট না দিয়ে অন্য একটা ট্রেনে চেপে ঘুরে বেড়াতাম, পকেটে টাকা আছেই। কোনও এক কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার গিয়ে নামতাম।"

"চমৎকার ফন্দি করেছিল, যা হোক!"

"হুঁ, উদ্ভাবনী ক্ষমতা বটে! ভাল পথে লাগালে নোবেল পুরস্কার পেয়ে যেত।"

যথাক্রমে শিশিরের এবং আমার কথা দুটোকে টেনে নিয়ে রবি বলল, "এমনি-এমনি কি আর হয় ?

গাড্ডায় পড়তে হয়। তখন মগজের কোষগুলো বেশি সক্রিয় হয়ে ওঠে। আবার কী জানিস, কয়েকদিন আগে পলু মিত্তির বেশ আচ্ছা করে বাবু-ছাঁট দিয়ে এসেছে চুলে। কেটেছে ওই নিশিকান্ত। বেচারার মেয়ের বিয়ে হচ্ছে না, হাজার হোক বাবা তো!"

নদীর জল ভাটার টানে অনেক নীচে নেমে গেছে। নৌকো আটকে গেছে পলিতে। চাদের হালকা আলো পড়েছে জলে। এখন ডাঙায় উঠতে আমাদের চটিজুতো হাতে দিতে হবে।

যে-যার মতন পাড়ে উঠেছি, পরিতোষ প্রশ্ন করল, "সত্যি, এখন বল, চাকরিটা কেমন লাগছে?"

"ভেরি থ্রিলিং। কালকে আর-একটা ঘটনা বলব, সেটাও প্রায় এরই কাছাকাছি জটিল। পুলিশে ঢুকে এখন বুঝছি, এ-চাকরিতে একটা চ্যালেঞ্জ আছে। একজন ক্রিমিন্যালের সন্ধ্যান পেলে যে কেমন আনন্দ হয়, কী বলব? এখন তো আমি কোনও কঠিন তদন্ত পেলে খুব খুলি হই, বেশ খোরাক হয়। আগ বাড়িয়ে টেনে নিই হাতে। চাকরি বলিস, জীবন বলিস, চ্যালেঞ্জ, শুধু চ্যালেঞ্জ।"



গোগোলের কেরামতি

সমরেশ বসু



গোগোল সেবার অল্প কয়েকদিনের জন্য মধুপুরে বেড়াতে গিয়েছিল। পুজোর ছুটির সময় মা কোথাও বেড়াতে যাওয়া পছন্দ করেন না। না করার দুটো কারণ! এক ঃ দুর্গাপুজোর সময় বাঙলা দেশের বাইরে যাওয়ার কোন মানে হয় না। প্রবাসী বাঙালীদের পুজো ভালই হয়। তবু বাঙলাদেশে শরৎকালে দুর্গাপুজোর চেহারাই আলাদা। দুই ঃ পুজোর ছুটির পরে স্কুল খুলেই, এক সপ্তাহের মধ্যে শুরু হয়ে যায় গোগোলের অ্যানুয়াল পরীক্ষা। সেজন্য পুজোর ছুটিতে পড়াশোনার চাপ থাকে।

গোগোল সেবারে মধুপুর গিয়েছিল লক্ষ্মী পুজোর পরে। মাত্র পাঁচ দিনের জন্য। মা প্রথমে যেতে রাজি হন নি। রাজি না হওয়ার কারণ, গোগোলের পরীক্ষার পড়ার ক্ষতি হবে। কিন্তু যাঁরা নিমন্ত্রণ করেছিলেন, তাঁদের কথা বাবা মা কেউ ঠেলতে পারেননি। যাঁরা বলতে, বিশেষ করে তারকনাথ দত্ত। বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে তাদের বাড়ি। মস্ত বড়লোক। তাঁর বিরাট পৈতৃক ব্যবসা আছে। কি ব্যবসা, কিসের ব্যবসা, গোগোল তা জানে না। তবে, বাবা মা'র সঙ্গে তারকনাথ দত্তর বাড়ি দু-একবার বেড়াতে গিয়েছে। যেমন বিশাল বাড়ি, তেমনি সবই বিশাল। বিশেষ করে খাওয়া। তারকনাথ দত্ত সবাইকে খাওয়াতে ভালবাসেন। আর নানারকমের খাবার রান্নার তদারকি তিনি নিজে করেন। তাঁর বাড়িতে রোজই অভ্যাগতের ভিড়।

গোগোল বুঝে নিয়েছে, তারকবাবু আসলে ঐ বিশাল বাড়িতে খুবই একা। তাঁর একমাত্র ছেলে গোগোলের মায়ের বয়সী হবেন। তিনি থাকেন এলাহাবাদে শ্বশুর বাড়িতে। আর তাঁর একমাত্র ছেলে থাকেন আমেরিকায়। বাড়িতে আছে এক গাদা কাজের মানুষ। দূর সম্পর্কের কয়েকজন মহিলা

আত্মীয়া। সেই জন্যই, তিনি মনের মতো মানুষ খুঁজে, বাড়িতে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে যান, তাদের সঙ্গে গল্প গুজব করে, খাইয়ে দাইয়ে, সময় তাঁর ভালই কাটে।

তারকনাথ দত্ত গোগোলের বাবার থেকে অনেক বড়। বাবা মা তারকবাবুকে কাকা বলে ডাকেন। নিজের ছেলে মেয়ের মতোই ভালবাসেন। আর গোগোলকে ডাকেন, 'ডিটেকটিভ দাদু' বলে।

গোগোল অনেকবার শুনেছে, মধুপুরে তারকনাথ দত্তের বিরাট বাড়ি আর বাগান আছে। সে বাগানের গোলাপের নাকি তুলনা নেই। মধুপুর থেকে প্রচুর গোলাপ কলকাতায়ও আসে। তারকনাথ বাবা মা'কে অনেকবার বলেছেন, 'তোমরা আমার মধুপুরের বাড়ি বেড়িয়ে এস। সেখানে তোমাদের কোন অসুবিধা হবে না। দেখাশোনা আর রান্না করার লোকজন আছে। খাবে দাবে বেড়াবে ঘুমোবে। আমি খুব খুশি হব।

সেই নিমন্ত্রণে কিছুতেই যাওয়া হচ্ছিল না। শেষ পর্যন্ত তারকনাথ নিজেই মধুপুরে যাবেন বলে স্থির করলেন, আর বাবা মা'কে বললেন, 'এবার আমার সঙ্গে যেতে হবে। আমার ডিটেকটিভ দাদুও যাবে। আমি কোন কথা শুনতে চাইনে। যেতে এক রাত্রি, আসতে এক রাত্রি। বেশীদিন নয়, পাঁচ দিন ওখানে থাকব। পাঁচদিনে আমার ডিটেকটিভ দাদুর পড়া না হলেও, ও ঠিক পাস করবে।'

বাবা মা সেবার আর তাঁর কথা ঠেলতে পারেন নি।

তারকনাথ দত্তর মধুপুরের বাহান্ন বিঘা এলাকায়, বাড়িটা কেবল বড় না। বাড়ি আর বাগান, সব মিলিয়ে, যেন একটা নন্দনপুরী। বিরাট বাগানে বোধহয় হাজার খানেক গোলাপ গাছ আছে। নানা রকমের গোলাপ। তাছাড়া ছিল, ঝাউ পাইন আর ইউক্যালিপটাপ গাছ। মাধবী বিতান যুঁইয়ের কেয়ারি। দোতলা বাড়িতে যে কতগুলো ঘর আছে, গোগোল গুনে উঠতে পারেনি। সামনের দিকে ফুলের বাগান। পিছনে ফলের গাছ আম জাম পেয়ারা আর আতা। তাছাড়া আছে মস্ত একটা গোয়াল। অনেকগুলো দুধের গাভী। রোজ প্রচুর দুধ হয়। খাবার লোক নেই, বিক্রি করে দেওয়া হয়।

বাড়ীর ভিতরে চৌহদ্দির মধ্যে আছে বিরাট একটা ইঁদারা। তার সঙ্গে পাইপ দিয়ে পাম্প সেটে জল তোলা হয় ওপরের ট্যাঙ্কে। ভারি মিষ্টি জল। খেতে ভাল, আর খেলেই হজম হয়ে যায়। সব শোবার ঘরের সঙ্গেই বাথরুম। আর খাওয়া? রোজই যেন যজ্ঞি বাড়ির রান্না। মাছ, মুরগী বাগেড়ি পাখি, ছানা পায়েস, রসমালাই যত খুশি খাও।

গোগোলের এত খাওয়া পছন্দ নয়। প্রথম দিন সকালে পৌঁছে, ওর একটুও ঘুম পেল না। বাড়ি, বাগান, ছাদ, সব জায়গায় ঘুরে ঘুরে বেড়াল। দুপুরের খাবার পরে, গোগোল ঘুমিয়ে পড়েছিল। কিন্তু মাত্র এক ঘণ্টার জন্য। উঠে দেখল, বাবা মা অঘোরে ঘুমোচ্ছেন।

গোগোল উঠে পড়ল! তারকনাথ নীচের একটা ঘরে ছিলেন। ও নীচে নেমে এসে, তাঁর ঘরে উঁকি দিয়ে দেখল, তিনি গড়গড়ায় তামাক টানছেন ইজি চেয়ারে বসে। আর খবরের কাগজ পড়ছেন মনোযোগ দিয়ে। কাজের লোকদের কোন সাড়া শব্দ নেই। বোধহয় তারাও এখন ঘুমোচ্ছে।

গোগোল বাগানে বেরিয়ে এল। বাগান থেকে বাইরে যাবার বড় গেটটা বন্ধ। একটা ছোট দরজা আছে, লোহার ঘোরানো দরজা। গরু বাছুর ঢুকতে পারে না। গোগোল সেই দরজা দিয়ে রাস্তার ধারে এসে দাঁড়াল।

বাহান্ন বিঘার লাল কাঁকর মাটির শক্ত রাস্তা, দুপুরে খা খা করছে। গাছে গাছে পাখিরা ডাকছে। কাঠ বেড়ালীরা হুটোপাটি খেলছে। কখনও উঠে যাচ্ছে বড় বড় গাছের মগডালে। আবার কখনও নেমে আসছে নীচে। ওরা যে কী খুটে খুটে খাচ্ছে, গোগোল বুঝতে পারছে না। গোটা রাস্তায় লোক নেই। কেবল একটু দূরে, গাছের নীচে ছায়ায় দাঁড়িয়েছিল একটা টাঙা। ঘোড়াটা মাথা নীচু করে, কাঠের পাত্র থেকে মুখ নামিয়ে খাবার খাচ্ছিল। টাঙাওয়ালা শুয়েছিল টাঙার ওপরেই।

গোগোল ডাইনে বাঁয়ে তাকাল। দেখল, বাঁ দিকের একটা রাস্তা থেকে, একটি মোষের গাড়ি বেরিয়ে, বড় রাস্তা পেরিয়ে, অন্য রাস্তায় ঢুকে গেল। বোঝা গেল, গাড়িটা যে দিকে গেল, সেদিকে কোন গ্রাম আছে। গোগোল পায়ে পায়ে সেদিকে গেল। দু'পাশেই বাড়ি। আর সব বাড়ির সামনেই বাগান। গোগোল মোড় অবধি গিয়ে দাঁড়াল। দেখল মোষের গাড়িটা যেদিকে যাচ্ছে, সেদিকটা ঢালু হয়ে নেমে গিয়েছে। খোলা জমিতে গরু মোষ চরছে।

গোগোল হঠাৎ দেখল, একজন যেন মাটি ফুঁড়ে ওর সামনে এসে দাঁড়াল। মাথায় বড় বড় কালো চুল। মুখটা কালো গোঁফ দাঁড়িতে ভরা। চোখে চশমা। পাজামা আর পাঞ্জাবী ময়লা মত। পায়ে কোলাপুরী চপ্পল। বয়স ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। দেখে শুনে ভদ্রলোকই মনে হয়। বাঙালী কি অবাঙালী, তা বোঝবার উপায় নেই। ভদ্রলোক চুরোট টানছেন। গোগোল অবাক চোখে ভদ্রলোকের দিকে তাকাল। ভদ্রলোক পরিষ্কার বাংলায় জিজ্ঞেস করলেন, 'তারকনাথ দত্তের বাড়িটা কোথায় বলতে পার খোকা?'

গোগোল অবাক হয়ে, বাড়িটার দিকে হাত তুলে দেখিয়ে বলল, 'ঐ তো, ঐ বিরাট বাগানওলা বড় দোতলা বাড়িটা। আপনি তারকবাবুকে খুঁজছেন?' 'না।' ভদ্রলোক গোঁফ দাড়ির ফাঁকে হাসলেন। 'আমি একটি ছেলেকে খুঁজছি। সেই ছেলেটি একবার রাজধানী এক্সপ্রেসে একটা হত্যার ব্যাপারে আমার বন্ধুকে ধরিয়ে দিয়েছিল ঃ খুব ডাকসাঁইটে ছেলে, নাম গোগোল। শুনেছি, সে ঐ বাড়িতে উঠেছে। তাকে আমি কিডন্যাপ করব।'

গোগোল প্রথমে খুব চমকে উঠেছিল। ভয়ও পেয়েছিল। এখন গোঁফ দাড়ি আর চশমা পরা লোকটির দিকে ভাল করে তাকিয়ে দেখে, চোখ বড় করে হেসে উঠল। বলল, 'আপনি! মানে—।' 'চুপ চুপ!' ভদ্রলোক বললেন, 'একদম আমার নাম নিও না। জানবে এখানে গাছপালারও কান আছে। তবে তুমি ঠিকই ধরেছ, আমি তোমার বন্ধু!'

গোগোল মনে মনে বলল, 'অশোক ঠাকুর। বিখ্যাত গোয়েন্দা!' রাজধানী এক্সপ্রেসের হত্যা, আর গোগোলের নাম বলাতেই, ও গলার স্বরটা চিনে ফেলেছিল। ও কিছু জিজ্ঞেস করবার আগেই

অশোক ঠাকুর নীচু স্বরে বললেন, 'তারকনাথ দত্তর বাড়িতে আজ সকালেই তোমরা এসেছ, এ খবর আমি জানি। মধুপুরে কে কখন কবে আসছে, সব খবরই আমার জানা। তবে আমি যাকে খুঁজছি, তাকে এখনও পাই নি। কিন্তু সে কাছে পিঠেই কোথাও ঘাপটি মেরে আছে। আমার চোখ ফাঁকি দিয়ে পালাতে পারছে না। অথচ আমি ধরতে পারছি না। তোমাকে বলে রাখি, একটু চোখ কান খোলা রেখে চলো। লোকটার বয়স হবে আমারই মত, তবে বেশ লম্বা আর শক্ত ফরসা চেহারা। এক জোড়া গোঁফ আছে। মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা। সঙ্গে ওর বউও আছে। লোকটার নাম অবতার সিং। নাম করা হীরে চোর। গোটা তিনেক খুনও করেছে। ভারতের সব রকম ভাষা বলতে পারে। বাঙলা বললে, তুমি একদম ধরতে পারবে না, যে ও বাঙালী নয়। আসলে ও পাঞ্জাবী। আজ পর্যন্ত প্রায় এক কোটি টাকার হীরে চুরি করেছে। খবরটা দিয়ে রাখলাম। এবার সরে পড়। বিকেল হয়ে আসছে, বাবা মা তোমাকে খুঁজবেন। কথাটা কিন্তু এখন কারোকে বোলো না।'

গোগোল মাথা ঝাঁকিয়ে বাড়ি ফিরে গেল। সত্যি সত্যি বাবা মা তখন উঠে পড়েছেন। নীচে তারকনাথ দাদুর ঘরে বসে, তিন জনেই চা খেতে খেতে গল্প করছিলেন। গোগোলকে দেখে তারকনাথ বললেন, "কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছ ডিটেকটিভ দাদু? এখানে কোন চোর ডাকাতের সন্ধান পেলে নাকি?"

গোগোল মাথা নেড়ে বলল, 'না। আমি বাগানের বাইরে রাস্তাটা দেখছিলাম।'

'শুধু রাস্তাই দেখছিলে?' তারকনাথ হেসে বললেন. 'একটা গোঁফ দাঁড়িওয়ালা লোকের সঙ্গে কথা বলছিলে না?'

গোগোল চমকে উঠল। তারকনাথ হো হো করে হেসে উঠলেন। বাবা মাও অবাক চোখে গোগোলের দিকে তাকালেন। গোগোল বলল, 'হ্যাঁ, অবাঙালী এক ভদ্রলোক আমার সঙ্গে যেচে কথা বলছিলেন। আমার নাম, কোথায় কার বাড়িতে উঠেছে, এই সব জিজ্ঞেস করছিলেন।'

'হ্যাঁ, এখানে যত লোক বেড়াতে আসে, সবাই যেচে আলাপ করে!' তারকনাথ বললেন, ঐ গোঁফ দাড়িওলা লোকটা বোধ হয় একলা বেড়াতে এসেছে। তোমার সঙ্গে একটু কথা বলে নিল। এখানে ওরকম হয়। তোমার নিশ্চয় জানতে ইচ্ছে করছে, আমি কেমন করে ব্যাপারটা জানলাম?'

গোগোল মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'হ্যাঁ।'

'তুমি যখন নীচে এসে আমার ঘরে উঁকি দিয়ে চলে গেলে, তখনই আমি তোমাকে দেখেছি।' তারকনাথ হেসে বললেন, 'আমি খবরের কাগজ পড়ছিলাম, কিন্তু চশমার ফাঁক দিয়ে তোমাকে ঠিক দেখে নিয়েছিলাম। তারপরেই আমি একজনকে ডেকে বললাম, খোকাবাবু কোথায় যাচ্ছে, একটু নজর রেখো। সে-ই এসে আমাকে খবর দিয়েছে।'

গোগোল হাসল। হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। যাক্, গোগোল যে অশোক ঠাকুরের সঙ্গে কথা বলছিল, সেটা কেউ বুঝতে পারেন নি। একটি কাজের লোক, দেখতে বেশ পালোয়ান মত, ঘরে ঢুকল। প্লেটের

ওপর বসানো বড় এক গ্লাস দুধ ভর্তি তার হাতে। অন্য হাতের প্লেটে মিষ্টি। তারকনাথ বললেন, 'বস গোয়েন্দা দাদু, দুধ মিষ্টি খেয়ে মা বাবার সঙ্গে মাছুয়া টাঁড়ে বেড়িয়ে এস। এখানে তো দেখবার কিছু নেই। মাছুয়া টাঁড়ে যাবার সময় ছোট্ট একটা নদী পায়ে হেঁটেই পার হয়ে যেতে পারবে। গ্রাম তেমন ভাল লাগবে না। আগামীকাল আমরা পাথ্‌রোলের কালী বাড়ি যাব।'

মা চা খাওয়া শেষ করে বাবাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি জামা কাপড় বদলাবে তো ?'

বাবা নিজের গায়ের পাজামা পাঞ্জাবী দেখে, তারকনাথের দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন, 'দরকার কী ? এখানে আমার, জামাকাপড় কে দেখবে ? তুমি বরং বদলে এস।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, পুরুষদের বেশী সাজগোজ দরকার হয় না। তারকনাথ বললেন, 'আর যাবে তো মাঠে ঘাটে বেড়াতে। তবে একটা টর্চ লাইট নিয়ে বেরিও। আসতে আসতে যদি অন্ধকার হয়ে যায়, অনেক রাস্তাঘাটে অসুবিধে হবে।' তারপরেই তিনি গোগোলের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কী হল গোয়েন্দা দাদু, দুধ মিষ্টি খেয়ে নাও ?'

গোগোল সেই ভয়টাই পাচ্ছিল। ঐ বড় এক গেলাস দুধ, আর মস্ত দুটো সন্দেশ খাবার মত পেটে জায়গা ছিল না। বলল, 'আমার এখন পেট ভরা। এত খেতে পারব না।'

'যা পার, তাই খাও।' তারকনাথ গড়গড়ার নল তুলে নিলেন।

গোগোল বাবার দিকে তাকাল। বাবা তখন খবরের কাগজ টেনে নিয়েছেন। মা চলে গিয়েছেন জামা কাপড় বদলাতে। গোগোলের কানে তখন অশোক ঠাকুরের কথাগুলোই বাজছে। অবতার সিং, হীরে চোর। তিনটে খুন করেছে। অশোক ঠাকুরের মত বয়স। লম্বা শক্ত ফরসা শরীর। গোঁফ আছে, মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা। ভাবতে ভাবতে গোগোল দুটো মিষ্টিই খেয়ে ফেলল। এমন কি বড় এক গেলাস দুধও। তারকনাথ গড়গড়া টানা থামিয়ে হেসে জিজ্ঞেস করলেন, 'ব্যাপার কি বল তো ভাই গোয়েন্দা দাদু ? খাবে না খাবে না করে, সবই খেয়ে ফেললে, কিন্তু দেখে মনে হল, যেন তুমি খেলে না। আর কেউ খেল। এত কী ভাবছ ?'

গোগোল আবার চমকে উঠল। বেশী মিথ্যে কথা বলতে লজ্জাও করে। বলল, 'আমি সেই দাড়িওলা ভদ্রলোকের কথা ভাবছি। ভদ্রলোক যেন কেমন।'

কোন অপরাধের গন্ধ-টন্ধ পেলে নাকি ?' তারকনাথ ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলেন।

গোগোল লজ্জা পেয়ে হেসে বলল, 'না, তা ভাবিনি, ওঁকে আমার বেশ মজার লোক বলে মনে হচ্ছিল।'

'ওরকম অনেক মজার লোক তুমি মধুপুরে ভ্রমণকারীদের মধ্যে পাবে।' তারকনাথ হেসে বললেন 'এখন বেড়াতে বেরোলে দেখবে, সব ভাঙা শরীর সারাবার জন্য রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছে। তবে শরীর সারবে কেমন করে ? সব বাতিকগ্রস্ত লোক।'

এই সময়ে মা জামাকাপড় বদলে, নীচের ঘরে এলেন। হাতে একটা টর্চ লাইট। বাবা খবরের কাগজ রেখে দাঁড়ালেন, তারকনাথকে বললেন, 'তা হলে আমরা একটু ঘুরে আসি ?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, এসো।' তারকনাথ গড়গড়ার নল রেখে বললেন, 'আমিও একটু বাগানে পায়চারি করব।'

গোগোল বাবা মা'র সঙ্গে বেরিয়ে পড়ল।

তারকনাথ ভুল বলেননি। দেখা গেল, রাস্তায় বেশ কিছু মহিলা পুরুষ ঘুরে বেড়াচ্ছেন। বয়স্ক ভদ্রলোকেরা ছড়ি হাতে, কেউ হন্ হন্ করে হাঁটছেন। কেউ আস্তে ধীরে। সব রকম বয়সের মহিলা পুরুষকেই দেখা গেল, সেজে-গুঁজে দল বেঁধে বেরিয়ে পড়েছেন। গোগোলের মত ছোট ছেলে মেয়েরা দৌড়-ঝাঁপ করছে। কয়েকটা টাঙাও এদিকে-ওদিকে দৌড়ুচ্ছে। গোগোল দেখল, ডানদিকের বাড়ির গেট থেকে বেরোচ্ছেন এক বুড়ো ভদ্রলোক। মাথায় সাদা চুল, সাদা গোঁফ দাড়ি। খদ্দরের ধুতি পাঞ্জাবী। পায়ে সাদা মোজা, কালো চটি। একটু খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে, মোটা ছড়ি মাটিতে ঠুকে ঠুকে হাঁটছেন। তারকনাথের পাশের বাড়িটাও বেশ বড়। বাগানও ছোট নয়। কিন্তু বাড়িটা দেখতে পুরনো। বাগানেও তেমন ফুলগাছ নেই। এগিয়ে এসে বাবার দিকে তাকিয়ে হেসে, দু'হাত তুলে নমস্কার করলেন। বাবা অবাক হয়ে দু'হাত কপালে ঠেকালেন। ভদ্রলোক ভাঙা-ভাঙা, হাঁফ ধরা গলায় জিজ্ঞেস করলেন, 'শুনলাম তারকবাবু এসেছেন। আপনি বুঝি তারকবাবুর ছেলে।

'আজ্ঞে না।' বাবা বললেন, 'আমরা ওঁর সঙ্গে বেড়াতে এসেছি, আমাদের খুব স্নেহ করেন।'

ভদ্রলোক যেন কেমন অসাব্যস্ত ভাবে মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন, 'শুনেছি, ওঁর মনটা খুব উঁচু, স্নেহপ্রবণ মানুষ। কত বড়লোক, অথচ বোঝা যায় না!'

'আপনি চেনেন বুঝি ওঁকে ?' বাবা জিজ্ঞেস করলেন।

ভদ্রলোক তেমনি ভাঙা-ভাঙা হাঁফ ধরা গলায় বললেন, 'ওঁকে কে না চেনে বলুন! আমার সঙ্গে ওঁর পরিচয় নেই, তবে বাড়িটা যে ওঁর, তা জানি। আমি প্রত্যেক বছরই একবার মধুপুরে বেড়াতে আসি। এই পাশের বাড়িতেই উঠি, আমার বন্ধুর বাড়ি। তারকবাবুর বাড়ির দরজায় দেখে ভাবলাম, বোধহয় আপনি ওঁর ছেলে হবেন। আর—।' ভদ্রলোক মা আর গোগোলের দিকে তাকিয়ে বললেন, ইনি বোধহয় বউমা আর নাতি হবে। তা একরকম তো তাই-ই। বেড়াতে বেরোচ্ছেন ?'

বাবা বললেন, 'হ্যাঁ, আমরা নদী পেরিয়ে মাছুয়াটাঁড় গাঁয়ের দিকে যাব।'

'বাঃ! খুব ভাল কথা।' ভদ্রলোক বললেন, বেড়িয়ে আসুন আমারও যেতে ইচ্ছে করে। কিন্তু শরীরে কুলোয় না। একে খোঁড়া মানুষ, এদিকে হাঁফ, দুটো স্ট্রোক হয়ে গেছে, তবু এখানে এলে একটু ভাল থাকি। আচ্ছা আবার পরে দেখা হবে।'

ভদ্রলোক খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হেঁটে চললেন। দাঁড়ালেন গিয়ে আর একজন বৃদ্ধ মানুষের

সামনে। বাবা বললেন, 'এইসব বুড়ো মানুষদের দেখলে কষ্ট হয়। ছেলেমেয়েদের সঙ্গে হয়তো সম্পর্ক নেই, একলা ঘুরে বেড়াচ্ছেন। যাঁকে পাচ্ছেন, তাঁর সঙ্গেই একটু কথা বলছেন। সত্যি অসহায়। কিন্তু কথা হচ্ছে আমি তো মাহুয়াটাঁড়ে যাবার রাস্তা চিনিনে।'

'আমি রাস্তা দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছি।' পিছন থেকে একজন বলে উঠল, 'বাবু আমাকে পাঠিয়েছেন।'

দেখা গেল, তারকনাথ দাদুর বাড়িরই একজন কাজের লোক। গোগোলরা সেই লোকটির সঙ্গে হাঁটতে লাগল। কিন্তু ওর নজর রাস্তার সব লোকের দিকে। ও অবতার সিং হীরে চোরকে খুঁজছে। কালো চুল দাঁড়ি গোঁফওয়ালা অশোক ঠাকুরকে চোখে পড়ছে না।

নদীটা সত্যি ছোট, প্রায় চওড়া একটা নালার মত। গরু মোষের গাড়ি আর মানুষ পায়ে হেঁটে অনায়াসে পার হয়ে যাচ্ছে। দলে দলে সাঁওতাল মেয়ে পুরুষরা চলেছে। বাবা বললেন, 'বিহারের মধ্যে হলেও দেশটা আসলে সাঁওতাল পরগণা।'

বেড়িয়ে ফিরতে ফিরতে অন্ধকার হয়ে গেল। রাত্রে খাওয়া-দাওয়া করে, শুয়ে গোগোলের প্রথমেই মনে হল, অশোক ঠাকুর কোথায় কোন্ বাড়িতে উঠেছেন, সে জানা হয়নি। ও ইচ্ছে করলেও, তাঁর দেখা পাবে না। গোগোল অবতার সিংহের কথা ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ল।

পরের দিন ঘুম ভাঙল ভোরবেলা। মা ওর শিয়রের কাছে একটা পাতলা হাত কাটা উলের সোয়েটার রেখে দিয়েছিলেন। এ সময়ে এখানে সাবধানে না থাকলে হঠাৎ ঠাণ্ডা লেগে যেতে পারে। গোগোল গায়ে সোয়েটার চাপিয়ে, আগে টুথ ব্রাশে পেস্ট লাগিয়ে দাঁত মেজে মুখ ধুয়ে নিল। মা জেগেই ছিলেন। বাবা অন্য খাটে তখনও ঘুমোচ্ছেন। গোগোল বলল, 'মা, আমি একটু নীচে বেড়াতে যাই।'

'যাও।' মা বললেন, 'বেশী দূরে কোথাও যেও না।'

গোগোল নীচে নেমে দেখল, তারকনাথ বাগানে পায়চারি করছেন। তাঁর গায়ে মাথায় চাদর জড়ানো।

গোগোলকে দেখে বললেন, 'গুডমর্নিং গোয়েন্দা দাদু।'

'গুডমর্নিং।' গোগোল বলল। তারকনাথের কাছে এগিয়ে গেল। তিনি বললেন, দেখ, গোগোল ফুলগুলোর গায়ে কী সুন্দর শিশির জমেছে। এসব দেখতে আমার খুব লাগে।'

গোগোলেরও ভাল লাগল। একজন মালী কাঁচি দিয়ে গোলাপফুল তুলছিল। তারকনাথ জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি আমাদের পেছনের বাগান আর গোয়াল দেখেছ?'

'না।'

'তাহলে চল যাই। দেখবে কেমন দুধ দোয়া হচ্ছে।'

গোগোল তারকনাথের সঙ্গে বাড়ির পিছনে ফলের বাগানে গেল। ওটা পুব দিক। পিছনের পাঁচিল ঘেসে বড় আর পরিচ্ছন্ন গোয়ালঘর। বড় বড় ভাগলপুরী সুরাটি গাভী। দুজন লোক দুধ দুইছিল। আরও দুজন লোক গোয়াল পরিষ্কার করছিল। বাছুরগুলো গাছের সঙ্গে বাঁধা।

গোগোল দেখল, মস্ত বড় একটা টিনের পাত্রে দুধ ঢেলে রাখা হচ্ছে। তারকনাথ বাছুরগুলোর গায়ে হাত দিয়ে আদর করতে লাগলেন। গোগোলও বাছুরগুলোকে আদর করল। বাগান ঘিরে রাখা পাঁচিল খুব উঁচু নয়। ও দেখল, উত্তর দিকের বাড়ির পিছনেও ফলের বাগান, আর কয়েকটা গরু বাঁধা রয়েছে। গোগোল সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোকের কথা বলল। তারকনাথ সেই বাড়িটার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কে জানে, কে এসেছে? বাড়ির মালিকের নাম আশুতোষ চক্রবর্তী। শুনেছিলাম, ভদ্রলোক নাকি বাড়িটা বিক্রি করে দিতে চান। হবে হয় তো অশেুবাবুর কোন বন্ধু বেড়াতে এসেছেন। কিন্তু কেয়ার টেকার হিসেবে লোকটাকে রেখেছেন, সেটা একটা আস্ত শয়তান, নাম বেচনলাল। ও একবার আমার দুটো ভালো গাই চুরি করে বেশ কিছুদিন লুকিয়ে রেখেছিল। মতলব ছিল, দূরে কোথাও নিয়ে গিয়ে বেশী দামে বিক্রি করে দেবে। তার আগেই ধরা পড়ে গেছল। ব্যাটাকে পুলিশে দিতাম। কিন্তু হাতে পায়ে ধরে ক্ষমা চেয়েছিল। তারপরেও অনেকবার বাগানের গোলাপ চুরি করে বিক্রি করে দিয়েছে। হাতে পড়ে আমার লোকদের হাতে বেশ উত্তম মধ্যম খেয়েছে। ওকে কিছু বিশ্বাস নেই। আশুবাবু তাঁর বাড়িটা তেমন দেখাশোনা করতে পারেন না। শুনি, বেচনলাল নাকি লুকিয়ে বাড়ি ভাড়া দেয়।'

'তা ওকে এখানকার লোকে কিছু বলে না?' গোগোল জিজ্ঞেস করল।

তারকনাথ বললেন, 'এখানে সেরকম লোক কে আর আছে? বেশীর ভাগ বাড়ির মালিক তো বাইরে থাকে। ছুটি ছাটায় বেড়াতে আসে। এমনি যারা থাকে, তারা বেচনকে ভয় পায়।'

গোগোল হাঁটতে হাঁটতে উত্তরের পাঁচিলের কাছে গেল। কিন্তু কাছে গিয়ে ও পাঁচিলের ওপাশে কিছু দেখতে পেল না। ছোট হলেও পাঁচিলটা ওর মাথা একটু ছাড়িয়ে উঠেছে। শুধু শুনতে পেল, কারা কথাবার্তা বলছে হিন্দীতে। তারকনাথ ডাকলেন, 'এস গোবিন্দদাদু, ওসব ছিঁচকে চোরদের দেখে কোন লাভ নেই। তোমার মুখ ধোয়া হয়ে গেছে?

'হ্যাঁ।'

'তা হলে একটু পরেই এক গেলাস দুধ খেয়ে নাও।'

তারকনাথ বললেন, তারপর জলখাবার হলে, খেয়ে আমরা পাথুরোলে বেরিয়ে পড়ব। একটা বড় ভাল টাঙ্গা আনতে বলে দিয়েছি।'

গোগোল তারকনাথের সঙ্গে, পিছনের দরজা দিয়ে বাড়ির মধ্যে ঢুকল। তারকনাথ ভিতরে ঢুকে, নিজের ঘরের দিকে গেলেন। বললেন, 'আমি মুখ ধুয়ে দাড়িটা কামিয়ে নিই। দেখ তোমার বাবা মা কী করছেন।'

গোগোল দোতলায় উঠে ঘরের দিকে যেতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল। ওপরের সিঁড়ির দিকে তাকিয়ে, ছাদটা দেখতে ইচ্ছে হল। ও সিঁড়ি ভেঙে উঠে দেখল, ছাদের দরজায় দুটো বড় বড় শাল কাঠের হুড়কো আঁটা রয়েছে! খুলতে বেশ বেগ পেতে হল। বিরাট ছাদ, বল খেলা যায়। গোগোল বাড়ির সামনের দিকে গেল। বাগানে মালী কাজ করছে। রাস্তায় কয়েকজন লোক চলাফেরা করছে।

ও উত্তর দিকে সরে গেল। সবে মাত্র রোদ উঠতে আরম্ভ করেছে। গোগোল আলসের ধারে দাঁড়িয়ে পাশের বাড়ির ভিতরের উঠোন দেখতে পেল। ভিতরের উঠোনের এক কোণে ইঁদারা। মাঝখানে খাটিয়ার ওপর বসে আছে একটি লোক আর একজন স্ত্রীলোক। দুজনে কথা বলছে। দুজনের কেউ গোগোলকে দেখতে পাচ্ছে না। লোকটি ফরসা লম্বা, শক্ত চেহারা। খালি গায়ে কাঁধের ওপর একটা তোয়ালে। মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা। গোঁফ নেই। স্ত্রীলোকটির মাথায় ঘোমটা নেই। বয়সও খুব বেশী নয়। রঙীন শাড়ি আর জামা গায়ে। দু পাশে দুটো বেণী দুলছে। দুজনেই হাসতে হাসতে কথা বলছিল।

গোগোল আরও একটু পুবে সরে গেল। আলসের মাঝে গোল গোল ফাঁক ছিল। বসে পড়ে এই ফাঁক দিয়ে লোকটার মুখের দিকে ভাল করে তাকাল। আশ্চয, লোকটাকে কেমন চেনা চেনা লাগছে। অথচ কখনও দেখেছে বলে মনে করতে পারছে না। চোখ নাক কপাল দেখে মনে হচ্ছে আগে কোথাও লোকটাকে দেখেছে। অথচ কিছুতেই মনে করতে পারছে না।

গোগোল দরজার হুড়কো লাগিয়ে নেমে এল। মা বললেন, 'গোগোল তোমার দুধ এসে গেছে। খেয়ে নিয়ে, একেকারে চান করে নাও। পাথ্‌রোল থেকে ফিরতে অনেক বেলা হয়ে যাবে। রোদ থেকে ফিরে তখন আর চান করতে হবে না। আমরাও চান করে নেব।'

গোগোল তাই করল।

বৈকালে গোগোল দেখল, বাবা মা'র কোথাও বেড়াতে যাবার ইচ্ছে নেই। কবেলা পাথ্‌রোলের কালীবাড়ি ওর তেমন ভাল লাগে নি। সেরকম সুন্দর মন্দির নয়। একটা পুরনো বাড়ি, উঠোন, থামগুলো খুব সাধারণ। কালীমূর্তি আছে একটা ঘরের মধ্যে। তারকনাথ পূজা দিয়েছেন। ফিরে এসে খাওয়া দাওয়া করে, ঘুম। গোগোল বলল, 'আমি বাইরের রাস্তায় বেড়িয়ে আসি।'

'বেশী দূরে কোথাও যেওনা' মা বললেন, 'আমরা টাঙা নিয়ে শহরের দিকে যেতে পারি। তোমাকে যেন খুঁজতে না হয়।'

গোগোল মাথা ঝাঁকিয়ে নেমে গেল। তারকনাথ তখনো ঘরের মধ্যে গড়গড়া টানছেন, খবরের কাগজ পড়ছেন। গোগোল বাগানের ছোট দরজা দিয়ে বাইরে এল। লোকজন সব রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছে। গোগোল কোন্ দিক দিয়ে যাবে ভাবছে। এমন সময় গতকালের, সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোক হাতের মোটা ছড়ি ঠুকে ঠুকে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে বেরিয়ে এলেন। মাথার সাদা চুল, সাদা গোঁফ দাড়ি। খদ্দরের ধুতি পাঞ্জাবী। পায়ে সাদা মোজা, কালো চটি। গোগোলকে একবার দেখে, ডাইনে বাঁয়ে দেখলেন। তারপর দক্ষিণ দিকে খুঁড়িয়ে হাঁটতে লাগলেন।

গোগোলের মনটা চমকে উঠল। এই লোকটার মুখই কি ও সকালে ছাদ থেকে দেখছিল? ঠিক সেই টিয়ে পাখির মত নাক, কালো ছোট চোখ, চওড়া কপাল। কিন্তু সে লোক তো জোয়ান। মাথায়

তার কালো চুল ছিল। এ তো সাদা চুল গোঁফ দাড়ি খোঁড়া বুড়ো মানুষ। কিন্তু চোখ নাক কপাল একরকম! তাছাড়া বুড়ো মানুষের কপালে তেমন ভাঁজ নেই।

গোগোল মনে মনে উত্তেজিত হল। অশোক ঠাকুরকে লোকটার কথা বলতে পারলে ভাল হত। কিন্তু তাঁকেই বা গোগোল কোথায় খুঁজে পাবে? উনি তো বলেন নি, কোথায় কোন্ বাড়িতে থাকেন? গোগোল সেই বৃদ্ধের পিছনে পিছনে হাঁটতে লাগল। খানিকটা গিয়েই, বুড়ো ভদ্রলোক, আর একজন বুড়ো ভদ্রলোককে দেখে, তাঁর দিকে খুঁড়িয়ে এগিয়ে গেলেন। হিন্দিতে বললেন, 'নমস্তে ব্যানার্জিবাবু তবিয়ত ক্যায়সা বাতাইয়ে।'

আজ ভদ্রলোক হিন্দীতে কথা বলছেন। গোগোল থামল না। হাঁটতে লাগল। মাছুয়াটাঁড়ের রাস্তায় যাবার মোড়ে এসে থামল। নানা দিক থেকে গরু ঘোষ ধুলো উড়িয়ে, ছোট নদীর রাস্তায় চলেছে। হঠাৎ কোন্ দিক থেকে, কালো দাঁড়ি গোঁফ লম্বা চুলওয়ালা অশোক ঠাকুর হাজির। বললেন, 'কী খবর গোগোল, আজ পাথ্রোলে কেমন বেরিয়ে এলে?'

'ভাল লাগেনি।' গোগোল উত্তেজিত স্বরে বলল, 'আমি আপনাকেই খুঁজছি। আমাদের বাড়ির উত্তর দিকের বাড়িতে একজনকে আজ সকালে দেখলাম। সে একটি মেয়ের সঙ্গে কথা বলছিল। এবেলা সেই বাড়ি থেকে একজন বুড়ো ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন। মনে হল, সাদা চুল গোঁফ দাড়ির মধ্যে, সেই লোকটার মুখ। কালও বুড়ো লোকটিকে দেখেছিলাম। খুঁড়িয়ে হাঁটেন, হাঁফ ধরা গলায় কথা বলেন।'

কালো গোঁফ দাড়ি চশমার মধ্যে অশোক ঠাকুরও উত্তেজিত হলেন। কিন্তু সাবধানে নীচু স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, 'সেই বুড়ো কোন্ দিক গেছে?'

গোগোল পিছন ফিরে দেখে বলল, ঐ যে দেখছেন, দুজন বুড়ো মানুষ দাঁড়িয়ে আছেন, তার মধ্যে সাদা চুল দাড়িগোঁফ চশমাপরা লোকটিকে আমার সন্দেহ হয়েছে।'

'হুঁ, ঠিক আছে গোগোল, তুমি বাড়ির দিকে ফিরে যাও। অশোক ঠাকুর নীচু স্বরে বললেন, 'আমি অন্যদিকে যাচ্ছি, কিন্তু ওর ওপরে নজর রাখছি।'

গ্যেগোল আবার পিছন ফিরে বাড়ির দিকে চলল।

পরদিন ভোরবেলা ঘুম ভাঙতেই গোগোল বাইরে গোলমাল শুনতে পেল। মা বাবা কেউ ঘরে নেই। গোগোল শিয়রের কাছ থেকে সোয়েটারটা গায়ে চাপিয়ে নীচে নেমে এল। তারকনাথও ঘরে নেই। দেখা গেল সবাই বাগানে। ও বাগানে গিয়ে দেখল, উত্তরদিকের পাশের বাড়িটা চারদিক থেকে পুলিশ ঘিরে ধরেছে। তিন চারটে পুলিশের ভ্যান রাস্তায়। বাড়ির ভিতরে বাগানেও, রিভলবার আর বন্দুক হাতে পুলিশ ঢুকে পড়েছে। একজন অফিসার চিৎকার করে বলছেন, 'অবতার সিং বেরিয়ে এস, ধরা দাও। আমরা তোমার হদিস পেয়েছি। গুলি চালাবার চেষ্টা করো না।'

ভিতর থেকে কোন জবাব এল না। কিন্তু দুম্ করে একটা গুলির শব্দ হল। অফিসার মাটিতে

বসে পড়লেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনটে রাইফেল গর্জে উঠল। বাড়ির বন্ধ দরজা জানলা লক্ষ্য করে পুলিশ গুলি ছুঁড়ল। আরও কয়েকজন পুলিশ বন্দুক হাতে এবার বাগান পেরিয়ে, বাড়িটাকে ঘিরে ধরে গুলি চালাতে লাগল।

তারকনাথ বললেন, 'নিশ্চয়ই বেচনলালটা কোন ডাকাতি করেছে।'

'না, হীরে চোর অবতার সিং ও বাড়িতে লুকিয়ে আছে।' গোগোল উত্তেজিত হয়ে বলে ফেলল।

সবাই গোগোলের দিকে অবাক চোখে তাকালেন। তারকনাথ জিজ্ঞেস কবলেন, 'গোয়েন্দা দাদু তুমি এ খবর কোথা থেকে পেলে?'

গোগোল বিরত হয়ে চুপ করে বইল। এ সময়েই, উত্তরদিকের বাড়ির সামনের দরজা খুলে গেল। দেখা গেল, খালি গা ফরসা জোয়ান, মাথায় কালো চুল একজন বেরিয়ে আসছে। তার পিছনে অশোক ঠাকুর রিভলবার হাতে। লোকটার পিঠে রিভলবারের নল ঠেকিয়ে রেখেছে। এখন তাঁর মুখে কালো গোঁফ দাড়ি নেই। গোগোল বলে উঠল, 'ঐ তো, অশোক ঠাকুর অবতার সিংকে রিভলবার ঠেকিয়ে বের করে নিয়ে আসছেন!

তারকনাথ বাবা মা, কেউ একটা কথাও বলতে পারছেন না। তাঁরা সব ঘটনা দেখছেন। পুলিস অফিসার ছুটে গিয়ে অবতার সিংয়ের দু হাতে হ্যান্ডকাপ পরিয়ে দিলেন। আর একজন কোমরে মোটা দড়ি বেঁধে ফেলল। চার পাশে বন্দুক তাগ্ করা সেপাই।

বাইরের রাস্তায় বিস্তর লোকজন জমে গিয়েছে। অবতার সিংকে এফটা ভ্যানে তোলা হল। সেই সঙ্গে বেচনলাল আর সেই মেয়েটিকে গ্রেপ্তার করে গাড়িতে তোলা হল। তারপরে সবাইকে অবাক করে দিয়ে, অশোক ঠাকুর আর পুলিশ অফিসার তারকনাথের বাড়িতে ঢুকলেন। অশোক ঠাকুর প্রথমেই গোগোলের হাত ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন, 'গোগোল তুমি ঠিকই দেখেছিলে। অথচ লোকট্টাকে আমি ক'দিন ধরে দেখছি। কিন্তু ধরতে পারিনি। তুমি না বললে, হীরে চোর অবতার সিং ধরা পড়তো না।' বলে পুলিস অফিসারকে বললেন, 'মিঃ চোপরা, এই সেই গোগোল, যে আমাকে গতক্যল বিকালে অবতার সিংয়েরহদিস দিয়েছিল।'

মিঃ চোপরা গোগোলের সঙ্গে করমর্দন করে, ওর গাল টিপে দিয়ে বললেন, সত্যি গোগোল, তোমার নজর ঈগল পাখির থেকেও চোখা।'

তারকনাথ এতক্ষণে মুখ খুললেন, 'ব্যাপারটা কী, কিছুই বুঝতে পারছিনে? দয়া করে আপনারা আমার বাড়ির ভেতরে আসুন। গোয়েন্দাদাদুর কেরামতিটা শুনি। এ যে একেবারে ভোজ-বাজীর মত লাগছে!'

'তা একরকম ভোজবাজীই বলতে পারেন।' অশোক ঠাকুর বললেন, 'চলুন, আপনার বাড়ির টাটকা দুধ খেতে খেতে সব ঘটনা বলি।'

তারকনাথের ঘরে বসে অশোক ঠাকুর দুধ আর মিষ্টি খেতে খেতে সব ঘটনা বললেন। বাকিরা সব হতবাক হয়ে শুনলেন। তারকনাথ গোগোলকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে বললেন, 'সাবাস গোয়েন্দা দাদু! তুমি সত্যিই ভোজবাজী দেখিয়ে ছেড়েছ। গোঁফ দাড়িওয়ালা একটা খোঁড়া বুড়োর ভেতর থেকে বের করে নিয়ে এলে হীরে চোর অবতার সিংকে? তোমার তুলনা নেই।'

বাবা মাও হাসছিলেন। কারণ ওঁরা দেখলেন, গোগোল নিজে কোন বিপদে পড়েনি।

অশোক ঠাকুর বললেন, 'গোগোল তোমার একটা পুরস্কার বাকি রইল। আজ চলি, পরে দেখা হবে।'

অফিসার গোগোলকে আবার আদর করে বেরিয়ে গেলেন। তারকনাথ গোগোলকে দু হাতে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'এবার তোমার মুখ থেকে আলাদা করে ঘটনাটা শুনব। আমিও তোমাকে পুরস্কার দেব, কারণ তুমি ঐ ছিঁচকে বেচনলালটাকেও ধরিয়ে দিতে পেরেছ।'

গোগোল বলল, তবে দাদু, আপনি যদি বেচনলালের কথা না বলতেন, আমি অবতার সিংকে সন্দেহ করতাম না। আপনি যে বললেন, লোকটা আস্ত শয়তান। ভাবলাম, আস্ত শয়তানের কাছেই আর এক শয়তান থাকতে পারে।'

তারকনাথ গোগোলের পিঠ চাপড়ে বললেন, 'তা হলে আমি তোমাকে একটা ক্লু দিয়েছি?'

বাবা মা হেসে উঠলেন।



সবুজ চশমা

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়



বরদা বলিল, আমিও একদিন তোমাদের মত নাস্তিক ছিলুম।"

আমরা সকলে উৎসুকভাবে নিরুত্তর রহিলাম, কারণ, এরূপ ভূমিকার উদ্দেশ্য আমাদের অজ্ঞাত ছিল না ; কেবল অমূল্য মুখ বিকৃত করিয়া হাসিল।

বরদা টেবিলের উপর হইতে পা নামাইয়া বলিল, "কিন্তু একবার এমন একটা ব্যাপার ঘটল যে, তারপর প্রেতযোনিতে অবিশ্বাস করা একেবারে অসম্ভব। অনেকদিন আগেকার কথা—প্রায় দশ বছর হল। সে রকম ভয়ংকর অভিজ্ঞতা জীবনে কখনও হয়নি। রেলে কাটা পড়তে পড়তে বেঁচে গিয়েছিলুম।"

অমূল্য সক্ষোভে কপালে করাঘাত করিয়া বলিল, "আমাদের ভাগ্যই মন্দ—কাকে দোষ দেব ?"

পাছে আবার ঝগড়া বাধিয়া যায়, তাই পৃথ্বী তাড়াতাড়ি বলিল, "কাউকে দোষ দিতে হবে না। বরদা, তুমি আরম্ভ করে দাও।"

বরদা শত্রুমিত্র সকলকে সমান অগ্রাহ্য করিয়া অবিচলিতভাবে একটা চুরুট ধরাইল, তারপর আরম্ভ করিল—"কিউল জংশনের মতন এমন লক্ষ্মীছাড়া স্টেশন বোধহয় পৃথিবীতে আর নেই। লুপ লাইন থেকে যে দিকেই যেতে চাও কিউলে অন্তত তিনটি ঘণ্টা বিশ্রাম করতে হবে।

সেবার বি. এ. পরীক্ষা দিয়ে মামার বাড়ি বেড়াতে যাচ্ছিলাম—এলাহাবাদে। সন্ধ্যের সময় মুঙ্গের থেকে বেরিয়ে রাত্রি আটটা নাগাদ কিউল পৌঁছুনো গেল। সেখানে পশ্চিমের ট্রেন আসবে রাত্রি এগারোটায়—সুতরাং অফুরন্ত অবকাশ। আমার সঙ্গে কেবল একটা সুটকেস ছিল ; সেটা কুলীর জিম্মা করে দিয়ে লম্বা কাঁকর-চাকা প্ল্যাটফর্মের ওপর পায়চারি করতে লাগলুম। ক্রমে ট্রেন বেরিয়ে গিয়ে ষ্টেশনটা একেবারে খালি হয়ে গেল। ঘণ্টা তিনেকের মধ্যে আর গাড়ি নেই।

কিন্তু একলা শূন্য প্ল্যাটফর্মে কাঁহাতক পায়চারি করা যায়? ঘণ্টাখানেক ঘুরে বেড়াবার পর দেখলুম কেউ কোথাও নেই, স্টেশন স্টাফও বোধকরি এই অবসরে একটু নিদ্রা দিয়ে নিচ্ছে; গ্যাসের বড় বড় ল্যাম্পগুলো জনহীন প্ল্যাটফর্মে অনর্থক আলো বিকর্ণ করছে। আমিও এদিক-ওদিক চেয়ে ফার্স্ট ক্লাস ওয়েটিং রুমে ঢুকে পড়লুম, ভাবলুম, নিরিবিলি একটু ঘুমিয়ে নেওয়া যাক।—অ্যাঁ? হ্যাঁ, টিকিট ইণ্টার ক্লাসেরই ছিল।

ওয়েটিং রুমের মাঝখানে একটি গোছের গোল টেবিল, তার ওপর কেরোসিনের ল্যাম্প ঘোলাটে ভাবে জ্বলছে। টেবিলের চারপাশে দশ-বারোখানা চেয়ার, আরাম-কেদারাও আছে। একটি চেয়ারে বসে একজন ভদ্রলোক ঝিমুচ্ছিলেন, একটা চামড়ার হ্যাণ্ডব্যাগ তাঁর সামনে টেবিলের ওপর রাখা ছিল। আমি ঢুকতেই তিনি চমকে উঠে তাড়াতাড়ি ব্যাগটা নিজের কাছে টেনে নিলেন।

আর কেউ যে ওয়েটিং রুমে আছে, তা প্রত্যাশা করিনি। যা হোক অনধিকার প্রবেশের সঙ্কোচ দমন করে একটা চেয়ার টেনে বসলুম, ভদ্রলোক মিটমিট করে আমার দিকে তাকাতে লাগলেন। বয়স্ক লোক, মুখে দাড়ি আছে,—ওস্তাগারের তৈরী ঝল্‌ঝলে কোট-প্যাণ্টলুন পরা, কিন্তু তবু বাঙ্গালী বলে সন্দেহ হল। একটু ইতস্ততঃ করে জিজ্ঞাসা করলুম, 'মশায়ের কোন্ দিকে যাওয়া হচ্ছে?'

ভদ্রলোক ব্যাগটি তুলে নিজের কোলের ওপর রাখলেন; এমন সন্দিগ্ধ-চোখে আমার দিকে চাইতে লাগলেন, যেন তাঁর ঐ ব্যাগটি চুরি করবার জন্যই আমি ঢুকেছি। তারপর সতর্কভাবে বললেন, 'আমি বিলেত যাচ্ছি।'

কিছুক্ষণ অবাক হয়ে চেয়ে থেকে বললুম, 'অ্যাঁ?'

তিনি আবার বললেন, 'বিলেত যাচ্ছি। আপনি?'

লজ্জিতভাবে বললুম, 'আমি এই—কাছেই, এলাহাবাদ যাচ্ছি।'

'এলাহাবাদ? এলাহাবাদে কি করেন?'

'কিছু করি না—মামার বাড়ি বেড়াতে যাচ্ছি। আপনি কি কখনও সেখানে ছিলেন?'

তাঁর সতর্ক সাবধান ভাব অনেকটা কেটে গেল, তিনি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, 'সেখানে আমি লিটন কলেজে ফিজিক্সের প্রফেসার ছিলুম—আমার নাম বিরাজমোহন সেন।'

বিরাজমোহন সেন! নামটা খুব পরিচিত, আমার মামাদের মুখে তাঁর অনেক গল্প শুনেছি; মামারা তাঁর কাছে পড়েছিলেন। বিরাজবাবু একজন নামজাদা প্রফেসর ছিলেন, কিন্তু হঠাৎ মাথা খারাপ হয়ে যাওয়ায় তাঁকে অধ্যাপনার কাজ থেকে অবসর নিতে হয়। আমি সচকিত হয়ে উঠলুম, তারপর খুব ভাল করে তাঁকে পর্যবেক্ষণ করলুম; কিন্তু তাঁর চেহারায় মাথা খারাপের কোনও লক্ষণই দেখতে পেলুম না। প্রকাণ্ড কপালখানা বুদ্ধি এবং পাণ্ডিত্যেরই পরিচয় দিচ্ছে,—উঁচু বাঁকা নাক, চোখের দৃষ্টিতে এমন কিছু নেই—যা পাগলামি বলে মনে করা যেতে পারে। আমি বললুম, 'আমি আপনার নাম শুনেছি—আমার মামারা আপনার ছাত্র।

'তাই নাকি ? কি নাম তাদের বল তো।'

আমি নাম বলতেই তিনি লাফিয়ে উঠে বললেন, 'শৈল, নীরজ! বিলক্ষণ! তাদের খুব চিনি। তুমি তাদের ভাগ্নে ? বেশ বেশ! বড় খুশী হলুম।' বলে তিনি ব্যাগটা আবার টেবিলের উপর রাখলেন।

আমার বড় হাসি পেল, জিজ্ঞাসা করলুম, 'আপনার ঐ ব্যাগটিতে কোনও মূল্যবান জিনিস আছে—না ?'

'মূল্যবান!' তিনি একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'হ্যাঁ, তা বলতে পার। এমন মূল্যবান জিনিস পৃথিবীতে আর নেই।'

আমি আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, 'কি জিনিস ?'

তিনি আস্তে আস্তে বললেন, 'একটা চশমা। বিলেতে নিয়ে যাচ্ছি স্যর অলিভার লজকে দেখাব বলে।'

আরও আশ্চর্য হয়ে গেলুম, বললুম, 'চশমা! স্যর অলিভার লজকে দেখাবেন ? কিসের চশমা ?'

তিনি উত্তর দিতে গিয়ে থেমে গেলেন, মাথা নীচু করে বসে রইলেন, তারপর হঠাৎ মুখ তুলে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি ভূত বিশ্বাস কর ?'

'ভূত ?'

'হ্যাঁ—প্রেতযোনি।'

মনে হল মাথা খারাপের কথাটা হয়তো নেহাত মিথ্যে নয়, নইলে আপাতদৃষ্টিতে এমন একজন বিজ্ঞ লোক আবোল-তাবোল কথা কয় কেন ? বললাম, 'যা চোখে দেখা যায় না, তা বিশ্বাস করি না।'

তিনি একটু হাসলেন, 'যা চোখে দেখা যায় না, তাই যদি অবিশ্বাস কর, তা হলে তো পৃথিবীর অধিকাশ জিনিসই অবিশ্বাস করতে হয়। এক বিন্দু জলে লক্ষ্য কোটি বীজাণু আছে, সে কি চোখে দেখা যায় ? মাইক্রোস্কোপ দিয়ে দেখতে হয়। এক্সরে দিয়ে জ্যান্ত মানুষের শরীরের গোটা কঙ্কালটা দেখা যায়···শাদা চোখে কি দেখতে পাও ?'

আমি বললুম, 'তা পাই না বটে, কিন্তু ভূত যে মাইক্রোস্কোপ কিংবা এক্সরে দিয়েও দেখা যায় না।'

তিনি আবার হাসলেন, গূঢ় রহস্যময় হাসি। তারপর বললেন, 'তা বটে, কিন্তু সাদা চোখেও যে অনেকে দেখেছে!'

আমি বললুম, 'তারা হয় ভ্রান্ত, নয় ঠগ।'

তিনি গম্ভীর হয়ে বললেন, 'পৃথিবীতে সকলকে ভ্রান্ত কিংবা ঠগের পর্যায়ে ফেলা যায় না—

খাঁটি লোকও আছে। শিশির ঘোষ জোচ্চোর ছিলেন না, নির্বোধও ছিলেন না। কিন্তু তোমার এখন বয়স কম, নাস্তিকতাই তোমার বয়সের ধর্ম। আমিও তোমার মতই অবিশ্বাসী ছিলুম—বেশী দিন নয়, দু'বছর আগে পর্যন্ত আমি প্রেতযোনি সম্বন্ধে ঘোর নাস্তিক ছিলুম। তার পর হঠাৎ একদিন সব ওলট-পালট হয়ে গেল! যে অপূর্ব জিনিস না জেনে আবিষ্কার করে ফেললুম, তাতে জীবনের ধারাটাই বদলে গেল।"

'কি আবিষ্কার করলেন?'

তিনি কিছুক্ষণ স্থির থেকে বললেন, 'একটা চশমা—বাইনকুলারের লেন্সও বলতে পার।'

আমি উত্তেজিত হয়ে বললুম, 'সেই' চশমাই কি আপনার ব্যাগে রয়েছে?'

'হ্যাঁ।'

'ঐ চশমাই স্যার অলিভার লজকে দেখাতে নিয়ে যাচ্ছেন?'

'হ্যাঁ।'

'কি ব্যাপার, আমাকে সব বলুন, আমার ভারি কৌতূহল হচ্ছে।'

তিনি বললেন, 'লোকের কাছে বলে যে রকম হাস্যাস্পদ আর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি, তাতে কাউকে বলতে ইচ্ছে করে না। যা হোক, তুমি যখন আগ্রহ প্রকাশ করছ, তখন শোনো—

'আমি বিজ্ঞানের অধ্যাপক, বিজ্ঞানের রাজ্যে বাতিক খেয়াল কল্পনার স্থান নেই—সেখানে নীরস নিষ্ঠুর সত্যের কারবার। সুতরাং ভূতপ্রেত সম্বন্ধে আমার মনে যে একটা মজ্জাগত বিরুদ্ধতা থাকবে, তা সহজেই অনুমান করতে পারবে। ভেবে দেখ, নিঃসংশয়ে ভূতপ্রেত বিশ্বাস করা যেতে পারে, এমন জোরালো প্রমাণ আজ পর্যন্ত কিছু পাওয়া গেছে কি? সবই ধোঁয়া-ধোঁয়া—অনিশ্চিত—বৈজ্ঞানিক কেউ কেউ স্বীকার করেছেন বটে কিন্তু বিজ্ঞান স্বীকার করেনি। বিজ্ঞান চায় নিরেট স্থূল সত্য, আবছায়া অস্পষ্ট কিছু সে চায় না।

'তাই শিক্ষার গুণে আমিও চিরদিন ভূতপ্রেতকে ঠাট্টাই করে এসেছি—কোনন্ ডয়েল, স্যার অলিভার লজ—এদের ভ্রান্ত খেয়ালী মনে করেছি,—কখনও ভাবিনি যে, আমিই একদিন অন্যকে বিশ্বাস করাবার জন্যে ছুটোছুটি করে বেড়াব আর তারা আমাকে পাগল মনে করে আমার কথা হেসে উড়িয়ে দেবে। এইটেই বোধ হয় আমার জীবনের সবচেয়ে নিষ্ঠুর পরিহাস।

'বছর দুই আগে কলেজের ল্যাবরেটারীতে আমি দূরবীণের লেন্স দিয়ে এক্সপেরিমেণ্ট করছিলুম। একটা বড় সবুজ রংয়ের ক্রিস্টাল একদিন কুড়িয়ে পেয়েছিলাম—সেইটে—কিন্তু তুমি বোধ হয় আর্টস স্টুডেন্ট, সব কথা বুঝবে না। মোটামুটি বলে রাখি, একটা অদ্ভুত ফিকে সবুজ রংয়ের ক্রিস্ট্যাল হাতে এসে পড়েছিল; তাই থেকে নিজের হাতে কতকগুলো লেন্স তৈরী করছিলুম। যন্ত্রের সাহায্য না নিয়ে হাতে করে ঘষে ঘষে লেন্স তৈরী করা সহজ কথা নয়, বিস্তর সময় লাগে, তা ছাড়া সবসময় নির্ভুল হয় না—বাঁকাচোরা থেকে যায়—কিন্তু আমার খেয়াল হয়েছিল, তাই নিজের হাতেই তৈরী করছিলুম।

'একদিন দুপুরবেলা—তখনও লেন্স সম্পূর্ণ তৈরী হয়নি,—কেমন হচ্ছে দেখবার জন্যে আমি সেগুলোকে ফ্রেমের ওপর বসিয়ে চোখে পরলুম। চশমার দোকানে চোখ পরীক্ষা করবার সময় যে-রকম ফ্রেম চোখে পরিয়ে দিতে দিতে বিভিন্ন শক্তির কাচ বসিয়ে বসিয়ে পরখ করে, দেখছে বোধ হয় ?'

আমি ঘাড় নাড়লুম। বিরাজবাবু বলতে লাগলেন—'দুপুরবেলা ল্যাবরেটরীতে কেউ ছিল না, আমি দোর বন্ধ করে একা কাজ করছিলুম। কিন্তু চশমা চোখে দিয়ে মুখ তুলেই দেখলুম একজন লোক ঠিক আমার সামনের চেয়ারে বসে একদৃষ্টে আমার পানে তাকিয়ে রয়েছে। লোকটা সায়েব, টক্‌টকে গোলাপী রং, মুখ ছুঁচোলো দাড়ি। তার অদ্ভুত বেশভূষা,···মধ্যযুগে য়ুরোপীয় যে রকম মখমলের জরিদার পোষাক পরত, সেই রকম। আমি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে তাড়াতাড়ি চশমা খুলে ফেললুম ; —দেখলুম, কেউ কোথাও নেই, চেয়ার খালি।

'খানিকক্ষণ কিছুই বুঝতে পারলুম না ; তারপর আবার চশমা পরে দেখলুম,—লোকটা বন্ধ দরজার ভিতর দিয়ে চলে গেল।'

বিরাজবাবু চুপ করলেন ! আমি রুদ্ধশ্বাসে প্রশ্ন করলুম, 'তারপর ?'

বিরাজবাবু বললেন, 'এমনই অভাবনীয় এই ঘটনা যে, ব্যাপারটা ভাল করে হজম করতেই কয়েক দিন কেটে গেল। শেষে বললুম ভুল নয়, সত্যিই অজ্ঞাতসারে একটা অপূর্ব জিনিস আবিষ্কার করে ফেলেছি—যার সাহায্যে সূক্ষ্ম দেহও প্রত্যক্ষ করা যায়।

'এ জিনিস নিয়ে কি করব, প্রথমটা ভেবেই পেলুম না। শেষে ঠিক করলুম আমাদেরর প্রিন্সিপ্যাল সাহেবকে বলব। তাঁর কাছে গেলুম, একটু উত্তেজিতভাবেই আমার আবিষ্কারের কথা বললুম। তিনি আমার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বললেন, 'সেন, আপনার শরীরটা খারাপ হয়েছে, আপনি কিছুদিন ছুটি নিয়ে বিশ্রাম করুন।'

'নিরাশ হয়ে তাঁর কাছ থেকে ফিরে এলুম। তারপর প্রফেসরদের মধ্যে আমার অন্তরঙ্গ যাঁরা ছিলেন, তাদের বললুম। তাঁরাও আমাকে ছুটি নিয়ে বিশ্রাম করবার উপদেশ দিলেন। আশ্চর্য আমাদের দেশের লোকের মনোভাব ! কেউ একবার জিনিসটা দেখতে চাইলেন না,—একবার বললেন না, দেখি আপনার কথা সত্যি কি মিথ্যে।

'মরীয়া হয়ে আমি য়ুনিভার্সিটির ভাইস্-চ্যান্সেলারকে এক দরখাস্ত করলুম। তাঁকে সব কথা জানিয়ে লিখলুম যে, তিনি যদি ইচ্ছে করেন, আমি সর্বসমক্ষে ডিমন্‌স্ট্রেট্ করে দেখাতে রাজী আছি।

হপ্তাখানেক পরে আমার চিঠির জবাব এল। ইতিমধ্যে বোধহয় আমার পাগলামির কানাঘুষো চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল ; ভাইস-চ্যান্সেলার সাহেব বিনীতভাবে আমাকে জানিয়েছেন যে, আমি যদি কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করবার দরখাস্ত করি, তা হলে তৎক্ষণাৎ আমার দরখাস্ত মঞ্জুর হবে। —রাগের মাথায় কাজ ছেড়ে দিলুম।

'তারপর সারা ভারতবর্ষে যত বিজ্ঞ সুধী আছেন, সকলের দোরে দোরে চশমা নিয়ে ঘুরে

বেড়িয়েছি,—এমন সব লোকের কাছে গিয়েছি—যাঁদের পৃথিবী-জোড়া নাম ; কিন্তু সকলের কাছেই এক উত্তর পেয়েছি। কেউ হেসেছেন, কেউ তাড়িয়ে দিয়েছেন, কেউ বলেছেন সময় নেই। কিন্তু কথাটা আমার সত্যি কি মিথ্যে, তা যাচাই করে দেখবার কৌতূহল কারুর হল না।

'যখন দেখলুম, এ দেশে এই মহামূল্য আবিষ্কারের মর্ম কেউ বুঝবে না, তখন স্থির করলুম—বিলেত যাব। সেখানে অন্তত একজন লোক আছেন—যিনি প্রকৃত তত্ত্বান্বেষী—যিনি আমার কথা না শুনে আমাকে ফিরিয়ে দেবেন না।

ইতিমধ্যে এক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটতে আরম্ভ করেছিল। বললে বিশ্বাস করবে না, চশমার ওপর নানারকম অলৌকিক উৎপাত হতে শুরু করেছিল। প্রেতলোকের যবনিকা মানুষের চোখ থেকে সরে যায়, এটা বোধ হয় তাদের অভিপ্রেত নয়, তাই রোজ চশমার ওপর নতুন নতুন দুর্ঘটনা ঘটতে লাগল। কখনও অকারণে হাত থেকে পড়ে যায়, কখনও ট্রেনে ব্যাগশুদ্ধ হারিয়ে যায়, কখনও চোরে চুরি করতে আসে—এই ধরণের ব্যাপার। যখনই চশমা চোখে দিই, দেখি, ওরা আমাকে ভয় দেখাচ্ছে, চশমাটা ভেঙ্গে ফেলিবার ইঙ্গিত করছে। একবার একটা অদৃশ্য হাত আমার মাথার চুল ধরে এমন নাড়া দিলে যে, চশমাটা চোখ থেকে ছিটকে মেঝেতে পড়ল। ভাগ্যে কার্পেট ছিল, নইলে সেই দিনই ওটা যেত। যা হোক, অনেক কষ্টে অনেক যত্নে এখন পর্যন্ত তাকে অটুট রেখেছি—জানি না, শেষ পর্যন্ত স্যার অলিভার লজের কাছে নিয়ে যেতে পারব কি না। এ হচ্ছে যাকে বলে একটা freak, এর অবিকল নকল কখনও তৈরী হবে না।

ভদ্রলোকের অত্যাশ্চর্য কথাগুলো আমার বদ্ধমূল অবিশ্বাসের গোড়ায় যেন প্রবল নাড়া দিজে গেল। আমি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে জিজ্ঞাসা করলুম, 'আচ্ছা, এই চশমা যে-কেউ চোখে দিলেই ভূত দেখতে পাবে ?'

হ্যাঁ—নিশ্চয়ই পাবে,—যদিও সে পরীক্ষা করবার সুযোগ আজ পর্যন্ত পাইনি। আমি নিজে যতবার পরেছি, ততবারই দেখেছি।'

আমি আর কৌতূহল দমন করতে না পেরে বললুম, 'তাহলে আমাকে একবার দেখাতে পারেন ?'

'নিশ্চয়ই পারি !'—তিনি আনন্দে ব্যাগটা নিজের দিকে টেনে নিয়ে বললেন, 'দেখাবার জন্যে আমি ছটফট করে বেড়াচ্ছি, কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য, কেউ দেখছে না।'

ব্যাগ খুলে তিনি সযত্নে একটি তুলোয় মোড়া চামড়ার কেস বার করলেন, তারপর অতি সন্তর্পণে কেসটি খুললেন। কেসের মধ্যে একটি মজবুত গোছের চশমা—ঠিক চশমা নয়, আজকাল এরকম বাইনকুলার চশমা বেরিয়েছে, অনেকটা সেইরকম দেখতে। সামনে কতকগুলো সবুজ কাঁচ লাগানো—তার আশেপাশে পেতলের স্ক্রু। টর্টইজ-শেলের মোটা-মোটা আর্ম। বিরাজবাবু উঠে এসে সাবধানে আমার নাকের ওপর চশমাটি বসিয়ে দিলেন।

প্রথমে কিছুই দেখতে পেলুম না—কেবল সবুজ ধোঁয়া। বিরাজবাবু স্ক্রু ঘোরাতে ঘোরাতে কম্পিতস্বরে বললেন, 'কিছু দেখতে পাচ্ছ ? এবার ? এবার ?'

ক্রমশ চোখের দৃষ্টি পরিষ্কার হতে লাগল—মনে হলো যেন ধোঁয়া আস্তে আস্তে মিলিয়ে যাচ্ছে। তারপর বায়স্কোপের ছবির মত স্পষ্ট জিনিস দেখতে পেলুম।

ঘরে যে কেরোসিনের যে ল্যাম্পটা জ্বলছিল, তাতে সামান্য আলো হচ্ছিল, কিন্তু চশমার ভেতর দেখলুম,—আলো ঢের বেশী, উজ্জ্বল অথচ মোলায়েম। সে রকম অলৌকিক আলো কখনও দেখিনি। কোথা থেকে আসছে বোঝা যায় না অথচ সর্বত্র সমানভাবে পড়েছে,—কোথাও ছায়া নেই। আশ্চর্য আলো—এইটেই বোধ হয় প্রেতলোকের দীপ্তি।

কিন্তু আলোর কথা থাক। সেই আলোতে যা দেখলাম, তা ভয়াবহ কিছু না হলেও হৃদপিণ্ডটা একবার ডিগবাজি খেয়ে কিছুক্ষণের জন্য নিস্তব্ধ হয়ে গেল। দেখলুম, টেবিল ঘিরে প্রত্যেক চেয়ারে একটি করে লোক বসে আছেন—তাঁদের পেছনে মাথার পর মাথা, ঘরের মধ্যে তিল ফেলবার জায়গা নেই। আর সবাই তীব্র নির্নিমেষ চোখে আমার পানে তাকিয়ে রয়েছেন!

বিরাজবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'দেখতে পাচ্ছ?'

গলা দিয়ে আওয়াজ বেরুল না, তাই উত্তর দেওয়া হল না। ডানদিকে মাথা ফিরিয়ে দেখি, আমার গা ঘেঁষে একটি প্রেত দাঁড়িয়ে মুখের দিকে কটমট করে তাকিয়ে আছেন। বাঁ দিকে তাকিয়ে দেখি—ঠিক তাই। আমার মাথার চুলগুলো শজারুর কাঁচার মত খাড়া হয়ে উঠল, হৃদপিণ্ডটা আবার সচল হয়ে গলার কাছে ধড়াস্ ধড়াস্ করতে লাগল।

এঁদের যে কত রকম চেহারা, তা বর্ণনা করা যায় না। সাহেব আছেন, চীনাম্যান আছেন, ভারতীয় লোক আছেন, আবার নিকষকান্তি নিগ্রোও রয়েছেন—কোনও ভেদজ্ঞান নাই। একজন শীর্ণকায় উপবীতধারী ব্রাহ্মণ এবং একটি পালক-দেওয়া টুপী পরা ষোলো শতাব্দীর সায়েব পাশাপাশি বসে রয়েছেন দেখলুম। সকলেরই দৃষ্টি আমার ওপর—ভাবে মনে হল, কেউ আমার প্রতি সন্তুষ্ট নন। যেন দাবী জন্মাবার আগেই আমি তাঁদের রাজ্যে ঢুকেছি বলে তাঁরা আমার ওপর ভয়ঙ্কর চটেছেন।

ক্রমে তাঁদের মধ্যে একটা আলোচনা শুরু হল দেখলুম। কানে কিছুই শুনতে পেলুম না, কিন্তু মুখ আর হাত নাড়া দেখে আন্দাজ হল যে, খুব উত্তেজিতভাবে তর্ক চলছে—এবং আমি যে এই তর্কের লক্ষ্যবস্তু, তাতেও সন্দেহ রইল না। শেষে সেই পৈতে-পরা শীর্ণ ব্যক্তিটি আমার দিকে ফিরে আঙুল দেখিয়ে খুব তীব্রভাবে কি বলতে আরম্ভ করলেন। কিন্তু কোনও ফল হল না, তিনি কি বললেন আমি এক বর্ণও শুনতে পেলুম না।

অনেকক্ষণ বক্তৃতা দেবার পর তিনি টেবিলের ওপর একটা নিঃশব্দ চপেটাঘাত করে চুপ করলেন। তখন আবার তাঁদের মধ্যে তুমুল তর্ক আরম্ভ হল।

এই সমস্ত ব্যাপার দেখতে দেখতে আমার মনের অবস্থাটা কি রকম হয়েছিল সে সম্বন্ধে বিশদ-ভাবে কিছু বলিনি। বলবার দরকারও নেই। তোমরা সহজেই আন্দাজ করে নিতে পারবে। চশমার ভিতর দিয়েই যে এই ভূতের রাজা দেখতে পাচ্ছি, চশমা খুলে ফেললে আর দেখতে পাব না, একথা

সাফ ভুলে গিয়েছিলুম। মনে হচ্ছিল শাদা চোখেই এঁদের দেখছি। যেন নির্জন মনুষ্যহীন একটা জায়গায় একপাল ভূতের মধ্যে এসে পড়েছি, তারা আমাকে ঘিরে বসে আমার ভাগ্য বিচার করছে!

তাদের তর্কের উত্তেজনা ক্রমেই বেড়ে উঠতে লাগল। আমার মনে হল আমাকে নিয়ে এরা ভীষণ কাণ্ড একটা কিছু বাধাবে। আমার বুদ্ধি বিবেচনা যা সামান্য অবশিষ্ট ছিল তাদের কাণ্ড দেখে তাও লুপ্ত হয়ে গেল। চশমাটা খুলে ফেললেই ল্যাঠা চুকে যেত, কিন্তু তা না করে আমি কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়ালুম।

অমনি তারাও সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাড়াল, তার পরে যেন কি একটা ভয়ঙ্কর সংকল্প করে জ্বলন্ত দৃষ্টি মেলে আস্তে আস্তে আমার দিকে অগ্রসর হতে লাগল। আমি আর চুপ থাকতে পারলুম না, বিকট চীৎকার করে চেয়ার উল্টে ফেলে দরজার দিকে দৌড় মারলুম।

প্ল্যাটফর্মে পৌঁছে দৌড়ুতে দৌড়ুতেই ঘাড় ফিরিয়ে দেখলুম, তারা তেমনই ভিড় করে আমার পিছনে তেড়ে আসছে। এই সময় একটা বিরাট রৈ-রৈ শব্দ কানে গেল—'খবরদার!' 'হুঁসিয়ার!' ট্রেন আতা হ্যায়!' সঙ্গে সঙ্গে চলন্ত ট্রেনের ফোঁস ফোঁস হড়-হড় শব্দ। ঠিক প্ল্যাটফর্মের কিনারায় পৌঁছে আমি হ্যাঁচকা মেরে নিজেকে সামলে নিলুম—গরম এঞ্জিনটা সোঁ সোঁ শব্দ করে আমার প্রায় নাকের সামনে দিয়ে বেরিয়ে গেল।

হ্যাঁচকা দিয়ে নিজেকে সামলালুম বটে, কিন্তু ভারী চশমাটা নাকের উপর থেকে ছিটকে গিয়ে পড়ল ঠিক লাইনের ওপরে, আর গাড়ির চাকাগুলো গড়গড় করে সেটাকে গুঁড়ো করে দিয়ে চলে যেতে লাগল।

আমার হাতে পায়ে আর জোর ছিল না, অবশভাবে আমি প্ল্যাটফর্মের কাঁকরের ওপরেই শুয়ে পড়লুম। চেতনা লুপ্ত হয়ে আসছিল, মাথার মধ্যে ঝিমঝিম করছিল—তারই মধ্যে ক্ষীণভাবে শুনতে লাগল, মন্দীভূত ট্রেনের চাকার আর লোহালক্কড়ের শব্দ—মনে হল, যেন এতক্ষণে সে প্রেতগুলো সবাক হয়ে আমাকে ঘিরে বিচিত্রস্বরে মহা আনন্দের হাসি হাসছে।

মিনিট কয়েক পরে সংজ্ঞা হয়ে দেখলুম, আমার চারদিকে অসংখ্য লোকের ভিড় জমে গেছে, আর বিরাজবাবু পাগলের মত আমার দুটো নড়া ধরে ঝাঁকানি দিচ্ছেন—আর বলছেন, 'কি করলে—আমার চশমা কই? আমার চশমা কই? আমার চশমা—'

মূর্ছা যাওয়াই সদ্‌যুক্তি বিবেচনা করে আমি আবার মূর্ছিত হয়ে শুয়ে পড়লুম।



টেলিফোনে গোয়েন্দাগিরি

হেমেন্দ্র কুমার রায়



॥ এক ॥

যে গল্পটি বলতে বসেছি তা গল্প বটে, কিন্তু একেবারে সত্য ঘটনা। কবি সেক্সপিয়ার বলেছেন, 'সত্য হচ্ছে, উপন্যাসের চেয়ে আশ্চর্য।' অন্তত এ-ঘটনাটি সত্য হলেও এমন আশ্চর্য যে, বিখ্যাত বিলাতী লেখক কন্যান উইল সাহেব একে অবলম্বন করেই শার্লক হোম্‌সের একটি গল্প লিখে ফেলেছেন। আমি কিন্তু শার্লক হোম্‌সের গল্প তোমাদের শোনাব না, আমি যা বলব তা হচ্ছে অস্ট্রিয়া দেশের সত্যিকার পুলিসের কাহিনী. এর প্রত্যেকটি কথা পুলিশের নিজস্ব দপ্তরে লেখা আছে।

অস্ট্রিয়ার পুলিস, চোর ডাকাত হত্যাকারী ধরবার জন্যে অনেক সময়ে এক নতুন উপায় অবলম্বন করে। ঘটনাস্থলে যে-সব জিনিস পাওয়া যায়, পুলিস সেগুলো দেয় রাসায়নিক পণ্ডিতদের হাতে। তাঁদের পরীক্ষার ফলে অপরাধীরা প্রায়ই বিচিত্র উপায়ে ধরা পড়ে। সে পরীক্ষার পদ্ধতি কি রকম, নিচের ঘটনা থেকে কতকটা আন্দাজ করা যেতে পারে।

কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে আর-একটা উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হচ্ছে, রসায়ন-শাস্ত্রের দুজন অধ্যাপক ঘটনাস্থলে থেকেই তিনশো ষাট মাইল দূরে অবস্থান করেও এবং ঘটনাস্থলে প্রাপ্ত কোন জিনিস চোখে না দেখেও আসল অপরাধী ধরে ফেলে পুলিসের চক্ষুস্থির করে দিয়েছিলেন! অপরাধের ইতিহাসে, এমন কি, কাল্পনিক গোয়েন্দা-কাহিনীতেও এ-রকম ঘটনার কথা কেউ কখনো শোনে নি!

ভিয়েনা হচ্ছে অস্ট্রিয়ার রাজধানী। ভিয়েনা শহরের পা ধুয়ে বয়ে যায় ডানিউব নদী। তার উপরে আছে কয়েকটি সাঁকো। একদিন খুব ভোরবেলায় সাঁকোর পিল্লাদার রেলিংয়ের তলায় পাওয়া গেল একটি মৃতদেহ।

দেখলেই বোঝা যায়, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির দেহ। জমকালো দামী পোশাকপরা। বয়সে লোকটি প্রাচীন। দেহের খানিক তফাতে পাওয়া গেল রিভলবার, খুব সম্ভব, হত্যাকারী তাড়াতাড়ি পালাবার সময়ে ফেলে গিয়েছে। দেহে গুলির দাগ আছে। মৃতের পকেট একেবারে খালি।

খোঁজখবর নিয়ে জানা গেল, মৃত ব্যক্তির নাম হ্যান্স্ ভোগেল, লোহার ব্যবসায়ে কোটিপতি নিয়ন্ত্রণ খেয়ে শেষ-রাতে ফিরছিলেন, পথেই এই কাণ্ড। আরও প্রকাশ পেল, তাঁর পকেটে অনেক টাকা ছিল।

পুলিস স্থির করলে, অর্থলোভে কেউ ভোগেলকে হত্যা করেছে। কিন্তু ঐ পর্যন্ত! সে যে কে, তা জানা গেল না ; কারণ, হত্যাকারী কোন সূত্র রেখে যায় নি।

পুলিশ এ মামলা নিয়ে হয়তো বেশি মাথা ঘামাতো না, কিন্তু ঘামাতে বাধ্য হল। এক জীবন-বীমা কোম্পানির অধ্যক্ষ এসে পুলিশের বড়-সাহেবকে জানালেন, "ভোগেল আমাদের কোম্পানিতে তিন লক্ষ্য টাকার জীবন-বীমা করেছেন। দুষ্ট লোকেরা আমাদের বড় বড় মক্কেলকে যদি এইভাবে খুন করে পার পায়, তাহলে বেশি ক্ষতি হয় আমাদেরই। অতএব খুনীকে ধরা চাই, আর যে ধরতে পারবে তাকে আমরা তিন হাজার টাকা পুরস্কার দেব।"

পুরস্কার বড় সামান্য নয়। হত্যাকারীকে ধরবার জন্যে পুলিসের বড়সাহেব উঠে-পড়ে লাগলেন।

॥ দুই ॥

বড়সাহেব নিজে হালে পানি না পেয়ে, বিখ্যাত রাসায়নিক প্রফেসর 'এক্স'-এর খোঁজে বেরুলেন।

কিন্তু প্রফেসর 'এক্স' তখন ভিয়েনা শহর থেকে তিনশো ষাট মাইল দূরে টাইরেল গেছেন বায়ু পরিবর্তনে।

বড়-সাহেব তাঁকে ফোন করলেন।

প্রফেসর আগাগোড়া সব শুনে বললেন, ডাক্তারের মানা আছে, আমার পক্ষে এখন ভিয়েনায় ফেরা অসম্ভব!

বড়-সাহেব এত সহজে ছোড়নেওয়ালা নন। বললেন, "আচ্ছা-প্রফেসর, ফোনের সাহায্যেই তাহলে কাজ চালানো যাক। আপনি যা বলবেন, আমি তা পালন করব। বলুন আমায় কি করতে হবে? যদি কোন দরকারী তথ্য আবিষ্কার করতে পারেন, তাহলে তিন হাজার টাকা-লাভের সম্ভাবনা!

প্রফেসর বললেন, "বহুৎ আচ্ছা, ইজি চেয়ারে এই আমি খুব আরাম করে গদীয়ান হয়ে বসলুম। আমার সামনে আছে তামাকের পাইপ, খবরের কাগজ, পেন্সিল আর টেলিফোন। বেশ, তাহলে কাজ

শুরু করা যাক···আচ্ছা, একজন 'কেমিস্ট'কে ডাকুন, আমার এই সব 'কেমিকেল' দরকার।" তিনি 'কেমিকেলের' ফর্দ দিলেন।

ভিয়েনায় পুলিসের অফিসে 'কেমিস্ট'কে আনবার জন্যে খবর পাঠানো হল।

টাইরেল থেকে ফোনে প্রফেসর বললেন, "বড়-সাহেব" ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলে যে রিভলবারটা পেয়েছেন, তার নলচেটা (barrel) খুলে ফেলুন। নলচেটার দুটো মুখই ছিপি এঁটে এমনভাবে বন্ধ করে দিন, ভিতরে যাতে ধুলো-হাওয়া ঢুকতে না পারে।"

বড়-সাহেব খানিক পরে জবাব দিলেন, "প্রফেসর, আপনার কথামত কাজ করা হয়েছে। 'কেমিস্ট'ও এসেছেন।"

টেলিফোনে 'কেমিস্ট'কে ডেকে প্রফেসর বললেন, "আমি যা বলি তাই করুন। রিভলবারের নলচের ছিপি দুটো খুলে ফেলুন। হয়েছে? আচ্ছা, খানিকটা distilled জল নলচের ভিতর পুরে বেশ করে নাড়াচাড়া করুন। হয়েছে? আচ্ছা, এইবার নলচের জলটুকু filter করে নিন।···আচ্ছা, এইবারে নলচের জলে suphuric alkahine sulphides আর salts of iron-এর খোঁজ করুন। পরীক্ষার ফল কি হল? নলচের ভিতর থেকে মর্চে, কি green crystals of ferrous sulphate পাওয়া গেল?"

—"না।"

—"যে জলটা বেরুলো তার রঙ কি হালকা হলদে নয়?"

—"না মশাই!"

—"সে কি, এত বড় অদ্ভুত কথা! আচ্ছা, ও-জলে কি sulphurettd hydrogen-এর গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে?"

—"না।"

—"তাই তো, আমি কিছু বুঝতে পারছি না! বেশ, জলের সঙ্গে salts of lead মিশিয়ে দিন তো!···কি হলো? কালো তলানি দেখতে পাচ্ছেন?"

—"উঁহু!"

—"কী!"···বিশেষজ্ঞ প্রফেসরের কাছ থেকে খানিকক্ষণ কোন জবাবই এল না। তারপর তাঁর গলা আবার পাওয়া গেল: "শুনুন! এই হত্যাকাণ্ডের মধ্যে নিশ্চয় কোন গভীর রহস্য আছে!··· নলচের জলের ভিতরে sulphuric acid পেলে প্রমাণিত হত যে, ঐ রিভলবার চব্বিশ ঘণ্টার ভিতরে ছোঁড়া হয়েছে। কিন্তু তা যখন পাওয়া যায়নি তখন বুঝতে হবে যে, রিভলবারটা ছোঁড়া হয়েছে চব্বিশ ঘণ্টার আগেই। কিন্তু তা হতে পারে না, কারণ তাহলে অমন প্রকাশ্য সাঁকোর উপর মৃতদেহটা ঘটনার আগের দিন সকালেই পাওয়া যেত! আচ্ছা, জলে বোধ হয় oxide of iron আছে?"

···"আজ্ঞে হ্যাঁ, আছে!"

—"বেশ। পুলিসের বড়-সাহেবকে ফোন ধরতে বলুন।"

বড়-সাহেব ফোন ধরে বললেন, "প্রফেসর, এ-সব কী শুনছি? ও রিভলবারটা পাওয়া গেছে লাশের ঠিক পাশেই, আর তা-থেকে যে একটা গুলি ছোঁড়া হয়েছে, সে প্রমাণও রয়েছে!"

—"হতে পারে। কিন্তু ও-রিভলবারটা মৃত ব্যক্তির মৃত্যুর জন্যে দায়ী নয়। কারণ, ওটা ছোঁড়া হয়েছে ঘটনার দেড়দিন থেকে পাঁচদিন আগে!"

—"তাহলে আত্মাদের ঠকাবার জন্যেই হত্যাকারী ওটা ওখানে ফেলে গেছে।"

—"আচ্ছা, আরেকটু পরখ করা যাক। আচ্ছা, মৃত ব্যক্তির দেহের ভিতর থেকে গুলি পাওয়া গেছে?"

—"হ্যাঁ, সেটা আমার টেবিলের উপরেই রয়েছে।"

—"গুলিটা পরীক্ষা করেছেন?"

—"এখনো করি নি।"

—"বেশ, এখন পরীক্ষা করে দেখুন দেখি, গুলিটার মাপ কত?"

…খানিক পরেই বড়-সাহেব অভিভূত কণ্ঠে বললেন, "প্রফেসর প্রফেসর! আপনি যা বলেছেন, তাই! ও গুলিটা এ-রিভলবারের ব্যাসের চেয়ে বড়! ওটা অন্য রিভলবারের গুলি!"

বড়-সাহেব প্রায় হতভম্ব! চোর-ডাকাত খুন ধরা তাঁর ব্যবসায়, ঘটনাস্থল তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন, সমস্ত প্রমাণ তাঁরই হাতে রয়েছে এবং শত শত গোয়েন্দা তাঁকে সাহায্য করেছে, অথচ একজন প্রফেসর সাড়ে তিনশো মাইল দূরে বসে, কোন-কিছু চোখে না দেখে এবং হাতে-নাতে পরীক্ষা না করে অনায়াসেই রহস্যটা ধরে ফেললেন। তাঁর আত্মসম্মানে বোধহয় অত্যন্ত আঘাত লাগল।

প্রফেসর 'এক্স্' বললেন, "বড়-সাহেব, বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরাধতত্ত্বের সহকারী প্রফেসর 'ওয়াই' সম্প্রতি আমার এখানে আছেন। এইবারে আপনি ফোনে তাঁর সঙ্গে কথা বলুন।…হ্যাঁ, আর এক জিজ্ঞাসা। মৃত ব্যক্তির জামাটা নিশ্চয়ই আপনার কাছে আছে? দেখুন তো, জামায় যেখানে গুলি ঢুকেছে, সেখানে পোড়া বারুদের দাগ আছে কিনা?"

—"আছে।"

—"হুঁ। তাহলে বোঝা যাচ্ছে, মৃতের দেহের খুব কাছ থেকেই গুলি ছোঁড়া হয়েছে। আচ্ছা প্রফেসর 'ওয়াই' কথা বলছেন।"

প্রফেসর 'ওয়াই' ফোন ধরে বললেন, "নমস্কার বড়-সাহেব ভোগেলের মৃতদেহ থেকে আপনি কি কি জিনিস পেয়েছেন, আর কি কি হারিয়েছে?"

প্রাপ্ত জিনিসের ফর্দ দিয়ে বড়-সাহেব বললেন, "কিন্তু, ভোগেলের পকেটে তিনখানা গভর্ণমেণ্টের প্রমিসরি নোট ছিল, তা পাওয়া যাচ্ছে না!"

—"বড়-সাহেব, আসল ব্যাপার আমরা কতকটা আন্দাজ করতে পারছি। কিন্তু সেটা এখন

আপনাকে বলতে পারব না। ঐ প্রমিসরি নোটগুলোর নম্বর আপনার কাছে আছে তো ?"

—"আছে।"

—"সরকারি ব্যাঙ্কের নামে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিন, যে ব্যক্তি ঐ নোটগুলো ফেরত দেবে, সে ওদের বর্তমান দামের চেয়ে বেশি মূল্য পাবে !"

বড়-সাহেব বললেন, "প্রফেসর, আপনি কি খুনীকে এতই বোকা ভাবেন যে, সে এই বিজ্ঞাপনের উত্তরে ধরা দিয়ে আত্মহত্যা করবে ?"

—"একবার বিজ্ঞাপন দিয়েই দেখুন না। আমাদের বিশ্বাস, অপরাধী নিজে না এসে, অর্থ-লোভে অন্য লোককে ব্যাঙ্কে পাঠিয়ে দেবে !"

॥ তিন ॥

পরদিনেই প্রফেসরদের ঘরে পুলিসের বড়-সাহেব ফোনের ঘণ্টা বাজিয়ে বললেন, "আশ্চর্য প্রফেসর, আশ্চর্য ব্যাপার। আপনারা যা বলেছিলেন ঠিক তাই হয়েছে ! একজন লোক সেই নোট-গুলো নিয়ে সত্যি সত্যিই ব্যাঙ্কে এসেছিল ! তাকে যে পাঠিয়েছিল, আমরা সে ব্যক্তিকেও গ্রেপ্তার করেছি !"

—"সে কি বলে ?"

—"সে ভয়ে দিশেহারা হয়ে মহা কান্নাকাটি জুড়ে দিয়েছে। বলে, ভোগেল নিমন্ত্রণ খেয়ে মাতাল হয়ে ফেরবার পথে এক জায়গায় বসে ঘুমিয়ে পড়েছিল, সেই সময়ে সে তার পকেট কেটে, নোট নিয়ে পালিয়ে এসেছে !'

—"আপনার কি মনে হল ?"

—"প্রফেসর, আমার বিশ্বাস, সে খুন করে নি। যারা মানুষ খুন করে তাদের চেহারা, ভাব-ভঙ্গি কথাবার্তা অন্যরকম হয়। আপাতত তাকে আমি গারদে পুরে রেখেছি।"

—"বেশ করেছেন। কারণ, যে যে ভোগেলের পকেট কেটেছে তাতে তো আর সন্দেহ নেই !

···বড়-সাহেব, এক কাজ করতে পারবেন ?"

—"কি কাজ ?"

—"সাঁকোর উপরে যেখানে ভোগেলের লাশ পাওয়া গেছে, একবার সেইখানে যান। সাঁকোর ধারে যে লোহার রেলিং পাবেন, তার নিচে—মনে রাখবেন ভিতরদিকে—লোহার গায়ে কোন চটা-ওঠা দাগ আছে কিনা দেখে আসুন।"

প্রফেসরের অদ্ভুত অনুরোধ শুনে পুলিস-সাহেব রীতিমত অবাক হয়ে গেলেন। রেলিংয়ের গায়ে দাগই-বা থাকবে কেন, আর থাকলেও তার সঙ্গে এই খুনের সম্পর্ক কি ?

···খানিক্ষণ পরে টেলিফোনে আবার পুলিস-সাহেবের বিস্মিত কণ্ঠস্বর শোনা গেল "হেলো প্রফেসর ! আমি দেখতে গিয়েছিলুম ! হ্যাঁ, নিচের রেলিংয়ের ভিতর দিকের রঙ এক জায়গায়

চটে গেছে বটে! নতুন দাগ! যেন সেখানে কোন-একটা ভারী জিনিস গিয়ে পড়েছিল! কিন্তু সেটা আপনি জানলেন কি করে? কেউ কি আপনাকে বলেছে?"

সশব্দে হাস্য করে খুশি গলায় প্রফেসর বললেন, "না! আমরা দুই প্রফেসরে মাথা খাটিয়ে একটা সিদ্ধান্তে উপস্থিত হয়েছি। আমরা যে গল্পটা তৈরী করেছি সেটা সত্যি কিনা, আপনার খোঁজ নিলেই বুঝতে পারবেন! এ হচ্ছে আমাদের গল্প ঃ

॥ চার ॥

ভোগেলের ব্যবসায় আজকাল খুব লোকসান হচ্ছিল, আর দুদিন পরেই হয়ত তাকে দেউলে হতে হ'ত এবং তার পরিবারবর্গ পথে বসত।

চোখের সামনে স্ত্রী-পুত্র-কন্যার দারিদ্র্যের ছবি দেখতে-দেখতে ভোগেলের প্রায় পাগলের মতন হয়ে উঠল। দিনরাত ভাবতে লাগল, এই দুর্ভাগ্যের দায় থেকে কী উপায়ে সে পরিবারবর্গকে উদ্ধার করবে?

প্রথমে সে তিন লক্ষ্য টাকায় নিজের জীবন-বীমা করলে। কিন্তু জীবন-বীমার শর্তে লেখা রইল, সে আত্মহত্যা করলে জীবন-বীমা কোম্পানী তার পরিবারবর্গকে টাকা দিতে বাধ্য থাকবে না। এ শর্ত না থাকলে ভোগেলের খুবই সুবিধা হ'ত। কারণ, সে স্থির করেছিল, এই উপায়েই পরিবার-বর্গকে রক্ষা করবে!

প্রথমে সে একটি রিভলবারে ছয়টি গুলি পুরে একটি গুলি ছুঁড়লে। সেই রিভলবারের সঙ্গে আর একটা গুলিভরা রিভলবার পকেটে পুরে তেগেল নিমন্ত্রণ বাড়িতে যায়।

অনেক রাতে নিমন্ত্রণ খেয়ে সে পথে বেরুলো। দেখলে একটা চোরের মতন লোক তার পিছু নিয়েছে। তখন তার মাথায় আর এক বুদ্ধি জুটল। সে মাতলামির অভিনয় করতে করতে এক জায়গায় বসে পড়ে ঘুমের ভান করলে! চোর তার পকেট কাটলে, কিন্তু সজ্ঞানেও সে বাধা দিলে না!

তারপর ভোগেল উঠে সাঁকোর উপরে গেল। প্রথম রিভলবারটা বার করে একটু তফাতে ফেলে দিলে। লোকে ভাববে, তাকে খুন করে পালাবার সময়ে খুনী ঐ রিভলবারটা ফেলে গেছে। রিভল-বারটা তার কাছে থাকলে পাছে কেউ ভাবে যে, ওর দ্বারা সে-ই আত্মহত্যা করেছে, তাই সেটাকে ফেলে দিলে খানিক তফাতে। দ্বিতীয় রিভলবারটি বার করে একগাছা শক্ত দড়ির একপ্রান্তে বেঁধে ফেললে। এবং দড়ির অন্যপ্রান্তে বাঁধলে একটা খুব ভারী জিনিস—খুব সম্ভব মস্ত একখানা পাথর। তারপর পাথরখানা রেলিং গলিয়ে সাঁকোর বাইরে ঝুলিয়ে দিয়ে। তারপর নিজের বুকে রিভলবার রেখে গুলি ছুঁড়লে!

হতভাগ্য ভোগেলের তখনি মৃত্যু হল। এবং সঙ্গে সঙ্গে দড়ি-বাঁধা রিভলবারটা ছিনিয়ে নিয়ে সেই মস্ত-ভারী পাথরখানা ডানিউব নদীর ভিতরে গিয়ে পড়ল। কিন্তু রেলিংয়ের ভিতর দিয়ে গলবার

সময়ে ভারী পাথরের টানে রিভলবারটা খুব জোরে রেলিংয়ের উপরে গিয়ে পড়ল—লোহার গায়ে তাই চটা-ওঠা দাগ হয়ে গেল।

বড়-সাহেব, আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, এই নাটকের দুরাত্মা ঐ পকেটমার বেচারা নয়, ভোগেল নিজেই! ডানিউব নদীতে ডুবুরী নামিয়ে খোঁজ করলেই দড়ির দুইপ্রান্তে বাঁধা সেই রিভলবার ও পাথরখানা খুঁজে পাওয়া যাবে। ভোগেল ভেবেছিল, এত চালাকির পরেও তার মৃত্যুকে কেউ আত্ম-হত্যা বলে সন্দেহ করতে পারবে না, জীবন-বীমা-কোম্পানি তার পরিবারবর্গকে তিন লক্ষ টাকা দিতে বাধ্য হবে এবং নশ্বরী নোট ভাঙাতে গিয়ে তাকে হত্যা করবার অপরাধে ধরা পড়বে ঐ পকেট-কাটাই!

"কিন্তু নিজের স্ত্রী-পুত্র-কন্যার সুখের জন্যে সে আর-এক অভাগাকে ফাঁসিকাঠে তুলে দিতে চেয়েছিল, আপন প্রাণ বিসর্জন দিয়েও, তাই সে ভগবানের দয়া পেলে না!"

॥ পাঁচ ॥

প্রফেসরদের অনুমান সব দিক দিয়েই সত্যে পরিণত হল।

ডানিউব নদীর গর্ভ থেকে দাড় বাঁধা পাথর ও রিভলবার দুইই পাওয়া গেল!

জীবন বীমা-কোম্পানি তিন লক্ষ টাকা লোকসানের দায় থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে, কৃতজ্ঞ হবে, অঙ্গীকৃত তিন হাজার টাকার চেয়েও বেশি পুরস্কার দিয়ে প্রফেসরদের খুশি করলে।

এই ব্যাপারটি কি উপন্যাসের চেয়ে আশ্চর্য নয়? কখনো কোন উপন্যাসের ডিটেকটিভও কি ঐ দুই প্রফেসরের চেয়ে বেশি বুদ্ধির পরিচয় দিতে পেরেছে? কিন্তু তোমরা কেউ এই ব্যাপারটিকে অবিশ্বাস করো না, কারণ, এটি হচ্ছে অস্ট্রিয়া দেশের একটি বিখ্যাত সত্য ঘটনা!



সাদা কৌটো

নীহার রঞ্জন গুপ্ত



॥ ১ ॥

ঘটনাটি সংবাদপত্রেই প্রকাশিত হয়েছিল।

কুখ্যাত স্মাগলার অর্থাৎ চোরা-কারবারী 'হাবিবুল্লা' কলকাতা এয়ার পোর্ট ধরা পড়েছে।

সারা ভারতবর্ষের পুলিস লোকটার সন্ধানে ফিরছিল বছর পাঁচেক ধরে কিন্তু লোকটাকে ধরতে বা ছুঁতে পারেনি।

অর্থাৎ পুলিশকে সে যথারীতি কদলী প্রদর্শন করে বহাল তবিয়েত—ভারতবর্ষের ষত্র তত্র ঘুরে বেড়িয়েছে খুশ মেজাজে। সংবাদপত্রে যেটা প্রকাশিত হয়েছিল সেটা হচ্ছে ঃ

এক টুকরি কাশ্মীরী আপেল আখরোটের মধ্যে দু 'বাক্স' 'কোকেন' পাওয়া গিয়েছে—চমৎকার ছোটো কৌটো মোড়া ছিল পাতা আর খড় দিয়ে—অন্যান্য নেওয়ার মধ্যে, ঠিক যেন দুটো আপেলপাতা মোড়া। ঐ দুই কৌটোর মধ্যে কোকেনের দাম খুব কম করে হাজার দশেক ত হবেই। কেবল তাই নয় —গোটা দুই আপেলের মধ্যে খান পাঁচেক হীরাও পাওয়া গিয়েছে—যার দাম হাজার চল্লিশ হবে অর্থাৎ মোট হাজার পঁচাত্তর টাকার মাল। চেরাই মাল।

ফলের টুকরিটা এসে ছিল সিঙ্গাপুর হ'য়ে যে প্লেনটা কলকাতায় এসেছে···সেই জেট বিমানে।

ব্যাপারটা কাস্টমস্ চেকিং-য়ে ধরা পড়েছে।

মালের সঙ্গে যে লোকটি ধরা পড়েছে সে এক পাঞ্জাবী যুবক—বছর পঁচিশ বয়স হবে। সুশ্রী কেতাদুরস্ত।

মালের ত্রিসীমানাতেও হাবিবুল্লা খান ছিল না। মালটা যখন কাস্টমসের অফিসাররা আটক করবার মতলবে ছিলেন হাবিবুল্লা খান তখন এয়ার পোর্টের বাইরে তার দামী ইমপোর্টেড্ মারসিডিজ বেঞ্জ গাড়ির মধ্যে বসে অপেক্ষা করছিল।

পুলিসের একজন তরুণ অফিসার নির্মল লাহিড়ীর মনের মধ্যে সন্দেহটা উঁকি দেওয়ায় কাস্টমসকে চোখের ইসারা করে পাঞ্জাবী লোকটাকে ছেড়ে দিতে নির্দেশ দেয়। ছাড়া পেয়ে যুবকটি যখন ঐ মাল মারসিডিজ বেঞ্জে তুলছিল পুলিস তখন ঘেরাও করে গাড়ি সমেত।

হাবিবুল্লা খান গাড়িতেই ছিল—

সকলকে গ্রেপ্তার করে লালবাজারে নিয়ে যাওয়া হয়।

হাবিবুল্লা খান নামটা জানত বিরূপাক্ষ সেন। নামটা তার অনেক আগে থাকতেই শোনা।

নির্মল লাহিড়ীর ফোন পেয়েই বিরূপাক্ষ লালবাজারে আসে। নির্মল লাহিড়ী ফোনে বলেছিল, সেন, আসুন লালবাজারে—বোধকরি এত দিনে হাবিবুল্লা খান জালে পড়েছে।

পুলিসের হাতে ধরা পড়েও হাবিবুল্লা খান যেন নির্বিকার।

হাবিবুল্লা পেশোয়ারী পাঠান—তার আসল ঘাঁটি পাকিস্তানেই। অর্থাৎ পেশোয়ারেই।

দামী সুট পরিহিত হারিবুল্লা একটা চেয়ারে বসে ছিল।

লাল টুকটুকে গায়ের রঙ—মাথার চুল কটা, চোখের মণি দুটোও পিঙ্গল।

দাড়ি গোঁফ নিখুঁতভাবে কামানো। সত্যিকারে যাকে বলে সুপুরুষ লোকটা।

পুলিসকে হাবিবুল্লা বলেছে ঐ ব্যাপারের সে কিছুই জানে না। সে গিয়েছিল এয়ার পোর্টে তার এক দোস্তকে রিসিভ করতে। ঐ পাঞ্জাবী যুবককে সে চেনে না, জীবনে কখনও দেখেও নি। প্যাঞ্জাবী যুবকটিও বলেছে সে হাবিবুল্লা খানকে চেনে না। সে অন্য গাড়ী ভেবে মালটা ক্যারিয়ারে তুলেছিল।

কিন্তু নিম'ল লাহিড়ীর ভুল হয় নি।

হাবিবুল্লা খানকে সে চিনেছে—সাহেবী পোশাকপরা থাকলেও।

হাবিবুল্লা বলছিল ডি. সি. চক্রবর্তীকে, ঝুটমুট আমাকে আপনারা হয়রানি করছেন কেন সার। আমাকে যেতে দিন। কাল সকালের ফ্লাইটে আমাকে দিল্লী গিয়ে করাচীর প্লেন ধরতে হবে। ভাছাড়া আমার এখানে জরুরী কিছু কাজ আছে—সেগুলোও সারতে হবে, আমার পাসপোর্ট ভিসা দেখুন—

বিরূপাক্ষও হাবিবুল্লা খানকে দেখেই চিনেছিল এবং বুঝেছিল নির্মল লাহিড়ী ভুল করেনি।

বিরূপাক্ষ বললে, আপনার পাসপোর্টটা একবার দেখতে পারি।

হাবিবুল্লা পকেট থেকে পাসপোর্টটা বের করে দিল।

পাকিস্তানি পাসপোর্ট।

এবং দেখা গেল দু' একমাস পর পরই ভারতে সে আসে—এবং দিল্লীতে এসে প্লেন থেকে নামে।

মিঃ খান, আপনি দেখছি প্রায়ই ভারতে আসেন—

হ্যাঁ আসতে হয় আমাকে আমার বিজনেসের ব্যাপারে।

কিসের বিজনেস আপনার, প্রশ্ন করে বিরূপাক্ষই।

হাবিবুল্লা বললে, বিজনেস ত আমার একটা নয় সার নানা ধবনের বিজনেস।

তবু—

মেইনলি চামড়ার ব্যবসা। ভারত ও অন্যানা জায়গা থেকে কাঁচা চামড়া জোগাড় করে করাচীর ফ্যাকট্রিতে ট্যানড করে ইওরোপীয় কানট্রিদের আমি সপ্লাই করি—জর্মনী, জাপান, হল্যাণ্ড, ইংলণ্ড, আমেরিকা—

আর কিছুর ব্যবসা নেই ?

আছে—রং, সিনথেটিক সিল্ক-পাট—

আর জুয়েলস ?

জুয়েলস !

হ্যাঁ হীরা চুনি পান্না, মোতি—

নেহি নেহি—হামার ব্যবসা যা আছে সে ত হামি বললাম সার—

আপনার কোকেন গাঁজা—

তোবা তোবা—এসব কি বলছেন সার—

আপনার গাড়িতে ক্যারিয়ারে যে টুকরিটা তোলা হয়েছিল তার মধ্যে মেওয়ার সঙ্গে বেআইনী জুয়েলস ও দু'কৌটো কোকেন পাওয়া গিয়েছে।

হামি ত বলেছিই ঐ টুকরির কথা কিছু হামি জানি না।

আপনার ড্রাইভার কিন্তু ক্যারিয়ার খুলে দিয়ে টুকরিটা তুলেছে আপনারই গাড়িতে—বলতে চান সব কিছুই আপনারই অজ্ঞাতে হয়েছে—আপনি ব্যাপারটা বিন্দু-বিসর্গও জানেন না।

না।

আপনার পাসপোর্টে আছে গত ৩০শে জুন আপনি দিল্লীতে এসেছেন করাচী থেকে আর ওরা জুলাই বোম্বাই এয়ার পোর্টে ঠিক অমনি একটা টুকরি কাস্টমস 'সিজ' করে—তার মধ্যেও ঠিক অমনি দুটো সাদা কৌটো—কোকেন ভরা পাওয়া গিয়েছে—

তা হবে।

আর তার মধ্যে আরো দুটো বস্তু ছিল—দুটো আমেরিকান পিস্তল।

তাতে আমার কি ?

বিরূপাক্ষ বললে, সে টুকরিটা তাজমহল হোটেলে আপনার সুইটেই পৌঁছে দেবার কথা ছিল এবং সময় আপনি 'তাজেই' ছিলেন—২০৩ নং সুইটে।

Absurd—আমি তখন এখানে কলকাতায়, হোটেলের রেজিস্ট্রি বুক দেখলেই জানতে পারবেন। নামটা হয়ত আপনার হোটেল রেজিস্ট্রীতে পাওয়া যাবে। কিন্তু ৩রা জুলাই যে আপনাকে ঐ তাজেই দেখা গিয়েছে ঐ ঘটনার ঘণ্টা খানেক আপ।

হতেই পারে মা।

নির্মল লাহিড়ী একটা ফোটো বের করে, দেখালেন, দেখুন ত হোটেলে তিনতলার করিডরে তোলা এই ফোটোটা কার? আপনি অস্বীকার করলেও কিন্তু সকলেই বলবে এটা আপনারই—তবে পোশাকটা আলাদা, একজন আরবের ছদ্মবেশে—

কই দেখি।

নির্মল লাহিড়ী ফোটোটা হাবিবুল্লা খানের হাতে দিলেন, দেখুন।

ফোটোটা দেখে হাবিবুল্লা মৃদু হেসে ফোটোটা ফিরত দিতে দিতে বললে, সার আপনাদের ভুল হচ্ছে—এ আমি নই।

আপনি নন?

না।

বিরূপাক্ষও হাসলো, বললে, ঠিক আছে—

বিরূপাক্ষ ও নির্মল লাহিড়ীর মধ্যে চোখে চোখে কথা হলো কি যেন—

তার পরেই হাবিবুল্লা খানকে ছেড়ে দেওয়া হলো।

॥ ২ ॥

হাবিবুল্লা খান লালবাজার থেকে বের হয়ে নীচে এসে তার গাড়িতে উঠে বসল!

রহমৎ—

লোকটা হাবিবুল্লার ড্রাইবার।

হোটেলে চল।

রহমৎ গাড়ি ছেড়ে দিল।

হোটেলের সামনে এসে গাড়ি থেকে নেমে হন হন করে সোজা এগিয়ে যায় হাবিবুল্লা লিফটের দিকে। ফাইভস্টার হোটেল।

চারতলার একটা ঘরে এসে ঢুকলো চাবি দিয়ে দরজা খুলে হাবিবুল্লা।

গাড়িতে ক'রে লালবাজার থেকে হোটেলের পথে আসতে আসতেই হাবিবুল্লা খান তার পরবর্তী প্ল্যান মনে মনে ছকে নিয়েছিল। এবারকার যাত্রা শুভ নয়—

কালই সে ম্যাড্রাস চলে যাবে। সেখান থেকে ধরবে শ্রীলঙ্কার প্লেন। এবং সেখান থেকে সোজা দু'মাসের জন্য লণ্ডন।

এবার আরো মুসকিল হয়েছে হাবিবুল্লার, সঙ্গে তার মা মরা মেয়ে ৬ বছরের লেড়কী রেহানাকে নিয়ে এসেছে।

রেহানার মা তমিজার মৃত্যুর পর থেকে এক মুহূর্ত, রেহানা তাকে ছেড়ে থাকতে চায় না। কান্নাকাটি করে।

হাবিবুল্লা প্লান করে এসেছিল এবার—রেহানাকে তার পিসির কাছে দুবাইতে রেখে যাবে—তারপর ইওরোপ সফরে যাবে, এয়ার পোর্টে ঐ বোনের স্বামীরই আসার কথা ছিল আজকের প্লেনে।

ঘরে ঢুকে কিন্তু থমকে দাঁড়াল হাবিবুল্লা খান।

রেহানা ঘরের মধ্যে ছিল—কই সে ?

রেহানা ঘরের মধ্যে নেই।

রেহানা বিটিয়া—

কিন্তু কোন সাড়া এলো না।

রেহানা—

না—রেহানা বেডরুমে নেই টয়লেটেও নেই।

কি হোলো। কোথায় গেল রেহানা।

দরজায় ত সে চাবি দিয়ে গিয়েছিল—একগাদা খেলনা দিয়ে ঘরের মধ্যে বসিয়ে রেখে গিয়েছিল—এয়ার পোর্টে যাবার আগে। চাবি খুলে ত সে চলে যেতে পারে না এই ঘরের ভিতর থেকে। আর কেউ যে এসে তাকে এই ঘর থেকে নিয়ে যাবে তাও সম্ভব নয়—চাবিটা তার পকেটেই ছিল। হাবিবুল্লার মত এক দুর্ধর্ষ পাঠানও যেন অন্ধকার দেখে। কোথায় গেল তার আদরের বিটিয়া রেহানা।

কোথায় যেতে পারে।

ঝুপ করে সোফাটার উপর বসে পড়ল হাবিবুল্লা—সোফাতে কার্পেটের উপর তখনো খেলনা-গুলো ছত্রাকার হয়ে পড়ে আছে।

চোখ ফেটে জল আসতে চায় হাবিবুল্লার।

সে যেন ভেবে কোন কুলকিনারা পায় না।

হঠাৎ—হঠাৎই যেন বিদ্যুৎ চমকের মত কথাটা মনে হয় হাবিবুল্লার—ব্যাপারটা পুলিসেরই গোপন কারসাজি নয়ত ?

তারা নিশ্চয়ই জেনেছে কোন মতে রেহানা—তার প্রাণের চাইতেও প্রিয়—রেহানাকে না পেলে সে পাগল হয়ে যাবে। নিশ্চই—নিশ্চই এ তাদেরই কাজ।

যেমন কথাটা মনে হওয়া—সঙ্গে সঙ্গে হাবিবুল্লা উঠে দাঁড়াল। ঘরের দরজাটা বন্ধও করল না—দ্রুতপদে করিডর অতিক্রম করে লিফটের দরজার কাছে এসে দাঁড়াল—

রহমৎ গাড়ি নিয়ে চলে গিয়েছে—ফিরবে খানা খেয়ে বেলা তিনটায়।

কোন মতে একটা ট্যাক্সি ধরে হাবিবুল্লা সোজা এল লালবাজারে।

নির্মল লাহিড়ী ও বিরূপাক্ষ মুখোমুখি দুটো চেয়ারে বসে ফিস্ ফিস্ করে কি যেন আলোচনা করছিল—ঝড়ের মত বিনা অনুমতিতে হাবিবুল্লা খান এসে সেই ঘরে ঢুকল!

হাবিবুল্লাকে ঝড়ের গতিতে ঘরে ঢুকতে দেখে বিরূপাক্ষের চোখের তারা দুটো চক্ চক্ করে ওঠে।

লাহিড়ী সাব্—

কি ব্যাপার খান সাহেব ফিরে এলে যে?

হামার লেড়কী—

তোমার লেড়কী—

হ্যাঁ—হ্যাঁ হামার বিটিয়া রেহানা কোথায়?

তোমার বিটিয়া—

হ্যাঁ—হ্যাঁ ওকে ফিরিয়ে দিন—

তোমার কথা ত কিছুই বুঝতে পারছি না খান সাহেব, বিরূপাক্ষ বললে।

হামার বিটিয়া রেহানাকে আপনারাই হোটেলের ঘর থেকে তুলে নিয়ে এসেছেন, দিন হামার বিটিয়াকে ফিরিয়ে দিন—

দিতে পারে এক শর্তে—খান সাহেব, লাহিড়ী বললে।

শর্তে!

হ্যাঁ—আজ এয়ার পোর্টে যে টুকরিটা বামাল সমেত পাওয়া গিয়েছে যদি বল সেটা কার—

কথাটা শুনে হাবিবুল্লা কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইল বিরূপাক্ষের মুখের দিকে। তারপর শান্ত গলায় বললে, হাবিবুল্লা খান আপনার কাছে হার স্বীকার করেছে, সেন সাহেব, দিন হামার বিটিয়াকে ফিরিয়ে দিন।

তাহলে ঐ চোরাই মাল তোমারই—

হ্যাঁ—হামার বিটিয়া—

লাহিড়ী একজন সার্জেণ্টকে ডেকে কি বলল ইংরেজীতে—

এবং একটু পরেই রেহানাকে কোলে করে সার্জেণ্ট এসে ঘরে ঢুকল।

রেহানা হাবিবুল্লাকে দেখে চেঁচিয়ে ওঠে—বাপী—

ছুটে গিয়ে রেহানা বাপের বিশাল বুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

বুকের উপর জাপটে ধরে রেহানাকে হাবিবুল্লা খান। তার দু' চোখে জল।

পুলিসের চেষ্টাতেই তিনদিন পরে দুবাই থেকে রেহানাকে নিতে এলো হাবিবুল্লার আত্মীয়,—হাবিবুল্লা মেয়েকে বললে, তুমি যাও বিটি—আমি শিগগিরী তোমার কাছে, যাইতে আসবো।

রেহানাকে নিয়ে চলে গেল।

হাবিবুল্লা বললে লাহিড়ীর দিকে তাকিয়ে, লাহিড়ী সাহেব তোমরা আমাকে আটকে রাখতে পারবে না। হাবিবুল্লা খানকে আটকে রাখতে পারে তামাম দুনিয়ায় এমন জেলখানা আজো তৈরী হয় নি, চল কোন জেলে হামাকে নিয়ে যাবে!

দশ দিনও গেল না—

হাবিবুল্লা খানকে ছেড়ে দিতে হলো—প্রমাণ হলো লোকটা আদৌ হাবিবুল্লা খান নয়, পাকিস্তানের দুর্ধর্ষ স্মাগলার—

যে ধরা পড়েছে তার নাম রহমৎ খাঁ—

হাবিবুল্লা খান তখন দুবায়ে পৌঁছে গিয়েছে।



অর্কর গোয়েন্দাগিরি

মঞ্জিল সেন





দেশপ্রিয় পার্ক থেকে খেলে ফেরার পথে অর্ক আর বালচন্দনের মধ্যে তর্ক বেধে গেল, এড্‌গার অ্যালান পো'র দুঁপে বড় গোয়েন্দা, না কোনান ডায়েলের শার্লক হোমস। ডিটেকটিভ বই দু'জনেরই বিস্তর পড়া, কেউই পিছু হঠতে রাজী নয়। হঠাৎ তর্কের মাঝখানে অর্ক থেমে গেল, ওর কপালে ফুটে উঠল কয়েকটা রেখা! দু'জন লোক পার্কের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের গেট দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে, খুব যেন তাড়া আছে এমন ভাবে হাঁটছে। একজনের কোলে বছর তিনেকের একটি ফুটফুটে মেয়ে। মেয়েটির হাতে একটা ফাইভ স্টার ক্যাড্‌বেরি, সেটা সে পরম আনন্দে চুষছে।

পার্কে খেলতে আসবার সময় অর্ক ওই মেয়েটিকে কয়েকবার দেখেছে। পার্কের কাছেই একটা মস্ত বড় বাড়ি থেকে মেয়েটি তার বারো তেরো বছরের দাদা আর দশ এগারো বছরের দিদির সঙ্গে পার্কে আসে। একদিন শিশু-উদ্যানেও ওদের দেখেছে অর্ক, বাচ্চা মেয়েটিকে কোলে নিয়ে ওর দিদি দোলনায় বসেছিল, আর দাদা দোল দিচ্ছিল। ওরা যে বাচ্চাটির দাদা দিদি তা চেহারা থেকেই বোঝা যায়। তিনজনেই খুব ফর্সা আর সুন্দর দেখতে। কিছুদিন হলো ওদের বাড়িটায় রঙ করা হয়েছে। দোতলার বারান্দা আর্কিড আর গোলাপের টব দিয়ে সাজানো।

লোক দুটি এদিক ওদিক তাকাচ্ছেন, কেমন যেন সন্দেহজনক আচরণ। ওদের আগে কখনও দেখেনি অর্ক। বাচ্চার দাদা দিদিই বা সঙ্গে নেই কেন? লোক দুটি রাস্তা পেরিয়ে ওপারে গেল, একটা চলন্ত ট্যাক্সির দিকে হাত তুলে থামতে বলল। ট্যাক্সিটা কিন্তু থামল না। লোক দুটো যেন মরিয়া হয়ে উঠেছে। ট্যাক্সির জন্য ছুটোছুটি করছে। তখুনি অর্কর মাথায় জেগে উঠল একটা ভয়ানক

সম্ভাবনা। ওরা কি মেয়েটিকে নিয়ে পালাচ্ছে! শিশু-উদ্যানে ভিড়ের মধ্যে ওর দাদা দিদি যখন অন্যমনস্ক তখন মেয়েটিকে সরিয়ে ফেলেছে। যাতে না কাঁদে তাই ক্যাড্‌বেরি ধরিয়ে দিয়েছে হাতে!

অর্ক হঠাৎ চুপ করে যাওয়াতে বালচন্দ্রন একটু অবাক হয়েই ওর মুখের দিকে তাকিয়েছিল, তারপর ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে লোক দুটিকে দেখে বুঝতে পারল কিছু একটা ঘটেছে।

'হোয়াটস দ্য প্রবলেম?' ও জিগ্যেস করল।

'লোক দুটো নিশ্চয়ই ওই বাচ্চাটাকে কিড্‌ন্যাপ করছে,' অর্ক বলল।

লোক দুটি ততক্ষণে একটা ট্যাক্সি থামিয়ে ভেতরে উঠে বসেছে। ট্যাক্সি রাসবিহারী মোড়ের দিকে যাচ্ছিল, কিন্তু ট্রাফিক সিগন্যালের জন্য থেমে গেছে। অর্ক বালচন্দ্রনের একটা হাত ধরে উত্তেজিত কণ্ঠে বলল, 'কাম অন্।'

একটা খালি ট্যাক্সি ওদের সামনেই থেমেছিল, সামনের ট্র্যাফিক সিগন্যালের জন্য পর পর গাড়ি দাঁড়িয়ে গেছে। ট্যাক্সি ড্রাইভারের কাছে গিয়ে নিচু গলায় অর্ক বলল, 'ওই ট্যাক্সিতে দু'জন লোক একটা বাচ্চা মেয়েকে চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে, আমরা ওদের ফলো করতে চাই। যাবেন?'

'বাচ্চা মেয়েকে চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে!' ট্যাক্সি ড্রাইভারের দু'চোখে একটা অনিশ্চয়তার ছায়া খেলে গেল। 'কি করে বুঝলে?'

'আমি মেয়েটিকে চিনি,' অর্ক জরুরী গলায় বলল, 'ওর দাদা আর দিদির সঙ্গে পার্কে বেড়াতে আসে। ওই লোক দুটিকে আগে কখনও দেখিনি। মনে হচ্ছে দাদা দিদির চোখ এড়িয়ে ওরা ওকে তুলে নিয়ে যাচ্ছে।'

ততক্ষণে সিগন্যাল পেয়ে সব গাড়ি চলতে শুরু করেছে।

'উঠে পড়' ড্রাইভার বলল। একটা অ্যাড্‌ভেনচারের নেশা তাকেও যেন পেয়ে বসেছে।

'আপনি ভাড়ার জন্য ভাববেন না,' গাড়িতে উঠতে উঠতে অর্ক বলল, 'আমরা এই ট্যাক্সি করেই বাড়ি ফিরব, তখন ভাড়া দিয়ে দেব। আর ওদের যদি ধরতে পারি তবে তো কথাই নেই—'

'ঠিক আছে,' ড্রাইভার বলল, 'ও নিয়ে তোমাদের চিন্তা করতে হবে না ··আমি ট্যাক্সিটার পিছু নিচ্ছি, তোমরাও নজর রাখ, যাতে ভিড়ের মধ্যে চোখের আড়াল না হয়ে যায়।'

'ওরা জানে না যে আমরা ওদের ফলো করেছি,' অর্ক বলল, 'সেই সুবিধাটুকু আমাদের পুরোপুরি কাজে লাগাতে হবে।'

আগের ট্যাক্সিটা চেতলা ব্রিজ পেরিয়ে সোজা গিয়ে বাঁ দিকে ঘুরল। দুর্গাপুর ব্রিজ হয়ে, নিউ আলিপুরের ভেতর দিয়ে, ডায়মণ্ড হারবার রোড ধরে পড়ল বেহালায়। ট্রাম ডিপোকে বাঁ পাশে রেখে ট্যাক্সিটা চলেছে ব্রাহ্মসমাজ রোড ধরে।

ওরা লক্ষ্য করছিল সামনের ট্যাক্সির আরোহী দু'জন মাঝে মাঝেই পেছনের কাচ দিয়ে দেখছিল অর্কদের ট্যাক্সির ড্রাইভারও সেটা লক্ষ্য করছিল. তাই সে যতদূর সম্ভব দু'একটা গাড়ির পেছনে নিজের গাড়িকে রাখবার চেষ্টা করছিল। কিন্তু একবার কিছুক্ষণের জন্য আগের ট্যাক্সির পেছনে আর কোনো গাড়ি না থাকায় ওদেরটা একা হয়ে পড়ল। একটা দারুণ উৎকণ্ঠায় মন ভরে গেল অর্কদের। দুষ্টু লোক দু'জন কি বুঝতে পেরেছে যে ওদের অনুসরণ করা হচ্ছে!

হঠাৎ সামনের ট্যাক্সিটা ডান দিকের একটা গলিতে ঢুকল। অর্কদের ড্রাইভারও পিছু নিল। এবার আর ফাঁকি দেবার উপায় নেই, লোক দুটো পেছন ফিরে ওদের গাড়িটা লক্ষ্য করে কি যেন বলাবলি করল, অন্তত তাই মনে হলো অর্কদের। ওদের ড্রাইভার গাড়ির গতি কমিয়ে দিয়ে পিছিয়ে পড়ল, বেশি কাছাকাছি না যাওয়াই ভাল। ওদের কাছে বোমাটোমা থাকতে পারে। খানিকটা গিয়ে সামনের গাড়িটা বাঁ দিক ঘেঁষে থামল।

'আপনি গাড়ি থামাবেন না,' অর্ক ড্রাইভারকে বলল, 'মনে হয় ওরা সন্দেহ করেছে। আমরা এগিয়ে সুবিধে মতো একটা জায়গায় থামব যাতে ওদের ওপর নজর রাখতে পারি।'

'ঠিক আছে,' ড্রাইভার জবাব দিল।

ওরা যখন ওই ট্যাক্সিটার পাশ দিয়ে যাচ্ছে, অর্ক আর বালচন্দ্রন আড়চোখে তাকিয়ে দেখল একজন পেছনের সীটের জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে ওদের গাড়ির ভেতরটা দেখবার চেষ্টা করছে, আরেকজন বাচ্চাকে আঁকড়ে ধরে আছে। বাচ্চাটার কান্নার শব্দ ওদের কানে এল।

খানিকটা এগিয়েই রাস্তাটা আবার ডান দিকে মোড় নিয়েছে। অর্কর নির্দেশ মতো গাড়িটা সেই গলিতে ঢুকল। তারপর একটা বাড়ির সামনে ট্যাক্সি থামিয়ে অর্ক ড্রাইভারকে বলল, আপনি এখানে অপেক্ষা করুন, আমরা দু'জন গিয়ে দেখি ওরা কোন দিকে যায়।

'উঁহু তোমরা ছেলেমানুষ,' ট্যাক্সি থেকে নামতে নামতে ড্রাইভার বলল, 'চল, আমিও তোমাদের সঙ্গে যাই।'

ওরা হেঁটে ফিরে চলল। যেখানে আগের ট্যাক্সিটা থেমেছিল, এখন সেখানে ওটা নেই, সেই লোক দু'জনকেও চোখে পড়ল না। ওরা খুব হতাশ হয়ে পড়ল। এদিক ওদিক তাকিয়েও দুষ্টু লোকদের কোনো হদিস পাওয়া গেল না। ট্যাক্সি যেখানে থেমেছিল তার বাঁ দিকে একটা সরু গলি দক্ষিণে বরাবর চলে গেছে। লোক দুটো নিশ্চয়ই ওই পথে পালিয়েছে।

ওই গলির মুখ একটু ছাড়িয়ে উল্টোদিকে একটা বাড়ির রকে সাত আটজন তরুণ আড্ডা দিচ্ছিল। পনেরো থেকে সতেরো আঠারো সব বয়েসের ছেলেই আছে সেই দলে। অর্ক তাদের দিকে এগিয়ে গেল, একজনকে লক্ষ্য করে বলল, 'দাদা, একটু আগে এখানে একটা ট্যাক্সি থেমেছিল, আপনারা কেউ দেখেছিলেন?'

'কেন, তা দিয়ে তোমার কি দরকার?' একজন রুক্ষ গলায় পালটা প্রশ্ন করল।

'কি মতলব তোমার ?' আরেকজন বলল, 'কি নাম তোমার, থাক কোথায় ?'

'আমার নাম অর্ক চৌধুরী, আমি থাকি বালিগঞ্জের দিকে,' অর্ক একটু থতমত খেয়ে জবাব দিল।

'বালিগঞ্জ! তা কি মতলবে এসেছ চাঁদু,' আরেকজন বলল, 'কোথায় পা ফেলেছ জান ?

আসলে ওরা এ পাড়ার মাতব্বর, নিজেদের ক্ষমতা জাহির করবার সুযোগ ছাড়বে কেন!

'যে ট্যাক্সিটার কথা আমি বলছি,' অর্ক এবার গুছিয়ে বলল, 'সেটায় দু'জন গুণ্ডা এক বাচ্চা মেয়েকে দেশপ্রিয় পার্ক থেকে চুরি করে এনেছে। আমরা ট্যাক্সিটাকে ফলো করে এসেছি·· ওরা বুঝতে পেরেছিল তাই আমরা আমাদের ট্যাক্সি এখানে থামাইনি, ওই মোড়ের কাছে গিয়ে থামিয়েছিলাম। কিন্তু এখানে এসে সেই ট্যাক্সিটাকে দেখতে পাচ্ছি না।'

'অর্ক!' হঠাৎ ওদের মধ্যে একজন কিশোর বলে উঠল, 'মানে গোয়েন্দা অর্ক! কাগজে যার কাহিনী ছাপা হয়েছিল ?'

'হ্যাঁ,' একটু লাজুক মুখে জবাব দিল অর্ক।

ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে দৃশ্য গেল বদলে। তরুণের দল অর্ককে সাহায্য করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ল, একজন বলল, 'হ্যাঁ, একটা ট্যাক্সিকে থামতে দেখেছি। দু'জন লোক গাড়ি থেকে নেমে ড্রাইভারের ভাড়া মিটিয়ে ওই গলির মধ্যে ঢুকেছিল। ভাড়া নিয়ে ড্রাইভারের সঙ্গে একটু যেন কথা কাটাকাটি হয়েছিল, বাচ্চাটা কাঁদছিল। তারপর ট্যাক্সিটা চলে গিয়েছিল। ওটার নম্বরটা খেয়াল করিনি।'

'ডব্লু, বি, টি, ৮৭০৫,' অর্ক বলল।

ইতিমধ্যে বালচন্দন আর ওদের ট্যাক্সির ড্রাইভার ওখানে এসে গেছে, অর্ক ওদের পরিচয় করিয়ে দিল।

ছেলেরাই ওদের নিয়ে ওই গলির মধ্যে ঢুকে পড়ল, যার সঙ্গেই দেখা হলো তাকেই জিজ্ঞেস করল এক বাচ্চা মেয়েকে নিয়ে দু'জন লোককে যেতে দেখেছে কিনা। গলিটায় আলো তেমন নেই, সন্ধ্যেও হয়ে গেছে অনেকক্ষণ, লোক চলাচল তেমন ছিল না, বিশেষ সুবিধে হলো না। তবে গলিটা ওধারে যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানে মোড়ের মাথায় একটা চায়ের দোকানের মালিক বলল, দু'জন লোককে একটা বাচ্চা নিয়ে যেতে দেখেছে। তারা হন্তদন্ত হয়ে হাঁটছিল। বাচ্চাটা একটা লালিপপ্ চুষছিল। দোকানের মালিক আর লক্ষ্য করেনি। অনেক চেষ্টা করেও লোক দুটি সম্বন্ধে আর কিছু জানা গেল না, কোনদিকে গেছে তাও না।

তরুণ দলের কাছে বাচ্চার এবং লোক দু'জনের চেহারার বর্ণনা দিয়ে আর খোঁজখবর করতে অনুরোধ করে অর্ক আর বালচন্দন ফিরে চলল। একটা হতাশায় অর্কর মন ভরে গেছে। চোখের সামনে থেকেই গুণ্ডারা মেয়েটিকে নিয়ে পালিয়ে গেল।

বালচন্দন ওর মনের ভাব বুঝতে পেরে বলল, 'ডোণ্ট ওরি, উই শ্যাল ক্যাচ দেম।,

এদিকে আটটা বেজে গেছে, বাড়িতে নিশ্চয়ই চিন্তা করছে। ওরা প্রথমে বাড়ি গেল। দু'জনের

বাড়িতেই খোঁজ পড়ে গিয়েছিল, আরেকটু দেরি হলেই থানায় গিয়ে রিপোর্ট করতেন অর্ক আর বালচন্দনের বাবা। অর্ক বাবার কাছ থেকে টাকা নিয়ে প্রথমেই ট্যাক্সি ড্রাইভারের ভাড়া মিটিয়ে দিল। সে বলল, আমি তোমাদের কোনো উপকার করতে পারলাম না, ভাড়া নিতে খারাপ লাগছে। কিন্তু ট্যাক্সির মালিক আমাকে ছাড়বে না; তাই নিতে হচ্ছে। তবে যদি কখনও ট্যাক্সির দরকার হয়, যে সময়েই হোক, এই ঠিকানায় খোঁজ করবে, যত অসুবিধেই হোক গাড়ি নিয়ে আমি ঠিক হাজির হবো।'

অর্ক ওর বাবাকে সমস্ত ঘটনা খুলে বলল। তিনি তখুনি গাড়ি করে অর্ককে নিয়ে মেয়েটির বাড়ি রওনা হলেন।

বাড়ির সামনে মানুষের জটলা, একটা পুলিশের গাড়িও চোখে পড়ল। অর্ক ওর বাবাকে নিয়ে বাড়ির ভেতর ঢুকে পড়ল। সামনের ঘরেই একটা সোফায় এক মাঝবয়সী মহিলা মুখে আঁচল দিয়ে কাঁদছেন, একজন ভদ্রলোক বিমর্ষ মুখে তাঁর পাশে বসে আছেন। তাঁদের পাশে অপরাধীর মতো দাঁড়িয়ে আছে বাচ্চা মেয়েটির দাদা আর দিদি। রোজকার মতো ছোটবোনকে নিয়ে ওরা পার্কে গিয়েছিল, একটু অন্যমনস্ক হয়েছিল, তারপরই দেখে পাশে বোন নেই। অনেক খুঁজেছে কিন্তু বোনকে পায়নি।

টালিগঞ্জ থানার ও, সি, কি সব নোট করছিলেন। অর্ক আর ওর বাবাকে দেখে অবাক হয়ে বললেন, 'এ কি আপনারা!'

অর্ক আর ওর বাবার সঙ্গে ও, সি,-র এতদিনে একটা হৃদ্যতা গড়ে উঠেছে, বিশেষ করে অর্ককে তিনি স্নেহের চোখে দেখেন। এই কিশোর ছেলেটির বুদ্ধি আর সাহস তাঁর মনেও দাগ কেটেছে।

'এ বাড়ির যে বাচ্চা মেয়েটি চুরি হয়েছে,' অর্ক ও. সি.-র মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'সে সম্বন্ধে আমি কিছু খবর দিতে চাই।'

'সে কি!' ও- সি. যেন আকাশ থেকে পড়লেন, 'ও ব্যাপারে তুমি কি জান?'

অর্ক তখন গোড়া থোক সমস্ত ঘটনা খুলে বলল।

'সাব্বাস!' ও. সি. ওর পিঠ চাপড়ে বলে উঠলেন, 'তুমি তো আমাদের পরিশ্রমের অনেকটাই বাঁচিয়ে দিলে! এই না হলে গোয়েন্দা অর্ক।'

বেহালা থানার ও. সি.-র সঙ্গে তিনি তখুনি যোগাযোগ করলেন, লোক দুটির চেহারার বর্ণনাও দিলেন। যেখানে ওদের শেষবার দেখা গিয়েছিল তার ধারে কাছে ওদের আস্তানা হতে পারে বলে জানালেন। ট্যাক্সির নম্বরটাও অর্ক জানিয়ে দিল।

মেয়েটির বাবাকে আশ্বাস দিয়ে পুলিশ বিদায় নিল, অর্ক আর ওর বাবাও ফিরে গেলেন।

পরদিনই মেয়েটির বাবা ফোন পেলেন। এক লাখ টাকার বদলে মেয়েটিকে মুক্তি দেওয়া হবে।

আর তা না হলে মায়ের মরা মুখ দেখবেন বাবা। কোথায় কখন টাকা দিতে হবে তা পরে জানানো হবে। পুলিশের শরণাপন্ন হলে মেয়েকে আর ফিরে পাবেন না।

পুলিশ অবশ্য তৎপর হয়ে উঠল। বেহালা থানার ও. সি. ওই জায়গায় চর পাঠিয়ে লোক দু'জনের খোঁজ করতে লাগলেন।

ওদিকে অর্কর মাথায় তখন কয়েকটা প্রশ্ন জেগেছে। বালচন্দ্রনকে নিয়ে ও টালিগঞ্জ থানার ও, সি,-র সঙ্গে দেখা করল। তিনি ওদের দেখে বললেন, 'এসো গোয়েন্দা কোম্পানি, তোমাদের কথাই ভাবছিলাম। কোনো খবর আছে নাকি? শুনেছ তো মিঃ বোস (বাচ্চা মেয়েটির বাবা) লাখ টাকার পরোয়ানা পেয়েছেন। উনি এক কোম্পানির ডিরেক্টর, পয়সাওলা লোক, এসব খবর চোররা রাখে দেখা যাচ্ছে।'

'আমরা সেই বিষয়েই আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি,' অর্ক বলল, 'লোকদুটো থাকে বেহালায়। সেখান থেকে এতদূরে বেছে বেছে ওই বাড়ির মেয়েকেই তারা চুরি করল, তাই মনে হয় বেশ ভেবে-চিন্তে প্ল্যান করে এ কাজ করা হয়েছে।

'হ্যাঁ, তোমার কথার যুক্তি আছে,' ও, সি, সপ্রশংস কণ্ঠে বললেন।

'আমার ধারণা ও বাড়িরই কেউ ওদের খবর যুগিয়েছে।'

'রাইট ইউ আর,' ও. সি. প্রায় লাফিয়ে উঠলেন, 'এ সম্ভাবনাটা আমার আগেই ভাবা উচিত ছিল। এখন আমাদের দেখতে হবে ও বাড়ির কারও বেহালায় কোনো আত্মীয় বা জানাশোনা কেউ আছে কিনা।'

'আমারও মনে হয় সেদিক দিয়ে খোঁজ খবর করলে ওই দুষ্টু লোকদের হদিস পাওয়া যাবে,' অর্ক বলল।

'গুড্ আইডিয়া,' ও. সি. বললেন, 'চল দেখি বোস সাহেবের বাড়ি যাওয়া যাক।'

মিঃ বোস আপনি যাননি, বাড়িতেই ছিলেন। সমস্ত বাড়িতে যেন একট শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

ও, সি,-র বক্তব্য শুনে মিঃ বোস একটু চিন্তা করে বললেন, 'বেহালায় আমাদের কেউ নেই।'

'আপনার বাড়িতে যারা কাজ করে তাদের কেউ কি বেহালায় থাকে?' ও. সি. জানতে চাইলেন।

'যারা কাজ করে তাদের মধ্যে আছে একজন ওড়িয়া ঠাকুর, সে দু'বেলা রান্না করে চলে যায়, ভবানীপুরে দেশের লোকজনের সঙ্গে থাকে, বেহালায় তার কেউ আছে বলে জানি না। আর আছে কাত্যায়নী। বাংলাদেশের এক উদ্বাস্তু বিধবা, সংসারে তার আর কেউ নেই। আমাদের বাড়ি প্রায় কুড়ি বছর আছে, বেহালায় তার কেউ আছে বলে শুনিনি। তা ছাড়া একজন ঠিকে কাজের মেয়ে আছে। সে একবেলাই আসে, ঘর ঝাড়-মোছ করে। ও, হ্যাঁ, আমার ড্রাইভার রামকিষেণের নাম বলতে ভুলে গেছি। ছাপরা জেলায় বাড়ি, দশ বছরের উপর আমার গাড়ি চালাচ্ছে। এখানেই থাকে। বেহালায় তারও কেউ নেই।'

আপনার ঠাকুর কত বছর কাজ করছে ?'

'তা বছর পাঁচেকের বেশিই হবে, এর আগে ওর কাকা রান্নার কাজ করত, সে-ই ওকে দিয়ে দেশে চলে গেছে।'

'হুঁ। আর ঠিকে কাজ করার মেয়েটি ?'

'সে অবিশ্যি অল্পদিন হলো ঢুকেছে, দু' মাসের বেশি হবে না। তবে সে আমাদের পাশের বাড়িতে এক বুড়ি কাজ করে, তার ভাইঝি—ওই বুড়ি অনেকদিন ধরে ও বাড়িতে কাজ করছে। ভাইঝিকে দেশ থেকে আনিয়েছে।'

'তার আগে যে ছিল, সে কি কাজ ছেড়ে দিয়েছে ?' ও, সি, একটু ভুরু কুঁচকে জিগ্যেস করলেন।

'না, তা ঠিক নয়,' মিঃ বোস জবাব দিলেন, 'আসলে সেই মেয়েটির হাতটান ছিল, এটা ওটা সরাচ্ছিল। তা ছাড়া মাঝে মাঝেই ওর কাছে লোকজন দেখা করতে আসত, কাজের সময় এখানে তাদের আসাটা আমার স্ত্রীর পছন্দ ছিল না।'

'আই সী,' ও, সি, আপন মনেই বললেন।

'যারা ওর কাছে আসত তাদের চেহারা বলতে পারেন ?' অর্ক হঠাৎ প্রশ্ন করল!

মিঃ বোস ওর মুখের দিকে এক পলক তাকালেন, তারপর বললেল, 'একদিন একজনকে আমি যখন তখন বাড়িতে আসার জন্য ধমকেছিলাম। তার গায়ের রঙ ময়লা, গাট্টাগোট্টা চেহারা, চুলের সামনে সাপের মতো ফণা আর বাঁ হাতে একটা লোহার বালা ছিল। লোকটাকে আমার ভাল লাগেনি, যাবার সময় কটমট করে তাকাচ্ছিল।'

'আপনি বলছেন সেই লোকটার চুল সাপের হুডের (hood) মতো ছিল,' বালচন্দ্রন উত্তেজিত কণ্ঠে বলল, 'যে দু'জন আপনার মেয়েকে চুরি করেছে তাদের একজনের মাথার চুল অমন ছিল, আমার স্পষ্ট মনে আছে।'

'হ্যাঁ' অর্ক সায় দিল, 'আমারও মনে পড়ছে, তাঁর বাঁ হাতে একটা লোহার বালা ছিল।'

'সেই মেয়েটি কোথায় থাকে জানেন ?' ও, সি, জিগ্যেস করলেন, 'না, সে খবরও রাখেন না ?'

'না,' ম্লান মুখে ঘাড় নাড়লেন মিঃ বোস।

'কি মুস্কিল!' ও, সি, মন্তব্য করলেন, তারপর বললেন, আপনাদের কাত্যায়নীকে একবার ডাকুন তো তার কাছে মেয়েটি ঘরের কথা কিছু বলে টলে থাকতে পারে।'

কাত্যায়নীর বয়স প্রায় ষাটের কাছাকাছি। শক্ত কাঠির মতো চেহারা, মাথায় কদমছাঁট চুল। বাংলাদেশে সবকিছু হারিয়ে আসার পর এ বাড়িতে ঠাঁই পেয়েছিল, তাই এ বাড়ির ওপর তার একটা মায়া পড়ে গেছে।

ও, সি,-র প্রশ্নের জবাবে সে বলল সুবালা, মানে সেই কাজের মেয়েটি, টালিগঞ্জ ব্রিজ পেরিয়ে বাঁ

[illegible] থাকে, তাকে বলেছিল। মেয়েটার স্বামী অনেকদিন নিরুদ্দেশ। কয়েক বাড়িতে ঠিকে কাজ করে সে পেট চালায়। বেহালায় ওর স্বামীর এক ভাই আছে, সেই নাকি মাঝে মাঝে দেখা করতে আসত।

ও, সি, তখুনি গাড়ি নিয়ে ছুটলেন। বস্তিটা খুঁজে বার করতে বেশি সময় লাগল না। পুলিশের গাড়ি দেখে ভিড় জমে গেল। ও, সি,-র প্রশ্নের জবাবে বস্তিবাসীরা জানাল, সুবালা কয়েক বছর ধরেই ওখানে ছিল, দিন কয়েক হলো ঘর ছেড়ে চলে গেছে। বলেছে, এক বড়লোকের বাড়িতে খাওয়া-পরার কাজ পেয়ে চলে যাচ্ছে। সাপের ফণার মতো চুলওলা লোকটির নাম বিশে, সে নাকি সুবালার স্বামীর কি রকম ভাই, মাঝে মাঝে সুবালার কাছে আসত। ইদানীং আরেকজনও তার সঙ্গে থাকত, ঢ্যাঙ্গামতো। একবার সুবালার সঙ্গে বস্তির মানুষদের ঝগড়া হওয়ায় বিশে বলেছিল বোমা মেরে বস্তি উড়িয়ে দেবে, আর তার সাথী একটা বড় ছোরা বার করে নাচাচ্ছিল। এটা হলো দিন পনেরো আগের ঘটনা, তার কয়েকদিন পরেই সুবালা ঘর ছেড়ে চলে গেছে।

ও, সি, ফিরে এলেন। ওদের কোনো হদিস পাওয়া গেল না। তবে লোক দু'জনের এবং সুবালার চেহারার বিস্তারিত বর্ণনা এবং তাদের নাম বেহালার থানাকে জানিয়ে দেওয়া হলো। পুলিশের বেতার ভ্যানে ভ্যানেও খবর চলে গেল।

যে ট্যাক্সিতে বিশেরা মেয়েটিকে নিয়ে গিয়েছিল তার নম্বর ধরে ড্রাইভারের সন্ধান পাওয়া গেল। সে কিন্তু বিশেষ কিছু বলতে পারল না। দেশপ্রিয় পার্কের কাছ থেকে ওরা ট্যাক্সি ভাড়া করেছিল। লোক দু'জনের হাব-ভাব ড্রাইভারের ভাল লাগেনি, তবে মেয়েটিকে তারা চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে এমন সম্ভাবনা তার মাথায় আসেনি।

এত করেও বেহালা থানা কিন্তু লোক দুটির কিংবা সুবালার সন্ধান পেল না। বেহালা মস্ত জায়গা, কোথায় যে ওরা গা-ঢাকা দিয়েছে পুলিশ খুঁজেই পেল না। হয় ওরা খুব সাবধান হয়ে গেছে, নয় বেহালা ছেড়ে অন্য কোথাও ঘাঁটি গেড়েছে। বেহালার আশ-পাশ অঞ্চলকে ওদের সম্বন্ধে সাবধান করে দেওয়া হলো।

এদিকে মিঃ বোসের কাছে টাকা ঠিক করে রাখার জন্য চিঠি এসেছে, একটা অ্যাটাচি কেসে টাকাটা ভরে ওদের হাতে তুলে দিতে হবে। সময়, তারিখ এবং কোথায় তা যথাসময় জানতে পারবেন মিঃ বোস। খামের ওপর নিউ আলিপুরের ডাকঘরের ছাপ। বেহালরে যে অঞ্চলে অর্করা শেষ ওদের দেখেছিল, তার কাছাকাছি যদি ওদের ঘাঁটি হয়, তবে চিঠিটা ডাকবাক্সে ফেলার জন্য নিশ্চয়ই ওদের একজনকে নিউ আলিপুরে আসতে হয়েছিল। আসলে ঢ্যাঙ্গা লোকটা আর সুবালার মতো চেহারার মানুষ পথেঘাটে এত ঘুরছে যে, কাকে সন্দেহ করবে পুলিশ। তবু বিশেষ চেহারায় একটু বৈশিষ্ট্য আছে। কালো গাট্টাগোট্টা আর চুলের সামনেটা সাপের ফণার মতো।

গরমের ছুটি শুরু হয়েছে, অর্কদের হাতে এখন অখণ্ড অবসর। ও বালচন্দ্রনের সঙ্গে পরামর্শ

করল, পুলিশের ভরসায় না থেকে ওরা নিজেরাই বেহালায় লেকে দু'জনের সন্ধান করবে।

ওদের শেষ দেখা গিয়েছিল যে চায়ের দোকানের সামনে, সেখানে রাস্তাটা চওড়া নয়, একটা পাড়ার ভেতর দিয়ে গেছে। তবে সেই রাস্তা দিয়ে বড় রাস্তায় পড়া যায়। ও জায়গাটা পুলিশ তন্ন-তন্ন করে তল্লাশি চালিয়েছে. সুতরাং নতুন করে কিছু জানবার ওদের নেই। হঠাৎ একটা চিন্তা মাথায় এল অর্কর। বালচন্দ্রনকে ও বলল, ,দ্যাখ, আমার মনে হয় ওরা এখানেই কোথাও আছে। বিশে এদিকেই থাকত, হয়তো কাছাকাছি কোনো বস্তিতে ঘর নিয়ে আছে। ওর পক্ষে বস্তিতে থাকা সম্ভব। ওরা নিশ্চয়ই প্লান করে মেয়েটিকে চুরি করেছে, সুবালা তার আগেই মেয়েটির ভার নেবার জন্য টালিগঞ্জের বস্তি ছেড়ে এখানে এসেছে। মেয়েটি ওকে চেনে, আগে বাড়িতে দেখেছে, তাই তার পক্ষে ওকে ভুলিয়ে রাখাও খুব কষ্ট নয়। সুতরাং আমরা এখানে কাছাকাছি কোথায় কোথায় বস্তি আছে তা খোঁজ করে সেখানে নজর রাখব।'

'গুড্ আইডিয়া,' বালচন্দ্র বলল।

প্রথম যে বস্তিটার খোঁজ ওরা পেল সেটা বড় রাস্তার ওপরে। বেশ খানিকটা জায়গা নিয়ে বস্তিটা। ঘরও অনেক। ওরা একটু দূরে গাছের আড়াল থেকে বস্তির ওপর নজর রাখতে লাগল। ওরা এমনভাবে কথা বলছিল যেন দু'বন্ধু আড্ডা মারছে, কিন্তু চোখ বস্তির দিকে। কে আসছে যাচ্ছে তা খেয়াল রাখছে। প্রথম দিনটা বৃথাই গেল। কালো ষণ্ডামার্কা, সামনের চুল সাপের ফণার মতো, কিংবা ঢ্যাঙ্গা লোকটা ওদের নজরে পড়ল না। সুবালাকে ওরা দেখেনি তাই চেহারার বর্ণনা থেকে নাও চিনতে পারে। বস্তি থেকে অনেক মেয়েই আসছে, কাজে যাচ্ছে, তাদের কাউকেই সুবালা মনে হয় না।

সকালে দু'ঘণ্টা আর বিকেলে দু'ঘণ্টা ওরা পাহারা দিল। দ্বিতীয় দিন বিকেলে অর্ক বলল, 'এভাবে হবে না, কাউকে জিগ্যেস করতে হবে।'

একজন বুড়ি বস্তি থেকে বেরিয়ে ওদের দিকেই আসছিল। অর্ক আর বালচন্দ্রন একটু হেঁটে হঠাৎ যেন সেই বুড়ির মুখোমুখি হয়েছে এমন ভান করল, তারপর অর্কই বলল, 'আচ্ছা তুমি এই বস্তিতে থাক?'

'হ্যাঁ, বাছা,' বুড়ি জবাব দিল, 'কেন বল তো?'

'ওখানে সুবালা নামে কোন মেয়ে থাকে, বাড়ির কাজ টাজ করে?'

'তা বলতে পারবনি বাছা, কত মেয়েই তো থাকে,' বুড়ি বলল।

'এ মেয়েটি নতুন এসেছে, সঙ্গে এক বাচ্চা মেয়েও আছে।'

'ও, তুমি বিশে সর্দারের বুনের কথা বলছ?' বুড়ি এবার বলল, 'শ্বশুরবাড়িতে ঝগড়া করে ভায়ের কাছে এসেছে, ওর মেয়েকে সেদিন বিশে নে এল। কালো মায়ের অমন ধলা বাচ্চা দেখিনি বাপু।'

'বিশে সর্দার!' বালচন্দ্রন এবার বলল।

হ্যাঁগো আমরা ওকে আড়ালে বলি সর্দার, ওর দাপটে সবাই ডরায়। এই তো এক মাসটাক হলো এয়েছে। তা এসেই জোয়ান ছেলেদের নিয়ে ঘোঁট পাকাতেছে, আত্তিরে ওদের জ্বালায় ঘুমুতে পারিনে বাপু,' বুড়ি গজগজ করে বলল।

'আগে কোথায় ছিল?

'তা জানিনে বাপু,' বুড়ি এবার যেন একটু বিরক্তির সঙ্গে জবাব দিল, 'তা তোমরা তার খোঁজ করতিছ কেন বাছা?'

'মানে,' অর্ক বলল, 'সুবালা আগে আমাদের বাড়ি কাজ করত, না বলে চলে এসেছে, তাই ওকে আবার কাজের জন্য বলতে এসেছি।'

'অ! তা ও কি আর কাজ করবে? ভায়ের কাছে ভালই আছে। বিশের রোজগার তো কম নয়।'

'কি করে বিশে?' অর্ক জিগ্যেস করল।

'তা আমি জানিনে,' বুড়ি মুখ নেড়ে বলল, 'কি দরকার আমার ওসব কথায়।'

'কোনটা বিশে সর্দারের ঘর? অর্ক আবার জিগ্যেস করল।

'বস্তির ও মাথায় টিনের চালান ঘর, সামনে দেয়ালে লতুন অঙ্ করেছে গো, নীল অঙ্। ভুল হবেনি।'

বুড়ি চলে গেল। তার দেরি হয়ে যাচ্ছে।

অর্ক বলল, 'বিশেষ খোঁজ যখন পাওয়া গেছে তখন আর ভাবনা নেই। আমি এখানে নজর রাখছি, তুই এবার এই ছেলেদের ডেকে আন, আর টালিগঞ্জ থানার ও, সি,-কে ফোন করে খবরটা দিতে ভুলিস না। বিশে লোক সুবিধের নয়।'

বালচন্দ্রন চলে যাবার পরেই ঢ্যাঙ্গা লোকটাকে দেখতে পেল অর্ক। বড় বড় পা ফেলে সে বস্তির দিকেই আসছিল। একেবারে অর্কর মুখোমুখি। এই আকস্মিক ঘটনাটা ঘটে গেল যে অর্কর কিছু করার ছিল না! ও শুধু মুখ ঘুরিয়ে অন্য দিকে তাকাল।

ঢ্যাঙ্গা লোকটা ওর দিকে তাকিয়ে ভুরু কুঁচকে কি যেন ভাবল, তারপর আবার বস্তির দিকে হাঁটা দিল। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল অর্ক। ও বস্তির দিকে উল্টো মুখ করে গাছের তলায় বসল, বালচন্দ্রনের কত দেরি হবে কে জানে!

আচমকা কেউ ওর একটা হাত ধরে এক টানে দাঁড় করিয়ে দিল। ফিরে তাকিয়েই বুকের ভেতরটা হিম হয়ে গেল অর্কর। কালো, ষণ্ডামার্কা চেহারার একটা লোক চোখ লাল করে ওর দিকে তাকিয়ে আছে, পাশেই দাঁড়িয়ে আছে ঢ্যাঙ্গা লোকটা। এই তবে বিশে, কিন্তু চুল ছোট করে ছাঁটা সাপের ফণাটা আর নেই।

ওর হাতে একটা মোচড় দিয়ে বিশে বলল, 'ব্যাপারখানা কি?'

'উঃ! আমার হাতে লাগছে,' অর্ক বলল, 'হাত ছেড়ে দিন।'

'ছেড়ে দেব!' হাতটা পিঠের কাছে মুচড়ে এনে বিশে বলল, 'সেদিন ট্যাক্সিতে আমাদের পেছন নিয়েছিলে, আজ আবার এখানেও ধাওয়া করেছ।'

'আপনি কী সব বলছেন,' অর্ক সাহস করে বলল, 'আমি এখানে একজন বন্ধুর জন্য অপেক্ষা করছি।'

'অপেক্ষা করাচ্ছি, চল আমাদের সঙ্গে।' অর্ককে হিড়হিড় করে টানতে টানতে বস্তির দিকে নিয়ে চলল ওরা।

বস্তির কাছে আসতেই লোক জড়ো হতে শুরু করল।

'কি ব্যাপার বিশেদা?' কয়েকজন কমবয়সী ছেলে উৎসুক হয়ে জিগ্যেস করল।

'আমাদের বস্তির কাছে ঘুরঘুর করছিল, মতলব ভাল নয় মনে হচ্ছে,' বিশে জবাব দিল।

'আমি মোটেই ঘুরঘুর করছিলাম না,' অর্ক প্রতিবাদ করার চেষ্টা করল, 'আমার এক বন্ধুর জন্য অপেক্ষা করছিলাম।'

'ফের মিছে কথা,' গর্জন করে উঠল বিশে।

'ভদ্দরলোকের ছেলের এই কাণ্ড,' একজন বলল, 'আমাদের হাতে ছেড়ে দাও, একটু ইস্তিরি করে দিই।'

'না, আমিই দেখছি, তোরা একটু নজর রাখিস, ওর সঙ্গে আরেকজন ছিল মনে হয়।'

অর্ককে বস্তির শেষ মাথায় একটা ঘরের সামনে এনে দাঁড়াল বিশে আর ঢ্যাঙ্গা লোকটা। যারা পেছনে আসছিল তাদেক এক ধমক দিয়ে হটিয়ে দিল বিশে, তারপর ঢুকে পড়ল ঘরে।

দুটো ঘর। সামনের ঘরে একটা তক্তপোশে বিছানা পাতা রয়েছে। তা ছাড়াও ঘরে আছে একটা পুরনো সোফা, দুটো লোহার চেয়ার আর একটা কাঠের গোল টেবিল।

ওকে ঘরে ঢুকিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিল বিশে, তারপর পাশের ঘরে গেল। কার সঙ্গে যেন কথা বলল, অর্কর মনে হলো, মেয়েলি গলা শুনতে পেল। বেরিয়ে এসে অর্কর দিকে তাকিয়ে বিশে বলল, 'এবার বল, এখানকার খোঁজ পেলে কেমন করে?'

'বলছি তো আমি একজন বন্ধুর জন্য অপেক্ষা করছিলাম,' অর্ক জবাব দিল।

'হুঁ! সোজা আঙুলে ঘি উঠবে না দেখছি।'

বিশে একটা শক্ত সরু কাঠি নিয়ে অর্কর ডান হাতের আঙুলগুলোর ভেতর দিয়ে চালান করল, তারপর আঙুলে চাপ দিতে লাগল। ব্যথায় ককিয়ে উঠল অর্ক।

'কি এখনও মিছে কথা বলবে?' বিশে দাঁত বার করে হাসল।

অর্ক ভেবে দেখল, ওর সঙ্গে কথা বলে কিছুক্ষণ সময় কাটাতে পারলে বালচন্দ্রন ছেলেদের নিয়ে এসে পড়বে, মিছিমিছি নির্যাতন সহ্য করে লাভ নেই। ও বলল, 'ঠিক আছে আমাকে ছেড়ে দিন।'

'পথে এসো বাবা,' ঢ্যাঙ্গা লোকটা বলল, 'সেদিন ট্যাক্সিতে তোমার সঙ্গে আরেকজন ছিল, সে কোথায় ?'

'সে আসেনি,' অম্লান বদনে বলল অর্ক।

'তুমি এখানে এলে কেমন করে ?'

'আপনারা যে গলি দিয়ে ঢুকেছিলেন, আমরাও সেটা দিয়ে এসেছিলাম। ওখানকার কয়েকজন ছেলে আপনাদের আসতে দেখেছিল,' অর্ক বলল, 'আমি ট্যাক্সিতে সত্যিই আপনাদের পিছু নিয়েছিলাম। যে মেয়েটিকে আপনারা ঘরে এনেছেন, তাকে আমি চিনি, তাই আমার সন্দেহ হয়েছিল।'

ওরা দু'জন মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল।

ঢ্যাঙ্গা বলল, 'তবে তো এর একটা বিহিত করতে হবে, ছেড়ে দেওয়া চলবে না।'

'সে পরে হবে,' বিশে তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, 'এ বস্তির খোঁজ পেলে কেমন করে ?'

'আমি একটু গোয়েন্দারিরি করতে ভালবাসি,' অর্ক বলল, 'তাই আপনাদের খোঁজে এখানে ঘোরাঘুরি করছিলাম, একে ওকে জিজ্ঞেস করছিলাম। এক বুড়িকে আপনার নাম আর চেহারার কথা বলতেই সে বলল এই ফস্তিতে খোঁজ ঘরে দেখতে। তাই ওই গাছটার তলায় এসেছিলাম।'

'আজই প্রথম জানতে পারলে ?' ওর দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে বিশে জিগ্যেস করল।

'হ্যাঁ।'

'আর কেউ জানে না ?'

'না।'

'সত্যি বলছ, না আবার দাওয়াই দেব ?'

'না না, সত্যি বলছি!'

বিশে যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল, তারপর ঢ্যাঙ্গাকে বলল, 'ওর হাত-মুখ বেঁধে ফ্যাল। রাতে বস্তায় পুরে পুকুরে ফেলে দেব।

অর্কর শিরদাঁড়া দিয়ে যেন বরফগোলা জল নেমে এল। কী সাংঘাতিক লোক। কেমন নির্বিকার মুখে বলল ওকে বস্তায় পুরে পুকুরে ফেলে দেবে। এত নিষ্ঠুর হয় মানুষ।

ওর হাত-মুখ বেঁধে ফেলা হলো।

এতক্ষণে পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে এল সাতাশ আঠাশ বছরের একটি মেয়ে। গায়ের রঙ শ্যামলা, ছোট ছোট চোখ, একটু খাঁদা নাক, কিন্তু খুব স্বাস্থ্যবতী। সে ঘরে ঢুকে তীব্র দৃষ্টিতে তাকাল অর্কর মুখের দিকে। অর্ক অস্বস্তি বোধ করতে লাগল।

'এই তবে সেই ছেলে,' সুবালা ক্যাট ক্যাট করে বলল, 'এই বয়সেই পাখনা গজিয়েছে!

'তুমি ভেতরে গিয়ে জিনিসপত্তর গুছিয়ে ফেল,' বিশে বলল, 'ছেলেটার কথা কতদূর সত্যি কি জানে! আজ রাত্তিরেই সরে পড়তে হবে।'

'আপাতত খিদিরপুরে আমার ওখানেই থাকতে পার,' ঢ্যাঙ্গা বলল, 'দু-একদিনের মধ্যেই একটা ঘর খালি হবে শুনেছি। তার আগে এই ছিনে জোঁকটার একটা ব্যবস্থা করতে হবে।'

'মেয়েটা বড় জ্বালাচ্ছে,' সুবালা বলল, আমি আর রাখতে পারছি না, ঘুমের ট্যাবলেট জলে গুলে খাইয়ে রাখতে হচ্ছে।'

'আর দু'দিন,' বিশে বলল, তারপর কেল্লা ফতে।'

অর্ক শিউরে উঠল। অতটুকুন মেয়েকে ঘুমের ট্যাবলেট খাওয়াচ্ছে, মরে যাবে না তো!

ঠিক তখুনি বালচন্দ্রন এসে হাজির হলো ওখানে, সঙ্গে জনা দশেক তরুণ।

'কি ব্যাপার!' বস্তির লোকজন একে একে এসে জড়ো হতে লাগল।

'এখানে বিশে বলে কেউ থাকে?' তরুণদের একজন জিগ্যেস করল।

'হ্যাঁ, কেন?' একজন বলল।

'আমাদের এক বন্ধুকে সে ধরে এনেছে। ওই রাস্তার ওপর যে দোকানগুলো আছে তাদের একজন দেখেছে।'

'ছেলেটা বদ মতলবে এখানে ঘোরাঘুরি করছিল,' বস্তির আরেকজন বলল।

'না, বিশে এক বাচ্চা মেয়েকে চুরি করে এনেছে, তাঁর খোঁজেই সে এসেছিল,' তরুণদের একজন বলল।

'সে তো ওর বোনের মেয়ে,' একজন প্রতিবাদ করল।

'মিথ্যে কথা। আমরা এ পাড়ার ছেলে, দরকার হলে আরও লোকজন নিয়ে আসব।'

'এ কি জুলুম নাকি!' একজন মস্তান গোছের ছেলে এগিয়ে এল, 'ভদ্দরলোকের ছেলে বলে যা ইচ্ছে তাই করবে! ভাল চাও তো সরে পড়।'

'আমরা জুলুম করতে আসিনি, পুলিশও এখুনি এসে পড়বে। তরুণদের মধ্যে বলিষ্ঠ চেহারার একজন বলল, 'ওই বিশে একটা বাচ্চা মেয়েকে চুরি করে এনেছে, তার বদলে অনেক টাকা চাইছে। আর ক্যাবলা,' সেই ছেলেটিকে লক্ষ্য করে সে বলল, 'তোকে আমি চিনি। সেবার বোমাবাজি করতে গিয়ে মার খেয়েছিলি, এর মধ্যেই ভুলে গেছিস।'

হঠাৎ ঘরের দরজা খুলে বেরিয়ে এল বিশে। তার হাতে একটা লাঠি। সে দু'হাতে লাঠিটা মাথার ওপর তুলে ঘোরাতে ঘোরাতে বলল, 'ভাগো সব এখান থেকে, নইলে আমি পেটাব বলছি। আমার কথা আর কাজ এক।'

তার মারমুখী ভাব দেখে বস্তির ছেলেরা ভরসা পেল। তরুণ দলকে ঘিরে ধরল। একটা রক্তারক্তি কান্ড ঘটে যায় আর কি, ঠিক সেই সময় কে একজন ছুটে এসে খবর দিল, পুলিশ। পুলিশের নাম শুনেই ভিড় পাতলা হয়ে গেল। সেই মুহূর্তে সেখানে এসে পড়লেন বেহালা থানার ও, সি,। তাঁর হাতে উদ্যত রিভলবার, পেছনে লাঠি উঁচিয়ে ছুটে আসছে একদল পুলিশ বাহিনী। টালিগঞ্জ

থানার ও, সি, বালচন্দনের ফোন পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে বেহালা থানার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন, তখুনি ফোর্স নিয়ে বেরিয়ে পড়তে অনুরোধ করেছিলেন।

সামনের চুলটা কেটে ফেলায় বিশের মুখের আদলই বদলে গিয়েছিল, তবু ওকে চিনতে বালচন্দনের ভুল হলো না। ও চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'হি ইজ ওয়ান অফ দেম্।'

ও, সি, বিশের দিকে রিভলবার উঁচিয়ে বললেন, 'লাঠি ফেলে দাও।'

বাধ্য ছেলের মতো সে হুকুম পালন করল।

'তোমরা এখানে কি করছ?' তরুণ দলের দিকে তাকিয়ে ও, সি, জিগ্যেস করলেন।

'আমিই ওদের ডেকে এনেছি,' বালচন্দন এগিয়ে এল, 'আমি আর অর্কই এই কিড্ন্যাপারদের ফলো করেছিলাম, এই বস্তিটা আমরাই খুঁজে বার করেছি। এরা আমাদের বন্ধু, আমাদের হেল্প করতে এসেছে।'

'অর্ক কোথায়?' ও, সি, চারদিকে চোখ বুলোলেন।

'মনে হচ্ছে ওকে আটকে রেখেছে,' তরুণদের একজন বলল, 'ঘরের ভেতরটা দেখলে হয় না?'

ঠিক তখুনি মাথার ঘোমটা অনেকটা টেনে বাচ্চাকে কোলে করে সুবালা ঘর থেকে বেরিয়ে সরে পড়বার চেষ্টা করল।

'বাচ্চাকে নিয়ে পালাচ্ছে,' বালচন্দন চেঁচিয়ে উঠল, 'ক্যাচ হার!'

পুলিশের হাতে ধরা পড়ল সুবালা। বাচ্চা তখন ঘুমের ওষুধের প্রতিক্রিয়ায় অঘোরে ঘুমোচ্ছে! বিশের দু'হাতে হাতকড়া পড়ল। ঢ্যাঙ্গা লোকটা ওই ডামাডোলে কখন যে সটকে পড়েছে কেউ লক্ষ্য করেনি।

ভেতরে হাত-মুখ বাঁধা অবস্থায় অর্ক সব টের পাচ্ছিল। বালচন্দনের কাজে ও খুব খুশি। পুলিশ ঠিক সময় এসে না পড়লে একটা বিচ্ছিরি কাণ্ড ঘটে যেত।

ও, সি, ওকে নিজের হাতে মুক্ত করে হাসিমুখে বললেন, তুমিই গোয়েন্দা অর্ক?'

অর্ক লজ্জা পেল।

'আরে তোমার বাহাদুরির কথা টালিগঞ্জের ও, সি,-র মুখে আমি শুনেছি, তিনি তোমার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। আজ নিজের চোখে তোমার কেরামতি দেখলাম। তোমাদের সাহায্য না পেলে বাচ্চাকে উদ্ধার করা সহজ হতো না।'

ও, সি, ওর পিঠ চাপড়ে আবার বললেন, 'বিশেকে আমি জানি, একবার লক-আপে পুরেও-ছিলাম। ব্যাটা পাঁকাল মাছের মতো ধূর্ত, কিন্তু এই বাচ্চা চুরির ব্যাপারে একবারও ওর কথা মনে হয়নি। আসলে ও হিনতাইবাজ, এত বড় একটা কাণ্ড করে বসবে ভাবতেই পারিনি। ব্যাটা আবার মাঝে মাঝেই ভোল পাল্টায়। কখন সাপের ফণার মতো চুল, কখনও একেবারে কদমছাঁট। তাছাড়া ওর আসল নাম গনেশ, পুলিশের খাতায় তাই আছে। বিশে নামটাও আমাদের ডিসিভ করেছিল।

এই ঠিকানাটাও নতুন। আগে ছিল সব্জি পাড়ায়, সেখানেও গোলমাল করেছিল, পাড়ার লোকেরা তাড়িয়ে দিয়েছে।'

বেহালা থানায় অপেক্ষা করছিলেন টালিগঞ্জ থানার ও, সি, আর মিঃ বোস ও তাঁর স্ত্রী।

বালচন্দনের ফোন পেয়েই ও, সি, বেহালা থানাকে জানিয়ে দিয়ে মিঃ বোসের বাড়ি ছুটে ছিলেন। মেয়েকে ফিরে পেয়ে মা তাকে জড়িয়ে ধরে এমন কাঁদতে লাগলেন যে সবার চোখ সজল হয়ে উঠল।

মিঃ বোস দুই ও, সি-র কাছে কৃতজ্ঞতা জানাতেই, টালিগঞ্জ থানার ও, সি, অর্ক আর বালচন্দনকে দেখিয়ে বললেন, 'আপনার কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত এ ছেলে দুটির কাছে, ওরা না থাকলে আপনার মেয়েকে উদ্ধার করা এত সহজ হতো না। বিশেষ করে অর্ক যদি ওদের কাছে আপনার মেয়েকে দেখে সন্দেহ না করত, তবে কোথায় আমরা খুঁজে বেড়াতাম! ও বড় হলে একজন বড় ডিটেকটিভ হবে!'

'আমার সঙ্গে ওর কণ্ট্রাক্ট আছে,' বালচন্দন এক ফাঁকে মুখ খুলল, 'আমি হব ওর অ্যাসিস্ট্যাণ্ট। যেমন শার্লক হোমসের ডাঃ ওয়াটসন।'

'আমার বাড়িতে কাল সন্ধ্যেবেলা আপনাদের সবার নেমন্তন্ন, সেখানে ওদের আমি পুরস্কার দেব,' মিঃ বোস গদগদ কণ্ঠে বললেন।

ফেরার পথে অর্ক বলল, 'তুই ঠিক সময় ওদের নিয়ে এসে না পড়লে আমাকে ওরা মেরেই ফেলত।'

'গোয়েন্দাদের অত সহজে মরতে হয় না,' বিজ্ঞের মতো জবাব দিল বালচন্দন।



টেনাগড়ে টেনশান

বুদ্ধদেব গুহ



খগা সরকার আর ভগা সরকারকে চিনত না এমন লোক টেনাগড়ে কেউ ছিল না। পাহাড়জঙ্গলে ঘেরা ছোট্ট শহর এই টেনাগড়। এখানে সকলেই সকলকে চেনে।

খগাদার বয়স হয়েছে ষাট-টাট। শৌখিন লোক। যৌবনে বেহালা বাজাতেন, শিকার করতেন, ওকালতিও। পিতৃপুরুষের বহু সম্পত্তি ছিল বিহারে নানা জায়গায়। তাই 'খেটে খেয়ে' তিনি জনগণের সামিল হতে চাননি। কিন্তু প্রয়োজন না থাকলেও খাটতে তিনি ভালবাসতেন এবং পরিশ্রমে বিশ্বাস করতেন।

খগাদার ভাই ভগাদার বয়স তিরিশ-টিরিশ হবে। টেনাগড়ে তিনি প্রায়ই নানাধরনের খবরের সৃষ্টি করে থাকেন। লোকটি ভাল।

খগাদা এখন রিটায়ার্ড। ইদানীং চটের উপর গুনছুঁচে রঙিন সুতো পরিয়ে 'সদা সত্য কথা বলিবে', 'ভগবান ভরসা', 'যারে রাখো সেই রাখে' ইত্যাদি লিখে লিখে বস্তির লোকেদের সেগুলো দান করেন। মাঝে মাঝে কাহার বস্তির অনিচ্ছুক শুয়োরগুলো ধরে এনে কুয়োতলায় তাদের জবরদস্তি সাবান মাখান। সন্ধ্যেবেলায় ওঁর বাড়িতে ভজন গান হয়। সকালে দাতব্য হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করেন। খগাদার ডিসপেনসারিতে লোম-ওঠা পথের কুকুর, কুঁজে-ঘা-হওয়া বলদ এবং হাড্ডিসার মানুষ—সকলেই চিকিৎসার জন্যে আসে এবং আশ্চর্য, কেউ কেউ ভালও হয়ে যায়।

ছেলেমেয়েও নেই। খগাদা অকৃতদার। ভগাদা বিয়েই করেনি। দুই ভাইয়ের সুন-সান্নাটা সংসার। থাকবার মধ্যে একটা অ্যালসেশিয়ান কুকুর, তার নাম মোহিনী। চাকর-বাকর আছে, গাইবয়েল খেতি-খামার খিদ্‌মদ্‌গার। আর আছে বারান্দায় দাঁড়েবসা একটা কুৎসিত কাকাতুয়া।

ভগাদার আদরের পাখি। কুকুরটাও আদরের। কাকাতুয়াটাকে ভগাদা আদর করে ডাকত কোকু' বলে। আমরা বলতাম 'কাড়িয়া পিরেত'। ওদের বাড়ি ঢুকলেই কাকাতুয়াটা বলে উঠত, "ভাগো হিঁয়াসে, ভাগো হিঁয়াসে।'

খগাদা আধুনিক কাঁবতা, পশুপালন, বাজরা-মকাই, তাইচুং ও আই-আর-এইট্র ধান, ভগাদার ভবিষ্যৎ ইত্যাদি তাবৎ বিষয় নিয়েই আমাদের সঙ্গে জোর আলোচনা করতেন এবং গলার জোর বাড়ানোর জন্যে তেজপাতা-আদা-এলাচ দেওয়া গোরখপুরী কায়দায় বানানো চা ও ভৈষালোটনের জঙ্গল থেকে আনানো খাঁটি ঘিয়ে ভাজা সেওই খাওয়াতেন।

সেদিন সকালে খগাদার বসবার ঘরে ঢুকতেই দেখি খগাদার মুখ গম্ভীর, থমথমে।

গুনছুঁচ ঢুকে গেছে বুড়ো আঙুলে ?

বীরু নিজের বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বলল, 'খুব লেগেছে ?'

খগাদা বললেন, 'লেগেছে, তবে আঙুলে নয়, হৃদয়ে।' ঢোঁক গিলে বললাম, 'স্ট্রোক। মাইল্ড অ্যাটাক ?' খগাদা বললেন, 'তার চেয়েও মারাত্মক।'

আমরা বসে সমস্বরে বললাম, 'কী তবে কী ?

খগাদা বললেন, 'চুরি।'

কোথায়, কোথায় ? চোর কোথায় ? কী চুরি ? বলে আমরা প্রায় চিৎকার করে উঠলাম।

এমন সময় ভগাদাকে দেখা গেল একটা লাল রঙের শর্টস পরে কাবুলী জুতো পায়ে, খালি গায়ে কাকাতুয়াটাকে খাওয়াচ্ছেন নিজে হাতে বারান্দায় এসে।

খগাদা আঙুল দেখিয়ে বললেন, ঐ যে কালপিট, ঐ দাঁড়িয়ে, আছে সশরীরে। সহোদর আমার। সাক্ষাৎ লক্ষ্মণ !

আমাদের খারাপ লাগল, বিশ্বাসও হল না। আপন ভাই কখনও চুরি করতে পারে ?

খগাদা কী বলছে বুঝতে না পেরে ভগাদা সাঁ করে বারান্দা ছেড়ে সরে গেল ভিতরে। ধরে-থাকা খাঁচাটা হঠাৎ ছেড়ে দেওয়ায় কাকাতুয়ার খাঁচাটা জোরে নড়ে উঠল। কাকাতুয়াটা বলল, 'কাঁচকলা খাঁ ! কাঁচকলা খাঁ,' ভগাদাকেই বলল বোধহয়।

খগাদা আস্তে আস্তে বললেন, 'গত শনিবার রাতে এ-বাড়িতে যত কাঁসার ও রুপোর বাসন ছিল সব চুরি করে নিয়ে গেছে চোরে, শুনেছ তোমরা ?'

বীরু বলল, 'সে কী ? বাড়ীতে বন্দুক ছিল না ?'

আমি বললাম, 'অত বড় অ্যালসেশিয়ান কুকুর ছিল !'

'ছেল।' খগাদা বললেন, ছেল সবই। কিন্তু বন্দুক রাখা ছেল গ্রীজ্ মাখানো অবস্থায় বেহালার বাক্সে। আর কুকুর মজাসে ঘুমোচ্ছিল।'

আমরা বোকার মতো বললাম, 'কুকুর ঘুমোচ্ছিল মানে ?'

'তাহলে আর বললুম কী' খগাদা সখেদে বললেন। তারপর বললেন, 'যে বাড়িতে কুকুর ঘুমোয়, সে-বাড়িতে চুরি হবে না ?

এরপর গড়গড়ায় গয়ার তামাকে দুটো টান দিয়ে বললেন, 'বুঝলে ভায়ারা, রোজ রাতে পড়াশুনা করি, আর শুনতে পাই বারান্দায় মোহিনীর পায়ের পায়জোরের আওয়াজ। মোহিনীকে ভগা রুপোর পায়জোর বানিয়ে দিয়েছিল। পা ফেললেই ঝুমুর ঝুমুর করে বাজে। আওয়াজ শুনতে পাই, কিন্তু এগারোটা বাজলেই দেখি আওয়াজ থেমে যায়। একদিন মনে সন্দ হওয়াতে পা টিপে টিপে ভগার ঘরের সামনে গিয়ে দেখি ভগা মশারির মধ্যে অঘোরে ঘুমোচ্ছে, আর মেঝেতে শুয়ে মোহিনীও দিব্যি নাক ডাকাচ্ছে। আমি ডাকলুম, 'ভগা।' তাতে 'কে রে' বলেই ভগা উঠে বসে জানালার ধারে আমায় দেখতে পেয়েই ঘুমন্ত মোহিনের পেটে মারলে ক্যাঁক্ করে এক লাথি। ঘুমঘোরে লাথি খেয়ে মোহিনী তো মারলে বাড়ি থেকে !'

বীরু বলল, 'আর ভগাদা ?'

'ভগাদা ?' বলে, খগাদা বিদ্রুপের হাসি হাসলেন। বললেন, 'ভগা আবার তক্ষুনি শুয়ে পড়ল।

তারপর বললেন, 'তোমরাই বলো এ-বাড়িতে চুরি হবে না তো কোন্ বাড়িতে হবে ?'

আমরা সত্যিই বড় চিন্তায় পড়লাম খগাদার জন্যে। সরি, ভগাদার জন্যে ! আসলে ভগাদা মাঝে-মাঝেই আমাদের এবং খগাদাকে ঝামেলায় ফেলতেন।

একদিন কলেজ থেকে বাড়ি ফিরেই শানলাম খগাদা আমাদের জরুরী তলব দিয়েছেন।

আমরা দৌড়ে গেলাম। দেখি খগাদার অবস্থা খুব খারাপ। কোলে বার্ট্রান্ড রাসেলের 'কন্‌কোয়েস্ট অব্ হ্যাপিনস্' বইখানা আধাখোলা পড়ে আছে, আর খগাদার চোখের কোণে জল চিক্-চিক্ করছে।

বীরু বলল, 'খগাদা, কী ? দুঃখ কিসের ?'

খগাদা বললেন, 'আর কী, একমাত্র ভাইটাকে বুঝি হারালাম এবার।

'কী হয়েছে কী ?' আমি উত্তেজিত হয়ে শুধোলাম।

খগাদা বললেন, 'ভগা আর ওর বন্ধু গিদাইয়া পদ্মার রাজার বিলে হাঁস মারতে গেছে সেই ভোর চারটেয়—বাড়িতে মশলা বাটতে বলে গেছে। হাঁসের শিক্‌কাবাব বানাবে বলে সিক ঘসামাজা করে রাখতে বলেছে, টক দই, পেঁপে, গরম-মশলা, ভাঙা পিরিচ, সব-কিছুর জোগাড় রেখে গেছে। আজ দুপুরে গড়িয়ে বিকেল হতে চলল, এখনও তাদের দেখা নেই। নির্ঘাত কোনো অঘটন ঘটেছে। আমার পায়ের গেঁটে বাতটাও বেড়েছে কয়েকদিন হল। আজ আবার অমাবস্যা। রোজ রসুন খাই, তবু ব্যথা যায় না। আমি তো চলচ্ছক্তিরহিত। তোমরা বাবা যাও একটু। আমার জীপগাড়িখানা নিয়ে যাও। ভগা ছিদাইয়াকে নিয়ে মটর সাইকেলে করে গেছে।'

বীরু বলল, 'নো-প্রবলেম। আপনি চিন্তা করবেন না খগাদা। আমরা বন্দোবস্ত করছি। তার

আগে আমি চট করে পোস্ট অফিস থেকে পদ্মার রাজবাড়ির ম্যানেজারকে একটা ফোন করে খবর নিয়ে নিই। তাঁকে চিনি আমার কাকার বন্ধু।'

খগাদা বললেন, 'বাস্, বাস্' তাহলে তো কথাই নেই। এই নাও, টাকা নিয়ে যাও।' বলেই কোমরের গেঁজ থেকে একটা লাল রঙের নাইলনের মোজা বের করে তার থেকে একটা দশটাকার নোট দিলেন বীরুকে।

বীরু বলল, 'তুই থাক। খগাদা নিড্স কম্পানি।'

খগাদা বললেন, বুঝলে ভায়া, আজ কত কথাই মনে পড়ছে। ভগা যখন হাসপাতাল থেকে মায়ের বাড়ি এল, তখন ওকে দেখতে একেবারে বাচ্চা একটা খরগোশের মতো ছিল। কী গাবলু গুবলু। তার উপর আবার খিল খিল করে হাসতো। আমার চেয়ে কত ছোট। কিন্তু পড়াশোনা করল না, কিছুই করল না, জীবনটাকে নষ্ট করল পাখি আর কুকুর নিয়ে। আমিই এখন ওর মা, ওর বাবা, ওর দাদা, সব। কী বিপদ হল কে জানে। বিলে কি ডুবে মরল, না কি সাপে কামড়াল?'

একটু পর ক্রিং ক্রিং করে সাইকেলের ঘণ্টি বাজিয়ে চাকায় কির্-র-র্ শব্দ তুলে বীরু ফিরল।

খগাদা একবার দাঁড়াবার চেষ্টা করেই মুখ বিকৃতি করে 'উঃ মাগো' বলে পায়ের ব্যথায় বসে পড়লেন।

বসেই বীরুর মুখের দিকে চেয়ে বললেন, 'খবর পেয়েছে?'

বীরু অধোবদনে দাঁড়িয়ে গম্ভীর মুখে বলল, 'হুঁ।'

'কী?' খগাদা চিৎকার করে উঠলেন। তারপর বললেন, বলে ফেল সোজাসুজি। আছে, না নেই?' তারপরই দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'ভগা রে! আমার ভগাবাবু!'

বীরু বলল, 'ভগাদা আছে। কিন্তু রাজার কায়দখানায়।'

'হোয়াট? বলে খগাদা আবার উঠে দাঁড়াতে গিয়েই 'গেছি গেছি, গেছি' বলে বসে পড়লেন।

তারপর হাতের 'কনকোয়েস্ট অব হ্যাপিনেস্'টাকে মাটিতে ছুঁড়ে বললেন, 'হোয়াই? হাউ কাম?'

বীরু বলল, 'বিলের ধারে রাজার পোষা হাতি চরছিল, ভগাদা তাকে গুলি করেছে।'

'হাতিকে? গুলি? পাখি-মারা ছর্রা দিয়ে? ইমপসিবল্! নিশ্চই অ্যাকসিডেন্ট! তা বলে কয়েদখানায়? খগা সরকারের ভাই কয়েদখানায়?'

বীরু, বীরুর কাকা ও আমি যখন খগাদার জীপ নিয়ে গিয়ে পদ্মার রাজার কয়েদখানা থেকে পঁচিশ টাকা জরিমানা দিয়ে ভগাদা, গিদাইয়া আর মোটর সাইকেলটাকে ছাড়িয়ে আনলাম, তখন রাত হয়ে গেছে।

আসবার পথে বীরু বলল, ভগাদা, কী করে এমন হল? হাতী তোমাকে তেড়ে এসেছিল?

ভগাদা বললেন, 'আরে না না। এই গিদাইয়া ইডিয়ট্টার জন্যেই তো।'

গিদাইয়া মাথা ঘুরিয়ে টিকি নেড়ে মহা প্রতিবাদ জানাল।

ভগাদা বললেন, 'বুঝলি, বিলে এক ঝাঁপ পিন্‌টেইল হাঁস ছিল। একটা পুটুস্‌ ঝোপের পাশে শুয়ে এইম করছিলাম। ভাবছিলাম লাইনে পেলেই একেবারে গদাম করে ঝেড়ে দেব, গোটা ছয়েক উল্টে যাবে। এমন সময়

আমি বললাম, 'এমন সময় কী?'

ভগাদা বললেন, 'এমন সময় গিদাইয়া কানের কাছে ফিসফিস করে বলল, ভগা! ওয়াইল্ড এলিফ্যান্ট! তাকিয়ে দেখি, আমাদের পাশেই একটা হাতি দাঁড়িয়ে ভোঁস-ভোঁস করে শুঁড় ঘুরিয়ে নিশ্বাস নিচ্ছে আর কান নাড়াচ্ছে। আমার মন বলল, নিশ্চয়ই পোষা হাতি রাজার! কিন্তু গিদাইয়া বলল, এক-একটা দাঁত—পাঁচ-পাঁচ হাজার টাকা! অত হাজার টাকার কথা শুনেই আমার মাথা ঘুরে গেল। দিলাম দেগে এক নম্বর ছর্‌রা।'

আমি রুদ্ধশ্বাসে শুধোলাম, 'তারপরে কী হল?'

'তারপর আর কী! হাতি বলল, প্যাঁ—অ্যা-অ্যা-অ্যা-অ্যা। আর আমি ও গিদাইয়াও একসঙ্গে ভ্যাঁ—অ্যা-অ্যা-অ্যা-অ্যা।'

বীরু অবাক হয়ে বলল, 'কেঁদে ফেললে? এ মা, এত বড় লোক হয়ে কেঁদে ফেললে?'

ভগাদা বলল, হুঁ হুঁ বাবা, কান্না পেলেও না যদি কাঁদো তবে সঙ্গে সঙ্গে ইস্‌কিমিয়া, মায়োকার্ডিয়াক অ্যাট্যাক। হার্ট এক্কেরে কিমা। জানিস না তোরা কিছুই।'

বীরু বলল, 'তারপর?'

'তারপর আর কী? হাতি এসে ঘাড়ে পড়ার আগেই মাহুত আর রাজার পেয়াদা এসে ঘাড়ে পড়ল। বন্দুক কেড়ে নিল। আর কী রুদ্দা, কী রুদ্দা!'

'হাতিটাকে কোথায় মেরেছিলে?' আমি শুধোলাম।

ভগাদা বলল, 'এইম করেছিলাম কানের পাশেই নিয়ম-মাফিক।'

গিদাইয়া এতক্ষণ পর কথা বলল। বলল, 'কিন্তু কুল্লে চার দানা ছর্‌রা গিয়ে লেগেছিল হাতির সামনের পায়ের গোড়ালিতে।'

ভগাদা চটে উঠে বলল, 'য়ু শাট্‌ আপ্‌। দোস্ত তো নয়, সাক্ষাৎ দুশমন্‌।'

এই ঘটনার কিছুদিন পরই খগাদা আমাদের নেমতন্ন করে খুব একচোট খাওয়ালেন। ভগাদা চাকরিতে জয়েন করেছে। অর্ডার সাপ্লাইয়ের ব্যবসা। নিজেই চেষ্টা-চরিত্র করে জোগাড় করেছে। এতদিনে ভাইয়ের একটা গতি হল। সকলেই খুশি, আমরাও। ভগাদা রোজ সময়মত প্যান্ড আর হাওয়াইন শার্ট পরে অফিসে যায়।

দিন পনেরো বাদে খগাদা আবার আমাদের জরুরি তলব দিলেন। গেলাম। বুঝলাম আবার কেস গড়বড়।

খগাদা বললেন, 'আবার একটা উপকার করতে হবে।'

আমরা বললাম, 'বলুন কী করতে পারি। ভগাদা কি আবার কোনো ঝামেলা···'

খগাদা বললেন, 'শোনো আগে। চাকরি করছিল ভগা, খুশি ছিলাম কত। কিন্তু গত কয়েকদিন অফিস যাচ্ছিল না। প্রথমে বলছিল পেটে ব্যথা। নাক্স-ভমিকা থারটি দিলাম। তারপর বলতে লাগল গায়ে ব্যথা। আর্নিকা দিলাম। তারপর বলল, রাতে ঘুম হয় না। কালিফস দিলাম। তাতে ভোঁস ভোঁস করে ঘুমোবার কথা, কিন্তু সমানে কড়িকাঠের দিকে চেয়ে ভায়া আমার শুয়ে থাকে। কথাও বলে না, খায়ও না। তারপর ও আরস্ট অব অল, কাল থেকে পলাতক। কোথায় যে চলে গেল না বলে-কয়ে!'

বীরু হঠাৎ বলল, চাকরির ব্যাপারটা একটু খোঁজ করলে হত না? সেখানে কোনো গোলমাল?'

খগাদার চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বললেন, 'ব্রিলিয়ান্ট্। সাধে বলি, তোমাদের মত ছেলে হয় না।'

বীরু আমাকে বলল, 'চল এক্ষুনি ব্যাপারটা জেনে আসা যাক।'

খগাদার কাছ থেকে ঠিকানা নিয়ে বীরু বেরিয়ে পড়ল সাইকেলে আমাকে ডবল-ক্যারি করে।

সবজিমাণ্ডির পাশে মসজিদ, মসজিদ থেকে খানিকটা দূরে কালু মিঞার কাবারের দোকান, তার পাশে একটা ছোট্ট দোকানঘর—সবুজের উপর সাদায় লেখা সাইনবোর্ড ঝুলছে, ইণ্টারন্যাশনাল সাপ্লায়ার্স। কিন্তু সেই আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের কেরোসিন তেলের টিন দিয়ে তৈরি দরজাটাতে একটা মস্ত বড় তালা ঝুলছে।

আমরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলাম সাইকেল থেকে নেমে।

ইণ্টারন্যাশনাল সাপ্লায়ার্সের উল্টোদিকে একটা দর্জির দোকান। খয়েরি আর সাদা খোপ-খোপ লুঙ্গি আর বেগুনে কামিজ পরে মাথার সাদা টুপি চড়ানো কালো চাপ-দাড়ি-ওয়ালা দর্জি আপনমনে ঝটপট করে পা-মেশিনে রজাইয়ের ওয়াড় সেলাই করে যাচ্ছিল।

আমরা গিয়ে একটু কেসে দাঁড়ালাম।

দর্জি মুখ তুলে নিকেলের ফ্রেমের চশমার কাঁচের ফাঁক দিয়ে চোখ নাচিয়ে বলল, 'ফরমাইয়ে।'

বীরু বলল, 'খাস কাম কুছ নেহী। এই যে উল্টোদিকের অফিসটা, সেটা বন্ধ কেন? তালা ঝুলছে কেন?'

দর্জি বলল, 'দফ্তর বন্ধ হ্যায়। উঠ্ গ্যায়া।

'উঠে গেছে মানে?' আমরা শুধোলাম।

দর্জি বলল 'জী হাঁ।' তারপর ডান হাতের তিনখানা আঙুল বীরুর নাকের সামনে নেড়ে নেড়ে বলল, 'আপিস তো ছিল দুজনের—হেডবাবু গিরধারী পাণ্ডে আর অ্যাসিস্টাণ্ট ভগা সরকার। সেদিন

কী নিয়ে কথা কাটাকাটি হতে অ্যাসিস্টাণ্ট গিয়ে হেডবাবুর মাথায় হঠাৎ কাঠের রুলার দিয়ে মারল এক বাড়ি। সাথে সাথ্ মাথা ফট্! হেডবাবু হাসপাতালে আর অ্যাসিস্ট্যাণ্ট ফেয়ার। আপিস আর চালাবে কে? কিওয়ারি বন্ধ।'

আমরা ফিরলাম। খগাদা উদগ্রীব হয়ে বসে ছিলেন। বললেন, 'কী খবর?'

বীরু গম্ভীরমুখে বলল, 'আপিস উঠে গেছে। হেডবাবু হসপিটালে, অ্যাসিস্ট্যাণ্ট এবস্কণ্ডিং।'

খগাদা প্রচণ্ড উত্তেজিত হয়ে 'মার্ডারার, মার্ডারার, কোথায় গেলি, কোথায় গেলি,' বলেই দৌড়ে বারান্দার দিকে গেলেন, যেন ভগাদা বারান্দাতেই বসে আছেন।

খগাদা বা বারান্দাতে গিয়ে পেঁছতেই ভগাদার ঠোঁটকাটা কাকাতুয়াটা খ্যান্‌খেনে গলায় বলে উঠল, হাইপারটেন্‌শান্!

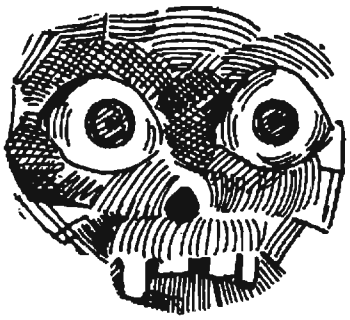

একটি খুনের ঘটনা

নারায়ন গঙ্গোপাধ্যায়



গোয়েন্দা বা অপরাধ কাহিনীর সাধারণ নিয়ম হচ্ছে, ঘটনার আশেপাশে যারা রয়েছে, তাদের প্রত্যেককেই সন্দেহের আওতার মধ্যে রাখা হয়। কিন্তু চারিদিকের সাক্ষী প্রমাণে নিশ্চিতভাবে যাকে অপরাধী বলে মনে হয়, তাকে যদি নিরপরাধ ধরে নিয়ে, তার অনুকূলে তদন্ত শুরু করা হয়, তা হলে কী রকমটা দাঁড়ায় ?

সোভিয়েত দেশে তদন্তের প্রণালী আজকাল এই। এখানকার একজন ইন্সপেক্টরের জবানবন্দিতে একটা ঘটানা শোনাই। গল্পটা—না এটা গল্প নয়, সম্পূর্ণ সত্য ভাহিনী—একটু সংক্ষেপ করে তোমাদের বলছি।

মেরু অঞ্চলে গবেষণার জন্যে গিয়েছিলেন দু'জন অধ্যাপক। এঁদের একজন অল্প বয়সী, আর একজন বুড়ো মানুষ। দুজনেই নামজাদা বিজ্ঞানী, দুরন্ত পণ্ডি, কিন্তু সম্পর্কটা একেবারে সাপে —নেউলে।

পণ্ডিতে পণ্ডিতে যা হয়। এর মত উনি মানেন না। এঁর থিয়োরীর উনি প্রতিবাদ করেন। কিন্তু মতভেদ এমন একটা স্তরে পেঁছেছিল যে ইনি ওঁর নাম শুনলে একেবারে জ্বলে যেতেন। অথচ, অবস্থাচক্রে দু'জনকে একই সঙ্গে পাঠানো হল গবেষণা করতে।

সেই ধু-ধু তুষারের দেশে দুই বৈজ্ঞানিক এক সঙ্গে তাঁবু ফেলে থাকেন, গবেষণা করেন। আর একজন সহকারী আছেন এঁদেয় সাহায্য করেন। তিনি দেখেন, রাত-দিন দুই পণ্ডিতে সমানে তর্ক-তর্কি খেয়োখেয়ি চলছে।

বুড়ো বৈজ্ঞানিক—ধরা যাক প্রফেসর এক্স্ একটা চিঠিতে লিখছেনঃ 'আমার সঙ্গে এই বানরটাকে কেন যে পাঠানো হল। ওকে আমি এক মুহূর্ত সহ্য করতে পারি না—দেখলেই আমার পিত্তিসুদ্ধ জ্বালা করে।'

আর ছোকরা বৈজ্ঞানিক—প্রোফেসর ওরাই তাঁর ডায়েরীতে লেখেনঃ 'বুড়ো ক্রমশই সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। সব সময় ওর একগুঁয়েমী। মধ্যে মধ্যে আগুন ধরে যায় আমার মাথায়। একদিন নিশ্চয় আমি ওকে খুন করব।'

অবস্থা যখন এইরকম, তখন একদিন খবর এল, প্রফেসর এক্স্ খুন হয়েছেন।

ব্যাপারটা কিরকম ?

দুই বৈজ্ঞানিক এবং তাঁদের সহকারী একসঙ্গে বেরিয়েছিলেন হাঁস শিকারে। একটা জলার এক ধারে দাঁড়িয়েছিলেন এক্স্—কিছুদূরে ওয়াই হাঁস খুঁজছিলেন। কী একটা জিনিস আনতে সহকারী চলে গিয়েছিলেন তাঁবুতে।

সহকারী যখন ফিরে আসেন, তখন একটা বন্দুকের আওয়াজ তাঁর কানে যায়। তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই, শিকারে বন্দুকের আওয়াজ হবেই।

কিন্তু ফিরে এসে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন তিনি।

প্রফেসর এক্স্ পড়ে আছেন মাটিতে। হাতের বন্দুকটাও পড়ে রয়েছে তাঁর পাশে। তাঁর বাঁ-চোখে শিকারের ছুরি অর্থাৎ হান্টিং নাইফটা একেবারে বাঁট পর্যন্ত ঢোকানো। চোখের ভেতর দিয়ে সে ছুরির ফলা একেবারে মস্তিষ্ক পর্যন্ত চলে গেছে। মৃত্যু হয়েছে তৎক্ষণাৎ।

আর তাঁর পাশে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে প্রোফেসর ওয়াই।

'কী করে হল ?'

শুকনো মুখে প্রোফেসর ওয়াই বললেন, 'কিছুই জানি না। আমি ওদিকে হাঁস তাক করছিলুম। হঠাৎ বন্দুকের আওয়াজে এদিকে ফিরে দেখি, প্রোফেসর এক্স্ মাটিতে পড়ে আছে। এসে দেখি, এই কাণ্ড।'

সেই নির্জন তুষারের দেশে এই দুটি প্রাণী ছাড়া আর কেউ ছিল না। আর এ তো হত্যা-কাণ্ড। দুজনের ভেতরে যে বিশ্রী সম্পর্ক ছিল, তাতে এমন কাজ আর কে করতে পারে প্রোফেসর ওয়াই ছাড়া ?

অতএব একদিন প্রোফেসর ওয়াই এসে আমাদের অফিসে উপস্থিত হলেন।

বললুম, 'প্রোফেসর, আপনি যা জানেন তা বলুন।'

নতুন কথা তিনি কিছুই বললেন না। 'আমি বন্দুকের আওয়াজ শুনে ফিরে দেখি, উনি পড়ে আছেন। চোখের ভেতরে ছোরা বেঁধানো। আর আমি কিছুই জানি না।'

প্রোফেসর ওয়াই শীর্ণ মুখে হাসলেন। 'জানি, কেউ বিশ্বাস করবে না। আমি তৈরী হয়েই এসেছি সেজন্যে। পড়ুন আমার ডায়েরী।'

ডায়েরীটা এগিয়ে দিলেন আমার দিকে। পাতায় পাতায় সেই এক কথা। 'অসহ্য—বুড়োটা অসহ্য।' 'কী করে এই পাগলের হাত থেকে নিস্তার পাই?' 'আজ খাবার টেবিলে—আঃ, লোকটাকে খুন করতে পারলে আমার শান্তি হয়।' পড়েই মনে হবে, কোনো সন্দেহ নেই, বিশুদ্ধ, পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড।

আচ্ছা মানুষ এই প্রোফেসর। নিজের মৃত্যুবাণ যেন তুলে দিচ্ছেন আমার হাতে।

আমি চুপ করে রইলুম! প্রোফেসর বললেন, আমি বুঝতে পারছি আমার কী হবে। আমার আর কোনো ভাবনা নেই। আপনি অনুগ্রহ করে কেবল এই চিঠিটা আমার স্ত্রীকে দিয়ে দেবেন।'

আমি বললুম, 'চিঠির দরকার নেই। আপনি বাড়ি যান।'

'তার মানে? ছেড়ে দিচ্ছেন আমাকে?' —প্রোফেসর যেন নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারলেন না।

বললুম, 'বিনা প্রমাণে আপনাকে গ্রেপ্তার করতে পারি না। আপাতত আপনার নামে আমাদের কোনো ওয়ারেণ্ট নেই। আপনি যান।'

আসলে আমার খটকা ধরিয়েছিল পোস্টমর্টেম রিপোর্টের একটি কথা।

'অস্বাভাবিক—অমানুষিক শক্তিতে ছুরিটা চোখের মধ্যে বিঁধিয়ে দেওয়া হয়েছিল।'

অস্বাভাবিক—অমানুষিক শক্তি। প্রোফেসর ওয়াই অবশ্যই খুব সবল স্বাস্থ্যবান পুরুষ, কিন্তু—অমানুষিক শক্তি। কথাটা ক্রমাগত পাক খেতে লাগল মনের ভেতরে।

আমি ব্যালিস্টিক একস্‌পার্ট—অর্থাৎ গোলাগুলি বিশারদদের ডাকলুম।

'আচ্ছা, মেরু অঞ্চলের স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়ায় বন্দুকের টোটা ফেঁপে যায় তো?'

তাঁরা বললেন, 'স্বাভাবিক।'

'সেই টোটা বন্দুকে ভারতে তখন তো অসুবিধে হয়।'

'তা হতেই পারে।'

'আচ্ছা বলুন—এ অবস্থায় শিকারী কি করবেন।

'একটা কিছু দিয়ে টোটাটাকে ঠেলে ভেতরে দেবার চেষ্টা করবেন।'

'হাণ্টিং নাইফের হাতল ব্যবহার করতে পারে লোকে?'

'কেন পারবেন না?' —একজন বললেন, "সেটা কোমরেই থাকে, আর তার কথাই মনে পড়বে সকলের আগে।'

'তা হলে'—আমি জিজ্ঞেস করলুম, 'ধরুন যদি হাণ্টিং নাইফটা এমন হয়—তার হাতলটা যেমন তেমন করে তৈরি, তার পেছনে এক টুকরো লোহার ডগা বেরিয়ে রয়েছে? আর টোটাটাকে যদি জোরে ঠেলে দেওয়া যায়, তাহলে সেটা ট্রিগারের পিনের মতো কাজ করতে পারে?'

তাঁরা বললেন, 'নিশ্চয়।'

'মনে করুন'—আমি আবার জিজ্ঞেস করলুম, 'স ক্ষেত্রে একজন ছুরির বাঁট দিয়ে টোটাটাকে জোরে ঠেলে দিলে। লোহার ডগাটা ট্রিগার পিন হয়ে সেই কার্ট্রিজে ঘা মারল, অমনি গুলি বেরিয়ে গেল। তখন বন্দুকটা তো গুলি ছোটবার বেগে পেছনে এসে ধাক্কা মারবে ?'

'হ্যাঁ, তাই নিয়ম। আগ্নেয়াস্ত্র মাত্রই ব্যাকপুশ দেবে।

'খুব জোরে ?'

'স্বাভাবিক।'

'তা হলে ছুরির ফলাটা তো তখন উল্টো দিকে রয়েছে। বন্দুকটা সেই হাতে ধাক্কা দিলে, অমনি ছুরির ফলাটা তীরবেগে গিয়ে বিঁধতে পারে ?'

'নিশ্চয় পারে। যদি অবশ্য সেটা চোখ বরাবর থাকে।'

'অস্বাভাবিক—অমানুষিক জোরে বিঁধে যেতে পারে ?'

'বন্দুকটা চোখের কাছে থাকলে তাই সম্ভব।'

'ধন্যবাদ' আর আমার কিছু জানাবার নেই।'

তা হলে এই আমার কেস। হত্যা নয়, বিশুদ্ধ অ্যাকসিডেণ্ট। ওই বলেছেন, 'গুলির আওয়াজ শোনবার আগে একবার যখন তিনি এদিকে তাকিয়েছিলেন, তিনি দেখেছিলেন অধ্যাপক এক্স্ যেন তাঁর বন্দুকটা লোড্ করবার চেষ্টা করছেন।' অতএব দুই আর দুয়ে চার !

পরম উল্লাসে খবরটা জানালুম আমার ওপরওলাকে।

তিনি একটু হাসলেন। বললেন, 'তোমার থিয়োরি বেশ ভাল। কিন্তু একটা মস্ত ফাঁক রয়ে গেল যে ওর ভেতর।'

আমি তাঁর দিকে চেয়ে রইলুম।

'তোমার থিয়োরী যদি সত্যি হয়, তা হলে প্রোফেসর এক্স ডান হাতে ছুরি আর বাঁ হাতে বন্দুক ধরলেন। আর সে ক্ষেত্রে বন্দুকের ব্যাক পুশে ছোরাটা ডান চোখেই বিঁধে যাবে। কিন্তু ওটা বিঁধেছে বাঁ চোখে, সেটা খেয়াল রেখ।

সব মাটি। গেল আমার সাধের থিয়োরী।

আমি বিভ্রান্তের মতো বেরোলুম। কোন থই পেলুম না। তারপর হঠাৎ মনে হল, প্রোফেসর এক্স্ তো ন্যাটাও হতে পারেন ! অর্থাৎ ডান হাতের বদলে বাঁ হাত ব্যবহারের অভ্যাস তো থাকতে পারে তাঁর ?

আশা নিরাশার দ্বন্দ্বে ছুটলুম তাঁর বাড়িতে। গেলুম তাঁর সহকর্মীদের কাছে।

অনুমান নির্ভুল। প্রোফেসর এক্স ন্যাটাই ছিলেন ! বাঁ হাতেই তিনি ব্যবহার করতেন। কিন্তু জট কেটেও কাটে না।

অভিযানে প্রোফেসর এক্সের যে জিনিসপত্রের তালিকা পাওয়া যাচ্ছে—অর্থাৎ যা যা তিনি সঙ্গে

নিয়েছিলেন, তার প্রত্যেকটার বিবরণ পাচ্ছি, কিন্তু ছুরিটার তো কোনো সন্ধান নেই। কটি পেন্সিল নিয়েছেন তারও খবর আছে—ছুরিটার উল্লেখ পর্যন্ত পাওয়া যাচ্ছে না।

তা হলে কোথা থেকে এটা এল ?

এমন হতে পারে যে যাত্রার শেষ মুহূর্তে ওটা কিনে থাকবেন। কিন্তু কোথায় ? শহরের কোনো দোকানে আমি ও ধরণের হান্টিং নাইফের কোনো সন্ধান পেলুম না।

শেষে কি আমার ঘাটে এসে নৌকো ডুববে ? আমি কি তখন জোর করে বলতে পারব, ওকে খুন করার জন্যে ওটাকে মার্ডার উইপন হিসেবে সঙ্গে নিয়ে যাননি পোফেসর ওয়াই।

সুতরাং আমি বেরিয়ে পড়লুম শেষ চেষ্টায়।

যে পথ দিয়ে ওঁরা এগিয়ে গেছেন, তার প্রতিটি শহরে আমি ওই রকম একটি ছুরির দোকান খুঁজতে লাগলুম। হাজার হাজার হান্টিং নাইফ আমি দেখলুম, দেখিয়ে দেখিয়ে হয়রান হয়ে গেল দোকানদারেরা—কিন্তু ঠিক ওই জাতের ছুরি কোথাও পেলুম না।

এবার এসেছি সর্বশেষ শহরে। এখান থেকেই ওঁরা মেরু অঞ্চলে রওনা হয়ে গেলেন। কিন্তু না—এখানেও ও ছুরির সন্ধান মিলল না।

হতাশ হয়ে যেদিন ফিরে আসব, সেদিন চলছিলুম শহরের একটা পুরো অঞ্চল দিয়ে। শ্রীহীন ছোট ছোট দোকান দুধারে, কেনা-বেচাও খুব কম। তার মধ্যে হঠাৎ ওই তো! ওই ছোট্ট দোকানটিতে ঠিক ওই ধরণের ছুরি ঝুলছে দু-তিনটে। ওই জিনিস।

এক বুড়ো তার মালিক! সে-ই ওগুলো তৈরি করে।

হাতে নিয়ে দেখলুম, যেমন তেমন কাঠের বাঁটে তৈরি সব সাদামাটা ছুরি। আর প্রায় প্রত্যেকটার পেছনেই একটু করে লোহার মুখ বেরিয়ে রয়েছে।

বুড়ো বললে, শিকারের সীজনে ওগুলো অনেক বিক্রি করি আমি।'

'আচ্ছা—অমুক মাসে, বুড়ো এক প্রোফেসর কি এসেছিলেন দোকানে ? তিনি কি কিনেছিলেন একটা ? এই রকম চেহারা, এই রকম গোঁফ—'

'দাঁড়ান—দাঁড়ান। প্রোফেসর একটু খিটখিটে ভুরু কুঁচকে রয়েছেন, এই তো দাঁড়ান—খাতাটা খুলি।'

খাতায় পাওয়া গেল নাম। প্রোফেসর এক্স।

এই হল কেস। আদালতের রায় বললে, এটা একটা আকস্মিক দুর্ঘটনা।

প্রোফেসর ওয়াইয়ের মৃত্যুর আয়োজন তৈরিই ছিল। কেউ তাঁর সাক্ষী ছিল না, তাঁর কথা *বিশ্বাস করবার মতো কেউ ছিলেন না, বরং বাড়িটার মধ্যে ছিল এক্সের চিঠিগুলো আর ওয়াইয়ের* নিজের সেই মারাত্মক ডায়েরী।

কিন্তু নিরপরাধের মুক্তির সূত্রও হয়ে থাকে।

সে সূত্রও ছিল পোস্টমর্টেম রিপোর্টের মধ্যে 'অস্বাভাবিক, অমানুষিক শক্তিতে ছোরাটা চোখের মধ্যে, বিঁধিয়ে দেওয়া হয়েছে।'

দ্বিতীয় টিকটিকি

লীলা মজুমদার



ডিমাপুর থেকে ছোটমামা হঠাৎ গুপিকে তার করল, 'কাম সার্প'। আগেও গুপি একবার ডিমাপুর গেছিল, খুব ভাল লেগেছিল। পাহাড়ি জায়গা, চারিদিকে ঝাউগাছ আর চা-বাগান। রাতে ঝোপে ঝাড়ে হাজার হাজার জোনাকি, ঝিঁঝিঁ পোকার ডাকে কান ঝালাপালা, মুরগি, মুরগির ডিম, ঝর্ণাবিনির মাছ আর বুনো স্ট্রবেরি।

বড়মামুর বন্ধু অনন্তমামার চা বাগান। ঐ বাড়িটাতে কেউ রারোমাস থাকে না। মাঝে মধ্যে ছুটিছাটাতে যায়। বড় বড় ঘর কাঠের মেঝেতে নারকেল ছোবড়ার গালচে পাতা, তাতে পিসু হয়। পিসু এক রকম ছোট পোকা দেখা যায় না। বেজায় কামড়ায়। চৌকিদার আছে, বেজায় ভালো রাঁধে, আর ফটকের পাশে আলু বখরার গাছটার তুলনা হয় না।

পুজোর ছুটি, গুপির যেতে কোন বাধা নেই। নিশ্চয় এর মধ্যে একটা কিছু ঘোরেল ব্যাপার আছে, নইলে 'কাম সার্প' কেন? গুপি মহাখুসি। সেই নেপোর ব্যাপারটা চুকে যাওয়া ইস্তক শুধু পড়া। এই দেড় বছরে ছোট মামা পর্যন্ত সত্যি সত্যি বি, এস, সি, পাস করে ফেলে, সমাদ্দার ইনভেস্টিগেশন্সে দ্বিতীয় টিকটিকির চাকরি পেয়েছে। একটু হাত পাকলে বিনু তালুকদার ওকে পুলিশে ঢুকিয়ে দেবে।

এই সময় ছোটমামার ডিমাপুরে থাকার কথা নয়। আপিসে সব চেয়ে কম মাইনে পেলে কি হয়, আসলে সে সমাদ্দার সাহেবের ডানহাত। যত ক্রুর তদন্ত সব ওদের দ্বিতীয় টিকটিকিকে দেওয়াই নিয়ম। কারণ প্রথম টিকটিকির মুখ চিনতে কোনো নিয়মভঙ্গকারীর আর বাকি নেই। এদিকে ছোটমামার নাম পর্যন্ত ওদের খাতায় লেখা নাই। এমন কি অন্য কর্মচারীদের মধ্যেও অনেকের ধারণা

যে ছোটমামা সমাদ্দারের একজন মক্কেল। এই রকমই দরকার। দ্বিতীয় টিকটিকি আছে কি নেই কেউ জানবে না, আর মাঝখান থেকে সেই তদন্ত চালিয়ে সব ফাঁস করে দেবে। কিন্তু তখনো তার নাম গুহ্য রাখা হবে। সবাই সমাদ্দারের বুদ্ধির তারিফ করবে। এই নিয়ে ছোটমামা গুপির কাছে অনেক দুঃখও করেছে, এবারও নিশ্চয় কোনো বিপজ্জনক কাজ নিয়েই ওখানে গেছে। বাড়ির লোকে ঘুণাক্ষরেও কিছু জানে না। কারণ সমাদ্দারের অফিস বর্ধমানে। সেখানে একজন ভালো ভালো হাত আয়না ও লজেঞ্চুষ ওয়ালার সঙ্গে ছোটমামা থাকে। ওর নামটি পর্যন্ত কেউ জানে না। সবাই ওকে ম্যালেরিয়া বাবু বলে ডাকে। তাদের বিশ্বাস ছোটমামা কোনো খবরের-কাগজের মফঃস্বল রিপোর্টার। চেহারা দেখেই ম্যালরিয়া রুগি বলে বোঝা যায়।

ছোটমামার এ সব বিষয়ে কোন দুঃখ নেই। ভালো টিকটিকিদের তো এই রকমই হতে হয়। ভিড়ের মধ্যে তাদের আলাদা করে চেনা যাবে না। চোরদের গা ঘেঁষে দাঁড়ালেও কিছু মালুম দেবে না। রোগা লিকলিকে চেহারা, তার উপর ভীতুর একশেষ; বেড়াল দেখলে লোম খাড়া হয়। আরশুলার শব্দ পেলে ভির্মি যায়, একবার শিষ্য গুরু প্যাঁচার ডাকে হাত পা এলিয়ে গেছল। দ্বিতীয় টিকটিকি সহসা বা গায়ের জোর দেখিয়ে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে কেন? তার কাজ আড়ালে, অজ্ঞাত থেকে ছোঁক ছোঁক করে অন্যায়কারীদের হাঁড়ির খবর বের করে আনা। কাঁচা কাঁচা প্রমাণ লাগানো।

এইজন্যেই নিশ্চয় ডিমাপুর যাওয়া। কোনো জটিল তদন্ত ছাড়া আর কিছু নয়। যদিও বাড়ির লোকদের ধারণা অন্যরকম। মা বললেন, 'যাক্ তবু যে অনন্তবাবুদের সঙ্গে স্বাস্থ্যকর জায়গায় গেছে, তাও ভালো।' দাদু বললেন, 'ভালো জায়গায় সৎসঙ্গে থাকা এখন সহ্য হলে হয়।

এদিকে গুপি খুব ভালো করেই জানত যে অনন্তবাবুর বড় মামাদের সঙ্গে রামেশ্বর গেছেন। তবে বড় কথার মধ্যে থাকার কি দরকার এই ভেবে চুপ করে রইল। তাছাড়া কিছু বললেই তো হয়ে গেল। ছোটমামা বেচারী একলা অকুস্থলে ম্যানেজ করতে পারছে না, একজন বিশ্বস্ত সহকারী দরকার, তাই না 'কাম সাপ'। এহেন অবস্থায় তাকে তো আর হতাশ করা যায় না। শেষ পর্যন্ত বাবার তুষটাকে ছোট সুটকেসে ভরে ডিমাপুর রওনা হলাম।

ছোটমামা সেই পুরানো দাড়িটা পরে ছোট গাড়ির স্টেশনে অপেক্ষা করছিল। ভাগ্যিস সেই নেপোর ব্যাপারে সময়ে দাড়িটা রচনা হয়ে গেছিল নইলে ছোটমামাকে চেনা গুপির সাধ্য ছিল না। বললে, 'এ সব ছদ্মবেশ খুবই সহজ, স্রেফ দু'গালে দুটো আস্ত সুপারি আর সামনের চুল ছোট, পিছনের চুল লম্বা। ব্যস, কোনো দুঁদে টিকটিকিও চিনতে পারবে না! দ্বিতীয় টিকটিকির আসল রূপ যত কম লোকে দেখে ওর উন্নতির পক্ষে ততই ভালো।'

হেঁটেই আসছিল ওরা, ওখানে গাড়ি কোথায় পাওয়া যাবে। ঘোড়া অবিশ্যি ছিল! কিন্তু ছোটমামার 'হে ফিবার' কিনা, ঘোড়া দেখলেই হাঁচি আসে। তবে বেশি দূরও নয় আর গুপির লম্বা

লম্বা হাঁটা দেওয়া অভ্যাস! পাহাড়ের গা কেটে বাজারের মাঠ। তার পাশেই খেলার মাঠ। সেখানে মস্ত একটা ছেঁড়া তাবু পড়েছে দেখা গেল! দূরে থেকে দেখেই গুপির মহা উৎসাহ—'ওকি ছোটমামা, সার্কাস নাকি? দেখাবে তো?'

ছোটমামা গুপির কোঁকে কোঁকে খোঁচা দিয়ে ফিস ফিস করে বলল—স্-স্-স্ এক্ষুনি সব ফাঁস করে দিচ্ছিল! ওটাই অকুস্থল, তদন্তের ক্ষেত্র। এখন চুপ কর দিখি, কে কোথায় শুনবে। বাড়ি গিয়ে সব বলব।'

কে কোথায় শুনবে শুনে গুপি অবাক। কোথাও তো জনমানুষের সাড়া নেই। অথচ সবে বিকেল পাঁচটা হবে! আরেকবার ভালো করে দেখতে গিয়ে গুপির হাত-পা ঠাণ্ডা। দুটো গুণ্ডা চেহারার লোক ওদের পিছু নিয়েছে। 'ও ছোটমামা, গুণ্ডায় পিছু নিয়েছে যে।'

ছোটমামা চটে গেল। 'আহা, আবার গুণ্ডা কোথায় দেখলি। ও তো ছটু আর পালক। আমার বডিগার্ডই বলিস বা ফলোয়ারই বলিস। ওরা সর্বদা সঙ্গে থাকে। নইলে দ্বিতীয় টিকটিকি গুমখুন হলেই হয়েছে। তদন্ত বন্ধ। তাছাড়া রাফ কাজ করার জন্যে তো লোক চাই। একলা হিংস্র—ঐ যা বলে ফেলেছিলাম আরেকটু হলে। আমার আবার লোকের গন্ধে হাঁপ ধরে!'

গুপি বিরক্ত হয়ে চুপ করে রইল। কিন্তু শিরার মধ্যে রক্ত চঞ্চল হয়ে উঠল। আঃ, বিপদ কী ভালো জিনিস! প্রাণ হাতে করে পাহাড়ের পথে পথে ঘুরে বেড়ানো। পিছনে ছটু আর পালক। এর চেয়ে ভালো আর কি হতে পারে?

বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছতেই ছটু আর পালক পা চালিয়ে ওদের ধরে ফেলল। দুজনেই একসঙ্গে বলল, চাঁদুবাবু, আজ আমি মাংস পরিবেশন করব।' ছোটমামা কোন উত্তর না দিয়ে, গেটের পাশের ছোট চোরা ফটক দিয়ে ঢুকে পড়ল।

চৌকিদার বসবার ঘরে দুটো বড় বড় তেলের বাতি জেবলে দিয়ে বলল, 'বড় সাহেব আমার ভয় করছে। আমাকে দুদিনের ছুটি দিন। দিদিমার বড় বেমারি।'

সঙ্গে সঙ্গে ছটু আর পালকও বলল, 'আমাদের খরচা দিন। শেষটা কি বেঘোরে প্রাণ দোব ঐ বিকট ভাবে?'

ছোটমামা শুধু বলল, 'আগে খাওয়া-দাওয়া হোক। তোদের অত ভয় কিসের রে? কালই সব চুকেবুকে যাবে।'

কিছু বুঝতে না পেরে গুপি চারিদিকে চেয়ে দেখল। জানালার কাঁচ দিয়ে দেখা গেল বাইরে ঘুটঘুটে অন্ধকার হয়ে গেছে। পাহাড়ের ছায়ায় ঘেরা এসব জায়গায় সূর্য ডোবার সঙ্গে সঙ্গে ঝপ করে অন্ধকার হয়। বুকটা একটু ঢিপঢিপ করতে লাগল। থমথমে চুপচাপ। পাশের ঘরে চৌকিদার বাসনপত্র নাড়ছে, তার যা একটু শব্দ। হঠাৎ তারি মধ্যে দিয়ে খড়র খড়র করে করাত দিয়ে কাঠ চেরার মতো আওয়াজ হল। অমনি চৌকিদার মাংসের হাঁড়ি ফেলে ছুটে ছোট-মামাকে জাপটিয়ে ধরল

আর ছটু আর পালক আমার গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে বলল, ঐ শুনুন, খাঁচার শিকে নখে শান দিচ্ছে! তাকাতে ভয় করে। রেল ভাড়াটা দিয়ে দিন।'

ছোটমামা বলল, 'ছালটা ছাড়িয়ে ফ্যাল, হাত পা বেঁধে দে, ব্যস তোদের ছুটি। এই রকম সাহস নিয়ে তোরা সমাদ্দারের টিকটিকি হতে চাস?'

তখন গুপি বলল, 'ছোটমামা, সব ব্যাপার যদি খুলে না বল তো আমি চললাম। আমার রিটার্ন টিকিট আছে।'

ছোটমামা ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে বলল, 'আগে খাওয়া যাক! তারপর বলব! ও ছটু, ও পালক, তোমরা তিনপোয়া মাংস নাও, আমাদের এক পোয়াতেই হবে।'

গুপি বলল, 'না, মোটেই হবে না। ছোটমামা প্রায় কেঁদেই ফেলে আর কি? 'আর বাড়াস নি রে গুপে। সব খুলে বলব, তখন তুই আর তোর মামাকে একা ফেলে পালাতে পারবি নে।'

চৌকিদার বলল, 'একা কেন হবে বড় সাহেব। ওরা তো আছেন।' ছোটমামা তাই শুনে দুহাতে মুখ ঢাকল।

কোন রকমে খাওয়া চুকল, অথচ একশোবার বলতে হবে খাসা রান্না।

মুখ-হাত ধুয়েই ছোটমামা বলল, 'দেখবে চল, তবে। পালক আলো নিয়ে আয়।'

চৌকিদার বলল, 'আমি বাসনপত্র মুচ্ছি। আপনারা যান! এই ছুটুটা ভারি ভীতু।'

বড় আস্তাবলের এক কোণে বড় একটা খাঁচা। তাতে চাকা লাগানো। লাইনের আলোয় গুপি দেখল, ভিতরে একটা ভালুক। শিক ধরে একদৃষ্টে চেয়ে আছে। চোখে পলক পড়ছে না। ঠোঁটের কোণা দিয়ে নাল গড়াচ্ছে। মনে হল বিড় বিড় করে কি বলছে। গুপি একহাত পিছিয়ে গেল।

নিজে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে গুপিকে ঠেলে দিয়ে ছোটমামা বলল 'ঐ দেখ, আগে থাকতেই ভয়ে আধমরা। বলছি ওটা সত্যিকার ভালুক নয়: কুখ্যাত জালিয়াৎ নটুবিহারী, গোয়েন্দার হাত এড়াবার জন্য ভালুকের ছাল পরে সার্কাসের জানোয়ারদের মধ্যে লুকিয়ে আছে। কি আর বলব রে, রোজ ঐ ভালুকের খেল দেখতে শহর শুদ্ধ ছেলেবুড়ো ভেঙে পড়ছে। আর কেন নটুবাবু, এবার খেল শেষ হয়েছে। ভাল মানুষের মতো ছাল ছেড়ে বেরিয়ে এসো। আমাদের সমাদ্দার সাহেব গবরমেণ্টকে বলে-কয়ে তোমাকে মাপ করিয়ে দেবে। ঐ খাঁচায় তো আর জীবন কাটাতে পারবে না।'

ভালুক চুপ করে রইল। শুধু মিটমিটে আলোয় মনে হল চোখ দুটো একবার চকচক করে উঠল।

ছোটমামা গুপিকে আবার ঠেলে দিয়ে বলল, 'যা না, এ তো কিছুই না। ঘাবড়াচ্ছিস কেন? সব ঠিক করে রেখেছি। তুই বললেই এই দড়ি ধরে টানব, খাঁচার দরজা উপরে উঠে যাবে, ব্যস, আর কিছু নয়। তুই দৌড়ে গিয়ে এক হাতে ওকে জাপ্টে ধরে অন্য হাতে চোয়ালটা ধরে এক টান দিবি অমনি খট্ করে মুণ্ডু খুলে যাবে আর নটুবিহারী—সপ্রকাশ।'

গুপি বলল—'তুমি গিয়ে জাপ্টে ধর না। আমি চোয়াল টানব। ছোটমামা বেজায় চটে গেল, 'বলেছি তো, আমার হে-ফিবার আছে, ভালুক দেখলে হেচকি আসে—হিচ্।' গুপি বলল, 'ছটু, ও পালক।' ছটু পালক দরজার বাইরে থেকে বলল, 'সাতদিন ধরে বড় সাহেবের কথায় আমরা চাকর সেজে সার্কাসে নাম লিখিয়ে ভালুকের খাঁচা ধুয়েছি, ভালুকের গোবর সাফ করেছি। কাল রাতে সবাই ঘুমোলে প্রাণ হাতে করে খাঁচা ঠেলে এখানে এসেছি। সত্যি ভালুক না হতে পারে কিন্তু নুটুবাবুর নখগুলোও তো কিছু কম যায় না।' এই বলে ওদের গায়ে হাতে আঁচড় কামড়ের দাগ দেখাল। নুটুবাবু একটু মুচকি হেসেই আবার গম্ভীর হল।

পালক আরো বলল, 'নিজেরা তফাতে থাকবেন আর আমাদের নুটুবাবুর সামনে ঠেলে দেবেন। ওর ঐ ভালুকছালের পকেটে বোমা নেই বলেছে? নিজেদের যদি একটু সাহস থাকত—'

ছোটমামা বলল, 'না আর অপমান সহ্য হয় না,—গুপে, যা বলছি। তোকে দূরবীণটা দিয়ে দেব।'

এবার আর বলতে হল না। গুপি এক দৌড়ে খাঁচার কাছে গেল! ছোটমামা দরজা টেনে তুলল আর নুটুবাবু বেরিয়ে গুপিকে জাপটিয়ে ধরে, শূন্যে তুলে সে কি মড়াকান্না জুড়ে দিলে! সকলের গায়ের রক্ত জল। ছোটমামা দু একবার 'ও কি নুটুবাবু, ওকে ছেড়ে দিন বলছি, ইয়ার্কি হচ্ছে নাকি?

নুটুবাবু গুপির কানের কাছে ঘ্যোঁত ঘ্যোঁত করতে লাগল। আর তাই দেখে চৌকিদার ছটু পালক সে যে কি হল্লা লাগাল। 'ভালুক ধরল রে, ওরে বাবা রে! ভালুক খেল রে!'

আশেপাশে ধুপধাপ শব্দ। হুড়মুড় করে সার্কাসের লোক এসে উপস্থিত। তারা ভালুকের খোঁজে বেরিয়েছিল, তাদের দেখেই ভালুক গুপিকে ছেড়ে দিয়ে ওদের একজনের গলা জড়িয়ে সে কি হাউমাউ। সেও ওর গায়-মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, 'আরে চুন্নি রে, তোকে না দেখে আমারো খাওয়া-দাওয়া মাথায় উঠেছিল রে! কিছু মনে করবেন না, স্যার, দশ বছর ধরে শিখিয়ে পড়িয়ে মানুষ করেছি ওকে। ও আমার মেয়ের মত!'

শুনে গুপিও লাফিয়ে উঠল, 'অ্যাঁ। মেয়ে নাকি? তবে যে ছোটমামা বলল নুটুবিহারী? সবাই শুনে অবাক! ছোটমামাও আমতা আমতা করে বলল, 'ইয়ে—কি—বলে—আমার কোন দোষ নেই। সমাদ্দার সাহেবের কাছে বেনামী চিঠি এসেছিল, নুটুবাবু ভালুক সেজে সার্কাসে ঢুকেছে!'

তাই শুনে চৌকিদার কপাল চাপড়ে লাফিয়ে উঠে বলল, 'আরি বাবা, কি তাজ্জবের ব্যাপার। এই তারটা দুপুরে এসেছিল, দিতেই ভুলে গেছি।' সমাদ্দারের তার, 'বেনামা চিঠি হোক, নুটুবাবু বামাল সমেত ধরা পড়েছে।'

এতক্ষণ পরে ছোটমামার সব ব্যাপারটা মালুম হল। অমনি 'তবে কি ঘরের মধ্যে ভালুক ঢুকিয়েছিলাম নাকি রে! ওরে আমাকে ধর!' এই বলে হাত পা এলিয়ে স্রেফ ভির্মি। তারপর

দশদিন বিছানায়। সেই দশদিন গুপির যে কি আনন্দে কেটেছিল। রোজ সকালে সার্কাসের জানোয়ারদের খাওয়া দেখতে যেত, বিকেলে খেলা দেখত। ভালুক সরানোর জন্য মালিক এতটুকু রাগ করেননি। বরং উল্টে বলেছিলেন এরকম দক্ষ টিকটিকির বাড়িতে রোজ মুরগি খেতে পাওয়াও সৌভাগ্য। তাছাড়া যখন ছটু আর পালক, যারা আসল চোর তারাই ফেরারী, তখন পুলিশ ডাকার কোনো মানেই হয় না। আজও মুরগির দো-পেঁয়াজী হবে নাকি?' গুপি ভাবছে দ্বিতীয় টিকটিকি তো বাড়িতে একজন আছেই। আবার তৃতীয় টিকটিকি না হয়ে সার্কাসে ভালুকের খেলা দেখালে কেমন হয়? কিন্তু ছোটমামা নাকি টেলিস্কোপটা খুঁজে পাচ্ছে না, এই যা দুঃখ।





চিরঞ্জীব সেন

পোড়ো বাড়িতে খুন

পাড়ার গেজেট পঞ্চানন পাকা খবর নিয়ে এল "নন্দী নিবাস" ভাড়া হয়ে গেল। নন্দী নিবাসের বয়স অন্ততঃ একশ বছর। উত্তর কলকাতার নেবুবাগানের নন্দীবাবুরা এই বাগানবাড়িটা বানিয়েছিলেন। বাড়িটা থাকলেও আজ আর বাগান নেই। নতুন বাজার ওদের কাঁসার বাসন ও গোলদারি দোকান ছিল। সেই ব্যবসাতেই ওদের পয়সা।

বাগানবাড়িতে সকলে একতলা বানায় তা তিনতলা কেন বানান হয়েছিল তা বর্তমান মালিকরা জানেন না।

অযত্নে বাড়িখানা ভেঙে পড়বার উপক্রম হয়েছিল। ভাগ্যিস মহাযুদ্ধ বেঁধে গিয়েছিল তাই মিলিটারি বাড়িখানা ভাড়া নিয়ে মেরামত করে দরজা জানলা সারিয়ে রং ফিরিয়ে তাদের কাজের উপযোগী করে নিয়েছিল। তিনতলা বলেই নাকি বাড়িখানা মিলিটারি ভাড়া নিয়েছিল।

দমদমে যশোর রোডের ধারে সাতগাছি অঞ্চলে নন্দী নিবাস—ডিডিটি ছিটিয়ে, পাড়া থেকে মশা তাড়িয়েছিল। বাগানের যেটুকু অবশিষ্ট ছিল সে সব মাঠ করে মিলিটারি লরির গ্যারাজ বানিয়েছিল। বাড়িতে ওরা ড্রামভর্তি ব্লিচিং পাউডার, ফিনাইল, তরল ডিডিটি আর কিসব রসায়ন মজুত রাখত।

যুদ্ধ শেষ হবার দেড় বছর পরে মিলিটারি বাড়ি ছেড়ে দেয়। বাড়ী ফেরত পেয়ে নন্দীবাবুরা খুসি হয়েছিলেন। যুদ্ধের পরে অনেকের হাতে প্রচুর টাকা থাকলেও সাতগাছিতে অতবড় বাড়ি কেনার খরিদ্দার পাওয়া যাচ্ছিল না। যুদ্ধের আগে তো এখানে শেয়াল ডাকত। যশোর রোডের ওপরে হলে

হয়ত কেউ কারখানা করত। পাড়া তখনো জমজমাটি হয় নি। মাত্র দু একটা রুটের বাস চলত, তাও সংখ্যায় কম। বাড়িখানা পড়েইছিল। লেক টাউন, বাঙ্গুর অ্যাভিনিউ তখনও তৈরি হয় নি। পাতি-পুকুরের পরে অঞ্চলটা বেশ ফাঁকা ছিল। যাই হক পঞ্চাননের কথাই ঠিক। বাড়িখানা সত্যিই ভাড়া হয়ে গেল। মোষের গাড়ি বোঝাই করে কিছু মালপত্তর ও আসবাব এল, ইলেকট্রিক আলো জ্বলল, টেলিফোনও এল কিন্তু মানুষ এল মাত্র দুজন।

একজন বৃদ্ধ, বয়স সত্তর নিশ্চয়। বেশ লম্বা, মোটাসোটা, দুপাশে ঝোলানো গোঁফ, পরনে লম্বা ঝুলওয়ালা গলাবন্ধ কোট। বাতের রোগী বোধহয়, ট্যাকসি থেকে নামতে দেরি হল। লাঠি ধরে কোনোরকমে সঙ্গীর কাঁধে ভর দিয়ে হেঁটে অতিকষ্টে হাঁপাতে হাঁপাতে বাড়ির ভেতরে ঢুকলেন। তাঁকে আর কোনদিন কেউ বাড়ি থেকে বেরোতে দেখে নি। সঙ্গে যে এসেছে তাকে দেখে তার আচরণ লক্ষ্য করে তাকে পরিচারক বলেই মনে হল। তার বরস পঞ্চান্নর ওপর তো হবেই, মাথার চুল ও গোঁফ কাঁচাপাকা। পরনে ডোরাকাটা পাজামা ও ছিটের হাফশার্ট, পায়ে চপ্পল।

ব্যস্ মাত্র ওই দুজন। যে কয়েকজন ভিড় জমিয়েছিল তারা অবাক। দুজন লোক এতবড় বাড়ি ভাড়া নিল কেন? এসব প্রশ্নের উত্তর তখন পাওয়া যায় নি।

ঐ অঞ্চলে পঞ্চানন ঘোষের একটা খাটাল ছিল। গরু মোষ মিলিয়ে গোটা পঞ্চাশ পশু ছিল। হাসপাতাল আর মিষ্টির দোকানে দুধের যোগান দিত। বাড়িবাড়ি দুধ দেওয়া তার পোষাত না তবে বিশেষ পরিচিত কয়েকজন তার খাটালে এলে সে দুধ বেচত।

নন্দী নিবাসের নতুন ভাড়াটের পরিচারক চরণ দাস মাইতি একদিন অ্যালুমিনিয়মের একটা ক্যান এনে এক সের দুধ চাইল। দাম নগদে মিটিয়ে দিয়ে বলল, সে রোজ এই সময়ে এসে এক সের করে গরুর দুধ নিয়ে যাবে, দাম নগদে মিটিয়ে দেবে কিন্তু দুধ খাঁটি হওয়া চাই, এক ফোঁটা জল মেশান চলবে না।

এই সময়ে পঞ্চানন লুঙ্গি পরে ফতুয়া গায়ে হাতে পেনসিল নিয়ে একটা টুলে বসে থাকত। কোথায় কত দুধ গেল বা নগদে কত দুধ বিক্রি হল ওসবের হিসেব রাখত। পরিচারককে দেখে পঞ্চানন তাকে কাছে ডেকে তার ও মনিবের খোঁজ নেবার চেষ্টা করল কিন্তু পরিচারক সেদিন নিজের নামটুকু ছাড়া আর কিছুই বলে নি। তার কাছ থেকে একটার বেশি দুটো কথা বার করা গেল না। চরণ দাস মাইতি নামটি ছাড়া এবং তার প্রত্যহ গরুর এক সের খাঁটি দুধ চাই ওর বেশি কিছু জানা গেল না। ডাকপিয়ন মারফত মনিবের নাম পরে জানা গিয়েছিল, রতনচাঁদ আয়কত। পিয়ন বলেছিল যে সে মাত্র কয়েকবার চিঠি দিতে গিয়েছিল। জানলা গলিয়ে চিঠি ফেলে দিত কিন্তু বাড়িতে কোনো মানুষ আছে বলে মনে হত না। একবার শুধু একটা বেড়ালের ডাক শুনতে পেয়েছিল।

পঞ্চানন বা অন্য যারা চরণ দাস মাইতিকে রোজ দেখত তারা ওকে বলত 'উনুন মুখো'। সে কোনো দিন একটাও কথা বলে নি।

ব্যাপারটা ক্রমশঃ থিতিয়ে এল। প্রতিবেশীদের আগ্রহ কমে গেল।

সারা অঞ্চলটা কাঁপিয়ে দিয়ে একদিন ঘটনা একটা ঘটল বটে। তখন সবে রাত্রি আটটা, দমদম থানায় টেলিফোন বেজে উঠল। ক্ষীণ একটা কণ্ঠস্বর শোনা গেল, দমদম থানা—।

একজন সাব-ইনস্পেক্টর টেলিফোন ধরেছিল, জিজ্ঞাসা করল, কে বলছেন? জোরে বলুন। কিন্তু জোরে বা আস্তে কোনো কণ্ঠস্বর শোনা গেল না তবে একটা কিছু পড়ার আওয়াজ শোনা গেল।

গুরুতর কিছু একটা অনুমান করে এবং টেলিফোনে আর কোনো সাড়াশব্দ না পেয়ে এস-আই তখনি টেলিফোন এক্সচেঞ্জের সঙ্গে যোগাযোগ করে ফোনের উৎস জেনে নিল। তখনও অটোম্যাটিক এক্সচেঞ্জ চালু হয় নি। অপারেটর দ্রুত বলে দিল কত নম্বর থেকে কনেকশন চাওয়া হয়েছিল। বিশেষ টেলিফোন গাইড-বুকে নম্বর মিলিয়ে ঠিকানা পাওয়া গেল! এস আই ব্যাপারটা তখনি থানায় ও সি-কে জানাতে তিনি একজন এস আই ও কনস্টেবলকে সাতগাছির নন্দী নিবাসে পাঠালেন।

এস আই বিজয় ঘোষ এসে দেখল সমস্ত পাড়া নিস্তব্ধ এবং নন্দী নিবাস বাড়িটা এতই নিস্তব্ধ ও অন্ধকার যে মনে হল যেন প্রেতপুরী। বাড়িতে কেউ আছে বলে মনে হল না।

মোটর সাইকেল থেকে দুজনে নেমে বারান্দায় উঠে হাঁক পাড়ল, বাড়িতে কেউ আছেন? কোনো সাড়া নেই। কোথাও পাড়ার একটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করে ডেকে উঠল। কোনো সাড়া না পেয়ে বিজয় ঘোষ টর্চ জ্বালল। সামনে তিনটে দরজা, দুটো দরজা বন্ধ, একটা দরজা হাট করে খোলা। কনস্টেবলের হাতে টর্চ দিয়ে বিজয় ঘোষ কোমর থেকে রিভলবার বার করল।

ঘরে ঢুকে কনস্টেবল চারদিকে টর্চের আলো ঘোরাতে লাগল। এটা একটা বড় হল। হলের ওধারে পাশাপাশি কয়েকটা ঘর। একটা ঘরের দরজা খোলা। সেই ঘরে টর্চের আলো পড়তেই বীভৎস দৃশ্য চোখে পড়ল। দুজনেই শিউরে উঠল। হাতে টেলিফোনের রিসিভার ধরে এক বৃদ্ধের মৃতদেহ মেঝেতে পড়ে রয়েছে। রক্তে মেঝে ভেসে যাচ্ছে।

বিজয় ঘোষ সুইচ টিপে আলো জ্বালাল। বৃদ্ধের হাত থেকে টেলিফোনের রিসিভার মুক্ত করে সে ঘটনাটা তৎক্ষণাৎ থানার ওসিকে জানাল। ওসি তখনি ছুটে এলেন। প্রাথমিক তদন্ত সেরে তিনি হেডকোয়ার্টারে সব জানিয়ে তাদের সাহায্য চাইলেন।

ব্যাপারটা তখনি সি আই ডিকে জানিয়ে তাদের ওপরে তদন্তের ভার দেওয়া হল। রাত পৌনে এগারোটায় সহকারী বীরু দত্তকে নিয়ে ইনস্পেক্টর গোরা হালদার নন্দী নিবাসে এসে পৌঁছল।

এস আই বিজয় ঘোষ বলল, সে কিছু নাড়াচাড়া করেনি শুধু সময় বাঁচাবার জন্যে মৃতের হাত থেকে টেলিফোনের রিসিভার মুক্ত করে দমদম থানায় ওসি-কে ফোন করেছিল।

নন্দী নিবাস থেকে পঞ্চাননের বাড়ি ও খাটাল বেশি দূরে নয়। নন্দী নিবাসে যেতে হলে তার বাড়ির পাশের রাস্তা দিয়ে যেতে হয়। প্রথমে মোটর বাইকের আওয়াজ, পরে একটা গাড়ির আওয়াজ

এবং প্রায় দু ঘণ্টা পরে আবার একটা গাড়ি নন্দী নিবাসের দিকে গেল। প্রথম গাড়ি দুটোর আওয়াজ শুনলেও পঞ্চানন তেমন গুরুত্ব দেয়নি কিন্তু দু ঘণ্টা পরে আবার একটা গাড়ি এল কেন ?

পঞ্চানন শুতে যাচ্ছিল কিন্তু সব বিষয়ে তার কৌতূহল। দেখতে হচ্ছে ব্যাপারটা কি ?

গোরা হালদার দেখল মৃতের মাথার একধারে ডাণ্ডা বা হাতুড়ি জাতীয় কিছু দিয়ে সজোরে আঘাত করা হয়েছে। বোধহয় আততায়ীর আগমন টের পেয়ে ফোনের রিসিভার তুলে দমদম থানা চেয়েছিল, কানেকশন পেয়েও ছিল কিন্তু সর্বনাশ হয়ে গেল।

গোরা হালদার তখনও মৃতের পরিচয় পায়নি। এমন সময়ে পঞ্চাননের আগমন। বাইরে যে কনস্টেবল পাহারায় ছিল সেও পঞ্চাননকে ঢুকতে দিচ্ছিল না কিন্তু বাইরে কথাবার্তার আওয়াজ শুনে বীরু বাইরে এসে পঞ্চাননকে দেখে স্থানীয় লোক বলে বুঝতে পারল। তার কাছে কিছু তথ্য জানা যেতে পারে ভেবে পঞ্চাননকে বীরু ভেতরে গোরা হালদারের কাছে নিয়ে গেল।

ভেতরে ঢুকে রতনচাঁদের লাসের বীভৎস দৃশ্য দেখে পঞ্চাননের ভীর্মি যাবার উপক্রম। সামনে গিয়ে বলল, তার ধারণা ছিল এ বাড়িতে যারা এসেছে তারা নিশ্চয় কোনো গুপ্তকাজ করে নইলে এত ঢাকঢাক গুড়গুড় কেন ?

কি রকম ? গোরা হালদার জিজ্ঞাসা করল।

পঞ্চানন ঘোষ বলল, বাড়িতে তো থাকত দুজন লোক, বাতে পঙ্গু একজন বৃদ্ধ নাম বুঝি রতনচাঁদ আয়কত আর তার চাকর চরণ দাস মাইতি। তা স্যার ঐ উনুনমুখো চাকরটা আমার খাটালে রোজ দুধ নিতে যেত। একটা কথাও বলত না। সে গেল কোথায় ? সেই ব্যাটাই কি খুনটা করে পালাল নাকি ?

লোকটার চেহারা কেমন ছিল ? গোরা হালদার জিজ্ঞাসা করল।

পঞ্চানন চরণ দাসের চেহারার বর্ণনা দিয়ে বলল. কিন্তু স্যার লোকটা খুন করতে পারে বলে মনে হয় না। লোকটা নিশ্চয় এই বৃদ্ধের খুব বিশ্বাসী ছিল নইলে তিনি কি আর তাকে নিয়ে একা এই বাড়িতে থাকতে সাহস করতেন ?

ইতিমধ্যে বীরু ও থানার অন্য লোকেরা ঘরে খোঁজ খবর করছিল! একটা হাফ সেক্রেটারিয়েট টেবিল ছিল। তিনটে ড্রয়ারেই তালা লাগান। ছোট একটা আলমারিতে তালা ঝুলছে। অতএব চুরি ডাকাতি যে উদ্দেশ্য তা এখনি বলা যাচ্ছে না।

এখন প্রশ্ন হল চরণ দাস মাইতি গেল কোথায় ? সে যদি খুনী না হয় তাহলে কী খুনীরা তাকে ধরে নিয়ে গেল ?

পঞ্চাননকে ছেড়ে দিয়ে গোরা হালদার নিজেই এবার তদন্ত শুরু করল। বাড়ির একতলায় মাত্র কয়েকখানা ঘর ব্যবহার করা হত। দোতলা তিনতলা ত তালাবন্ধ। মিলিটারিরা হলঘরের মার্বেলের মেঝের দফা রফা করে দিয়েছে। হল ঘর থেকে একটা প্যাসেজ বাগানের দিকে চলে গেছে।

প্যাসেজ যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে ওপরে মালপত্র তোলবার জন্য মিলিটারিরা হস্তচালিত একটা লিফট বসিয়েছিল। সেটা এখনও রয়েছে। দেওয়ালে একটা চাকার সঙ্গে দড়ি লাগান আছে। চাকা ঘুরিয়ে লিফট ওঠা নামা করান হত। হালে কেউ লিফট চালিয়েছিল কিনা তা রাত্রে অন্ধকারে ভাল বোঝা গেল না।

সব দেখা শেষ হলে গোরা হালদার মেঝে পরীক্ষা করতে আরম্ভ করল। কিচেনের সামনে প্যাসেজে বেশ বড় বড় ফোঁটা রক্ত দেখা গেল। এখানে রক্ত কি করে এল? কার রক্ত? নমুনা তখনি সংগ্রহ করা হল।

আজ রাত্রে আর কোনো কাজ নেই, কাল সকালে আসতে হবে।

দমদম থানার এস· আই· বিজয় ঘোষকে নন্দী নিবাসে আসতে বলে গোরা হালদার সাতগাছি অভিমুখে যাত্রা করল। নন্দী নিবাসের পথে ঢোকবার আগে যশোর রোডে একটা ছোট মুদিখানা দোকানে সে চরণ দাস মাইতি সম্বন্ধে কিছু খোঁজ নিল। দোকানে তখন আরও দু-তিনজন খরিদ্দার ছিল। স্বয়ং মুদি এবং আরও কয়েকজন বলল তারা চরণ দাসকে চেনে। সপ্তাহে দু তিন দিন সে দোকানে আসত, আলু, ডিম, পেঁয়াজ, আদা, ডাল এবং প্রয়োজনীয় কিছু কিনত। কিন্তু সে কোনো প্রশ্নের জবাব দিত না, নিজের বা তার মনিব সম্বন্ধে একটাও কথা বলে নি।

পঞ্চাননের খাটালে যে লোকটি চরণদাসকে দুধ মেপে দিত ও পয়সা নিত সে বলল নন্দী নিবাসের কম্পাউণ্ডে শুকনো পাতার সঙ্গে কিছু কাগজ যেমন চিঠি বিল এই রকম আর কি চরণ দাস পোড়াচ্ছে, সে অন্ততঃ দু দিন দেখেছে। মোটের ওপর রতনচাঁদ আয়কত বা চরণ দাস মাইতি সম্বন্ধে কিছু জানা গেল না।

বিজয় ঘোষ নন্দী নিবাসে পৌঁছে গিয়েছিল। সে বলল গতরাত্রে সে যখন এ বাড়িতে এসে-ছিল তখন কিচেন ছাড়া সমস্ত বাড়িটাই অন্ধকার ছিল। কিচেনে সে ঢোকেনি একবার মাত্র উঁকি দিয়েছিল।

গোরা হালদার রাত্রে এসে কিচেনে আলো জ্বলতে দেখেছিল। সেই রক্ত সম্বন্ধে খোঁজ করতে সে কিচেনে ঢুকেছিল। সন্দেহ হয়েছিল আততায়ী কোনোভাবে জখম হয়েছে এবং সে হয়ত জখম স্থান ধোবার জন্যে জলের সন্ধানে রান্নাঘরে ঢুকেছিল। রান্নাঘরে কুঁজোতে পানীল জল ছিল কিন্তু সে জল ব্যবহার করা হয়েছিল কিনা তা জানবার উপায় নেই। সেই রক্ত কি চরণ দাসের?

চরণ দাসের চেহারায় বর্ণনা জানিয়ে সমস্ত থানাকে সতর্ক করে দেবার ব্যবস্থা তখনি করা হল।

হাফ সেক্রেটারিয়েট টেবিলের তিনটে ড্রয়ারের এবং আলমারির তালা গোরা হালদার খুলে কিছু কাগজ পত্র, ডায়েরি, একটা ছোট খাতা পেল। খাতায় সাঁটা আছে খবরের কাগজের কয়েকটা ক্লিপিং। আর পাওয়া গেল একটা চামড়ার ব্যাগ ও একটা থলে।

রতনচাঁদ আয়কতের নাম কয়েক জায়গায় পাওয়া গেলেও কোথাও তার বা অন্য কারও ঠিকানা

পাওয়া গেল না। তবে জানা গেল রতনচাঁদ দেশ স্বাধীন হবার আগে বঙ্গদেশ ভাগ হবার আগে পূর্ব বঙ্গে ঢাকা, মৈমনসিং এবং চট্টগ্রামে ছিলেন।

চামড়ার ব্যাগে ভর্তি ছিল একশ টাকা, দশ টাকা ও পাঁচ টাকার নোট। কোনো ব্যাংকের পাসবই পাওয়া যায় নি। জানা গেল ডাক পিয়ন কয়েকখানা মাত্র চিঠি নন্দী নিবাসে বিলি করেছিল। ডাক পিয়নের কাছ থেকে জিজ্ঞাসা করে জানা গেল যে চিঠিগুলি এসেছিল কুমিল্লা ব্যাংকিং করপোরেশনের ঢাকা, চট্টগ্রাম ও মৈমনসিং শাখা থেকে। কিন্তু সে রকম কোনো চিঠি পাওয়া গেল না। সম্ভবতঃ অন্যান্য কাগজপত্রের সঙ্গে সেগুলি চরণদাস পুড়িয়ে দিয়েছে।

কোনো চিঠি বা উইল পাওয়া গেল না। তবে একটা খাতা পাওয়া গেল। ঢাকা থেকে প্রকাশিত "সোনার বাংলা" এবং চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত "পাঞ্চজন্য" পত্রিকায় একটি খুনের মামলার বিবরণী প্রকাশিত হয়েছিল! তারই ধারাবাহিক কাটিং ঐ খাতায় সাঁটা ছিল। রতনচাঁদ আয়কত হয়ত পরোক্ষ-ভাবে এই মামলার সঙ্গে জড়িত বা কোনো কারণে আগ্রহী।

খলিল এবং জাহির ঢাকার কলকাতা বাজারে উমেশ বণিক নামে এক ব্যবসায়ীকে খুন করেছিল। দায়রা জজ ঐ দুজনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ দিয়েছিলেন। তখন সবে পূর্ব পাকিস্তান সৃষ্টি হয়েছে। ডামাডোল চলছে। হিন্দুকে খুন করার অপরাধে সম্ভবতঃ মুসলমান খুনী দুজনের দণ্ডাদেশ কার্যকর করা হয় নি। পরবর্তী কাগজের কাটিংগুলিতে তেমন কোনো আভাস পাওয়া গেল না কিংবা খলিল ও জাহির কোথায় গেল তাও জানা যাচ্ছে না। এখন পূর্ব পাকিস্তানের যে অবস্থা তাতে কিছু জানা যাবে না।

তবে ঐ মামলার যিনি পাবলিক প্রসিকিউটার ছিলেন তাঁর নাম জানা গেল। অরবিন্দ দাসগুপ্ত। সেই দেশ ভাগের সময়ে হিন্দু সরকারী কর্মচারীরা প্রায় সকলেই ভারতে চলে এসেছিলেন। অরবিন্দ দাসগুপ্তর খোঁজ পাওয়া গেল। তিনি আলিপুর আদালতে নিযুক্ত আছেন। বিজয়গড় রিফিউজি কলোনিতে আপাতত তিনি সপরিবারে বাস করছেন।

কিন্তু সেই রক্তের ফোঁটা? জানা গেল সে রক্ত নিহত রতনচাঁদ আয়কতের নয়। চরণদাসের হতে পারে কিন্তু চরণদাস কোথায়?

"সোনার বাংলা" আর "পাঞ্চজন্য" পত্রিকার কাটিংগুলো পড়ে জানা গেল যে উমেশ বণিকের বাড়ি ডাকাতি করার উদ্দেশ্য ছিল লুটপাট করা। উমেশ বণিক ধনী ব্যক্তি ছিল। কয়েকজন মিলে একটা নৌকো ভাড়া করে ওরা পূর্ব বঙ্গ ত্যাগ করবার মতলব করছিল। জাহির ও খলিল উমেশ বণিকের কাছ থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা দাবি করে। উমেশ অত টাকা দিতে রাজি হয় নি ফলে তার বাড়িতে ডাকাতি হল। উমেশকে খেসারত দিতে হল। ডাকাতরা সর্বস্ব লুট করে নিয়ে গেল। তার স্ত্রীর কোনো খবর পাওয়া যায় নি। লুটের মালও কিছুই উদ্ধার হয় নি। উমেশের একটি কিশোরী কন্যা ও কিশোর পুত্র ছিল। দেশ ভাগ হবার আগেই উমেশ তাদের ভারতে পাঠিয়ে দিয়েছিল।

অরবিন্দ দাশগুপ্তর কাছ থেকে বিস্তারিত জানা যাবে। চারটে পয়সাওয়ালা কারুকাজ করা রুপোর একটা বাক্স নন্দী নিবাসের আলমারিতে পাওয়া গিয়েছে। এর মধ্যে কিছু অলংকার ছিল হয়ত। সেগুলো গেল কোথায় ?

মামলার যে বিবরণী পত্রিকায় ছাপা হয়েছে তাতে কোথাও কিন্তু রতনচাঁদের নাম নেই। রতনচাঁদ তাহলে মামলার বিবরণী পত্রিকার পাতা থেকে কেটে খাতায় সেঁটে সযত্নে রক্ষা করছিল কেন ? সে খুনই বা হল কেন ? চরণদাস গেল কোথায় ?

নন্দী নিবাসের মালিকের ঠিকানা পঞ্চাননের কাছেই পাওয়া গেল। মালিক কান্তিভূষণ নন্দী বলল, শুধু একতলাটাই রতনচাঁদ আয়কতকে একজন দালাল মারফত ভাড়া দেওয়া হয়েছিল। রতনচাঁদকে বা চরণদাসকে কান্তিভূষণ চেনে না। দালালের ঠিকানাও সে জানে না। এক বছরের ভাড়া মাসিক ৬০ টাকা হিসেবে নগদ ৭২০ টাকা পেয়ে কান্তিভূষণ খুসি হয়েছিল।

দালালকে পেলে রতনচাঁদ সম্বন্ধে কিছু তথ্য পাওয়া যেত। বীরু বলল, দালালও হয়ত কিছু বলতে পারবে না। এমনও হতে পারে যে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে দালাল যোগাযোগ করেছিল। এখন চরণদাসকে খুঁজে বার করা জরুরী।

ঠিক বলেছিস বীরু ! চলত বাড়িটা আর বাইরেটা আর একবার ভাল করে দেখি।

বীরু বলল তাহলে চল গোরাদা আগে বাড়ির বাইরেটা দেখে আসি। চরণদাস কাগজপত্তর পোড়াতো, কিছু টুকরোটাকরা পাওয়া যেতে পারে।

রান্নাঘরের পাশ দিয়ে যে প্যাসেজটা দিয়ে বাইরে যাওয়া যায় সেই দিক দিয়ে যাবার সময় দুজনেরই নাকে হালকা একটা পচা গন্ধ লাগল। কিসের গন্ধ ? মরা ইঁদুরের গন্ধ ? প্যাসেজ পরিষ্কার। ইঁদুরের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না।

পাশে ছিল হাতে চালান লিফটের চাকা, লিফট তখন নিচে নামান ছিল।

গোরা হালদার বলল, বীরু, চাকা ঘুরিয়ে লিফটটা তোল ত। আমার একটা সন্দেহ হচ্ছে।

চাকায় দুটো হাতল লাগান ছিল। হাতলদুটো ধরে চাকা ঘোরাতে লিফট আস্তে আস্তে ওপরে উঠতে লাগল। বেশি তুলতে হল না পচা গন্ধটা নাকে ধাক্কা মারতে লাগল।

গোরা হালদারের নির্দেশে বীরু লিফট পাঁচ ফুট পর্যন্ত ওপরে তুলে দড়ি বেঁধে লিফট থামিয়ে রাখল।

বীরু দেখে যা। লিফট রাখবার গর্তে লুঙ্গি আর ফতুয়া পরে চরণদাস মুখ থুবড়ে পড়ে আছে সঙ্গে দুটো টিনের সুটকেসও রয়েছে দেখছি।

লাস সনাক্ত করবার জন্য পঞ্চাননকে ডাকা হল। লাস দেখে সে বলল, এ লোক নিঃসন্দেহে চরণদাস মাইতি। বুকে দুবার ঠিক হৃদপিণ্ডের ওপরে ছোরা মারা হয়েছে। তাহলে মেঝেতে যে রক্ত পড়েছিল তা চরণদাসেরই হওয়া সম্ভব।

টিনের স্যুটকেস দুটোয় গয়না কাগজ কয়েকটা খালি কেস পাওয়া গেল। আর একটা স্যুটকেস সম্পূর্ণ খালি। সম্ভবতঃ একটা স্যুটকেসে অলংকার আর অপরটায় ক্যাশ টাকা রাখা ছিল।

তবে কি উমেশ বণিকের বাড়িতে ডাকাতি করে যে সব অলংকার ও নগদ টাকা পাওয়া গেছে তা এই দুটো স্যুটকেস ভর্তি করে রতনচাঁদের কাছে গচ্ছিত রাখা ছিল।

হলঘরে ফিরে এসে চিন্তিতভাবে গোরা হালদার বলল, বুঝলি বীরু, রক্তের দাগের রহস্যটা পরিষ্কার হয়ে যেতে দেখছি রতনচাঁদের খুনেরও একটা কিনারা হয়ে যাচ্ছে।

বীরু বলল, কি রকম ?

গোরা হালদার বলল, রতনচাঁদের ঘরে উমেশ বণিকের মামলার রিপোর্টটাই আমাকে পথ দেখাচ্ছে। পুরনো আসামীরাই এই নতুন ঘটনার পেছনে। এবং তারা এখনো কলকাতা শহরেরই কোথাও আত্মগোপন করে আছে।

বীরু বলল, তোমার কথা সত্যি বলে ধরে নিলেও, তুমি আসামীদের খুঁজে বার করবে কি করে ?

গোরা হালদার চিন্তিত ভাবে বলল, সে উপায়ও ভেবে নিয়েছি। শোন—

'সদ্য পূর্ব পাকিস্তান থেকে আসা দুজন লোককে আমার বিশেষ দরকার। সন্ধান দিতে পারলে নগদ দু'হাজার টাকা পুরস্কার !' এই বিজ্ঞাপনের সঙ্গে আমার বাসার টেলিফোন নাম্বার দেব।

বীরু বলল—খবরের কাগজে ?

গোরা হালদার বলল, বিলক্ষণ। দেখিস ঠিক লেগে যাবে। বাছাধনেরা কোন হোটেলে উঠলে ঠিক খবর পেয়ে যাব। পূর্ব পাকিস্তানের লোকের মুখের ভাষাই তাদের পরিচয় পরিষ্কার জানিয়ে দেয়।

মনে হচ্ছে গোরাদা তুমি ভুল ভাবোনি। বলল বীরু।

খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন ছাপা হল। যেদিন বিজ্ঞাপন ছাপা সল সেই দিনই সকাল সাতটার সময় গোরা হালদারের বাড়িতে টেলিফোন বাজল।

শিয়ালদার নিউ সুন্দর হোটেলের মালিক টেলিফোন করছে, বলল, মশাই আপনারা যাদের খুঁজছেন তারা আমার হোটেলে আছে।

তারা এখন কি করছে ?

ঘুমোচ্ছে।

ঘুমোচ্ছে ? বেশ। আমি এখনি যাচ্ছি কিন্তু দেখবেন ওরা দুজন যেন আপনার হোটেল ছেড়ে বাইরে বেরতে না পারে, যেভাবে হোক ওদের আটকে রাখবেন।

বুঝেছি, আপনি কি পুলিস ? আমি ত মশাই আজ ভোরে খবরের কাগজ দেখে আপনার ফোন নম্বব দেখে ফোন করলুম।

আমি পনেরো মিনিটের মধ্যে যাচ্ছি। আমি গেলে সব জানতে পারবেন।

গোরা হালদার দুটো কাজ করল। টালিগঞ্জ থানায় ফোন করে অরবিন্দ দাশগুপ্তর বিজয়গড়ের বাসার ঠিকানা নিয়ে বলল তাকে যেন এখনি লালবাজারে নিয়ে আসা হয় আর লালবাজারে বিশেষ বিভাগকে বলা হল এখনি যে শিয়ালদার নিউ সুন্দর হোটেল ঘেরাও করা হয়। কোনো লোক যেন হোটেল থেকে বাইরে বেরতে না পারে।

কুড়ি মিনিটের মাথায় গোরা হালদার ও তার দলবল দেখে হোটেলের মালিক প্রথমে ঘাবড়ে গিয়েছিল তবে সামলে নিয়ে বলল, স্যার আমার মনে হয় ওরা বদ লোক কারণ ওরা দামী পোশাক পরে, প্রচুর খরচ করে। এমন লোক আমার সস্তা হোটেলে উঠবে কেন? আর একটা কথা, ওরা একদিন যাবার সময় পানি চাইল, জল বলল না।

ওরা এখন কি করছে?

ঘুমোচ্ছে স্যার, বেলায় ওঠে, দোতলায়। তিন নম্বর ঘরে আছে।

আপনার হোটেলে কি নাম লিখিয়েছে?

জহর চৌধুরী আর অখিল মল্লিক।

আমাদের সঙ্গে ওপরে চলুন, ঘরখানা দেখিয়ে দেবেন।

দরজায় ধাক্কা দেবার একটু পরে একজন দরজা খুলে দিতেই গোরা হালদার ও বীরু এবং একজন রিভলভারধারী সার্জেণ্ট হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকে পড়ল। অপর আসামী তখন তক্তপোষে উঠে বসেছে। চোখে মুখে আতঙ্ক ফুটে উঠেছে। একজনের শুধু গোঁফ অপর জনের গোঁফ দাড়ি দুইই আছে।

বীরু বলল, গুড মর্নিং জনাব জহির ও জনাব খলিল। সঠিক নাম বললুম তো?

দুই আসামী প্রায় একই সঙ্গে বলল, না মশাই ভুল করছেন, আমার নাম জহর, জহির নয় আর ওর নাম খলিল নয় অখিল।

না ভুল করি নি, জহির জহর হতে আর খলিল অখিল হতে বেশি সময় লাগে না। গোঁফ দাড়ি কামালেই আসল চেহারা বেরিয়ে পড়বে। এত সহজে গোরা হালদারের মতো ঝানু গোয়েন্দাকে ফাঁকি দেওয়া যায় না। বীরু ব্যঙ্গ করে বলল।

দুজনের মুখে আর একটিও কথা সরল না। ফাটা বেলুনের মতো ওরা চুপসে গেল। ইতিমধ্যে অরবিন্দ দাশগুপ্ত লালবাজার পুলিশ হেডকোয়ার্টারে পৌঁছে গিয়েছিলেন। তাঁকে দেখে দুই আসামী কুঁকড়ে গেল।

অরবিন্দ দাশগুপ্ত বললেন, জহির আর খলিল মিঞা বোধহয় ভাবতে পারনি তোমাদের খেলা এত সহজে খতম হবে। মিঃ হালদার আপনি সত্যিই বাহাদুর গোয়েন্দা।

গোরা হালদার বলল, লজ্জা দেবেন না। আপনাদের সাহায্য বিনা আমরা কিছুই করতে পারি না।

বুকুনের গোয়েন্দাগিরি

সুধীর বেরা



বুকুনের বয়স বছর দশেক। সব জিনিসে তার কৌতূহলের অন্ত নেই। স্কুলে যাওয়ার সময় আশেপাশে যা কিছু দেখে সব নিয়েই তার মনে হাজার প্রশ্ন। বাড়িতে মা তো উত্যক্ত। মা হয়ত ভাতের ফেন গালছেন বুকুন এসে জিজ্ঞাসা করে বসল, "মা, আজ স্কুলে যাওয়ার পথে একটা বেগুনি রঙের পাখি দেখলাম, ওটার নাম কি ?" মা পাখি দেখেছেন তবে বেগুনি রঙের পাখি তিনি কখনো দেখেছেন বলে মনে পড়ে না।

তাই হাঁ হুঁ করে প্রায় সময়ই বুকুনের এমনি সব বিদকুটে প্রশ্নের উত্তর শেষ করতে হয়। বুকুন কিন্তু এসব উত্তরে মোটেই খুশি হয় না।

বুকুনের কৌতূহল ছাড়াও একটা জিনিসের উপর ভীষণ উৎসাহ। তা হচ্ছে গোয়েন্দাগিরি।

কোনো গোয়েন্দা গল্প পেলে সে গোগ্রাসে গেলে। কোনো কিছুর রহস্য সন্ধান করায় তার বিশেষ উৎসাহ।

বুকুন মায়ের সঙ্গে বছরে দু'তিনবার মামার বাড়ি যায়। দূর গ্রামে তার মামার বাড়ি। পাশে ছোট্ট নদী বয়ে যায়। বর্ষায় সে নদী দু কূল ছাপায়। গ্রীষ্মে তা শুকিয়ে যায়। কোথাও কোথাও জল জমে থাকে। গ্রামের লোকজন তাতেই চান করে, বাসন মাজে, গরু-ছাগলকে জল খাওয়ায়, হাঁসদের ছেড়ে দেয় গেঁড়িগুগলি খাওয়ার জন্য।

সেবার বর্ষার সময় বুকুন মামারবাড়ি গেছে। সেদিন অঝোরে বৃষ্টি পড়ছিল ভোর রাত থেকে। ঘুম ভেঙে গিয়েও কিন্তু উঠতে ইচ্ছে হচ্ছিল না। মা এর মধ্যে দু' একবার উঠবার জন্য হেঁকে গেছেন।

চারদিকে বর্ষার শব্দের সঙ্গে গাছপাতার দোলার শব্দ কেমন যেন মোহময় এক জগৎ তৈরি করেছিল।

বেশ খানিকটা গড়াগড়ি করে বুকুন শেষ পর্যন্ত উঠে আধবোজা ঘুমন্ত চোখে বাথরুমের দিকে এগুতে থাকে।

এমন সময় হঠাৎ বাঁড়র ঝি কালীদাসী দুমড়ে আছাড় খেয়ে কান্নাকাটি শুরু করে দিয়েছে। ব্যাপার কি সবাই ছুটে এসেছে। বুকুনের হাতের ব্রাশ-পেষ্ট হাতেই রইল। সেও ছুটে এল ব্যাপার কি বুঝতে। হই হই। অনেক লোক জমে গেছে। সবাই যে যার কথা বলতে চাইছে। একজন আরম্ভ করছে। তার শেষ হবার আগেই আর একজন তাকে থামিয়ে দিয়ে শুরু করছে। সেও শেষ করতে পারে না, মাঝখানে আর একজন আরো জোরে কী যেন বলতে চায়। সে এক কাণ্ড। ব্যাপার কি বোঝার উপায় নেই।

ঘণ্টাখানেক এই রকম ধুন্ধুমার অবস্থার পর বুকুনের যা বোধগম্য হল তা এই—গতকাল মামা যে মাছ কিনেছিলেন তার বড় বড় বেশ কয়েকটুকরো ভেজে রাখা ছিল। আজ বাড়িতে নতুন জামাই আসবে। তারজন্য মাছের মুড়ো এবং ভালো টুকরোগুলো যত্ন করে চাপা দিয়ে রাখা ছিল। সকালে কালীদাসী বাসন মাজার সময় ঘর খুলে ঢাকা তুলে দেখে যে মুড়ো এবং চার-পাঁচ টুকরো মাছ নেই। কালীদাসী বহুদিনের পুরোনো লোক। এ বাড়ির অভিভাবকের মতো। মামা চাকরি করে। মামীমা স্কুলে পড়ায়। কালীদাসীই রান্না করে। ঘর গোছায়, অতিথি অভ্যাগত কুটুম্ব বন্ধুবান্ধবদের আদর-আপ্যায়ন করে। ওকে সাহায্য করার জন্য একটা বারো-তের বছরের ছোঁকরা আছে। নাম নারাণ। সে হাট-বাজারে যায়, মাঠে জন-মজুরের তদারক করে, তাদের পান-তামাক পৌঁছে দেয়, ছেলেটা এমনিতে নিরীহ। উড়িষ্যা থেকে এসেছে, তবে ওড়িশি নয়। প্রবাসী বাঙালী। মামার অফিসের একজন সহকর্মী তাকে দেশ থেকে এনে দিয়েছে। ছেলেটাকে এমনিতে ভালো বলে সবাই জানে। বাজারের টাকা-পয়সা ওর কাছেই থাকে।

কে মাছ খেল এই নিয়ে কালীদাসীর খুব ভাবনা। নতুন জামাই মানে মামার একমাত্র মেয়ের স্বামী শ্বশুরবাড়ি আসবে স্ত্রীকে নিতে। এখন মাছ চুরি গেছে ওদের কি দিয়ে খাওয়াবে। আর এরকম চুরি এই প্রথম না হলেও এত বেশি এবং এই প্রয়োজনের সময়ে এই প্রথম। এর আগে দু'চার বার ছোটখাটো মাছটা, কলাটা, মিষ্টিটা যে চুরি যায়নি তা নয় তবে তার গুরুত্ব এত ছিল না।

সবাইয়ের যখন মন খারাপ এবং বুকুনের মা যখন গয়নাগাঁটি টাকা-পয়সা সামলাতে ব্যস্ত, তখন বুকুন ভাবছে সে চোর ধরবে। সে গোয়েন্দা হওয়ার এমন সুযোগ কিছুতেই হাতছাড়া করবে না।

যেমনি কথা তেমনি কাজ। কিন্তু কাউকে মনের কথা বলল না। কি জানি যদি সবাই জেনে যায় তাহলে তার গোয়েন্দাগিরি হয়তো সফল হবে না।

দু'তিন দিন হয়ে গেল। মেয়ে-জামাই বোন-ভাগ্নের কলরবে বুকুনের মামারবাড়ি গম-গম করছে! খাওয়া-দাওয়া হইহই গল্প-গুজবের শেষ নেই। সেদিন মামার অফিস ছুটি মামীর স্কুলও

ছুটি, বাড়িতে খাওয়াদাওয়ার ধুম প্রোগ্রাম। মামা পুকুরে জেলে দিয়ে মাছ ধরালেন। বুকুনের সে আশ্চর্য অভিজ্ঞতা! পুকুরে জালটাকে কেমন পাকিয়ে ছুঁড়ে দিচ্ছে। আর ডাঙার ধারে যে জায়গাটা পাকিয়ে ছুঁড়ছে সে হাতের ধরা দড়িটা আস্তে আস্তে টানছে এবং জালটা উঠে আসছে এবং তার মধ্যে মাছগুলো লাফালাফি করছে কিন্তু পালাতে পারছে না।

প্রচুর মাছ ধরা পড়েছে। রাতে সবাইয়ের পেট পুরে খাওয়া হয়েছে। অনেক মাছ ভেজে পরের দিনের জন্য চাপা দিয়ে রাখা হল। ভালো করে ভারী জিনিস চাপা দেওয়া হল যাতে বেড়ালে না খেতে পারে। রান্নাঘরের দরজা বাইরে থেকে শিকল তুলে বন্ধ করে দেওয়া হল।

সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়েছে তখন বুকুন আস্তে আস্তে পা টিপে টিপে রান্নাঘরে ঢুকল এবং পরীক্ষা করে দেখল যে যেমন চাপা ছিল তেমনি আছে। সে আবার শিকল তুলে ফিরে এসে শুয়ে পড়ল।

সকালে নিদারুণ হইচই জুড়েছে কালীদাসী। তার হইচই-এ ঘুম ভেঙ্গে গেল বুকুনের। চারদিকে লালরক্তের দাগ তার উপরে কার পায়ের ছাপ। রান্নাঘর থেকে সেই ছাপ বেরিয়ে সেই ছোকরা চাকর নারাণ যে ঘরে ঘুমায় সেইদিকে চলে গেছে।

সবাই জেগে উঠেছে রান্নাঘরের শিকল খুলে দেখা গেল একটা বড় মাছের মুড়ো এবং পাঁচছ' বড় টুকরো মাছ থালা থেকে হাপুস। মাছের থালার কাছ থেকে পায়ের লাল ছাপগুলির উৎপত্তি হয়েছে।

কার পায়ের ছাপ খোঁজ খোঁজ। বেশি খুঁজতে হল না। এ যে সেই ছোকরা নারাণ ছেলেটার পায়ের ছাপ তা সহজেই বোঝা গেল। কারণ সে তখনও ঘুমাচ্ছিল এবং তার পায়ে লাল রঙ লেগে আছে, বিছানাও লাল হয়ে গেছে।

সবাইয়ের বুঝতে অসুবিধা হল না যে এ বুকুনেরই কাণ্ড। সে তাহলে কাল যে বাজারে গিয়ে কি যেন কিনে এনেছিল এই চোর ধরার উদ্দেশ্যে। খুনখারাবি রঙে তখন মেঝে লালে লাল!

চোর ধরা পড়ে গেল। চোরের কপালে যা জোটে তাই জুটল। আরো কিছু নতুন খবর জুটল। এ ছোকরার এক প্রাণের বন্ধুও ওর সঙ্গে আছে। সবাই ঘুমিয়ে পড়লে সে চুপিসারে রান্না ঘরে ঢুকে খাবার ইত্যাদি নিয়ে আসে এবং দুজনে মুখ চেটে খায়। এমনভাবে নেয় যাতে কেউ ধরতে না পারে বা সন্দেহ না করে। এবার বিধি বাম ছিল, ভাবী গোয়েন্দা বুকুন যে এমনভাবে তাকে বেকায়দায় ফেলবে তা সে কোনো দিন ভাবে নি।

বুকুনকে মামা মামীমা অনেক আদর করল। মা শুধু বলল, "লেখাপড়া ছেড়ে এ করলে পরে কি পেট ভরবে? যে বুদ্ধি নিয়ে গোয়েন্দাগিরি করিস, সেটা পড়াশুনায় লাগালে আমার ভাবনা ছিল না।'

বুকুন আপন কৃতকার্যতায় আরো গোয়েন্দাগিরির স্বপ্ন দেখে।

সমাপ্ত



